6 জীবদেহের গঠন

জীবদেহের গঠনের ধাপসমূহ

তোমার চারদিকে তাকাও। দেখতে পাচ্ছ এমন পাঁচটি জিনিসের নাম লেখো। তুমি কীভাবে এদের শ্রেণিবিভাগ করতে পারো—জড় না সজীব? এই তালিকায় কী এমন কোনো জিনিস আছে যা চলাচল করতে পারে বা পরিবেশের উদ্দীপনায় সাড়া দেয়। লজ্জাবতী বা মানুষ সজীব, কিন্তু পড়ে থাকা কাঠকে কেন আমরা জড় বলি?

সজীবরা শ্বাস নেয়, খাদ্য হজম করে, দেহে উৎপন্ন বর্জ্য বের করে দেয় এবং নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে। এধরনের এক বা একাধিক কাজ করতে সজীব দেহে কী থাকে?

- খাদ্য হজম করার জন্য পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র।
- শ্বাসবায়ু নেওয়া ও ছাড়ার জন্য ফুসফুস।
- রক্তকে দেহের দূরতম প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার জন্য হৃৎপিণ্ড।
- দেহের বর্জ্যকে মূত্রের মাধ্যমে বের করে দেওয়ার জন্য বৃক্ক।
- উদ্দীপনা গ্রহণ ও তাকে উত্তেজনায় রূপান্তরের জন্য মস্তিষ্ক।

এসব অঙ্গে কী এমন থাকে যা এসব অঙ্গের বিশেষ গঠনে ও কাজে সাহায্য করে?

এবার এসো দেখা যাক, একটা বাড়ি ও একটা জীবদেহ কীভাবে ধাপে ধাপে গঠিত হয়—

বাড়ি	জীবদেহ
↓	↓
ঘর	অঙ্গ (ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, বৃক্ক)
↓	↓
দেয়াল, ছাদ, মেঝে	কলা
↓	↓
ইট	কোশ

→

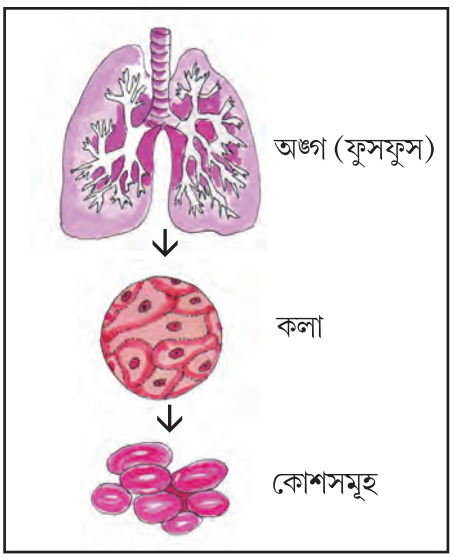

বাড়ির ক্ষুদ্রতম গঠনগত অংশ হলো ইট। তেমনি জীবদেহ গঠনেরও ক্ষুদ্রতম একক হলো কোশ। আবার জীবদেহ যে কাজগুলো করে তাও কোশেই সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ কোশ হলো জীবদেহের এমন এক ক্ষুদ্রতম একক যা যেকোনো কাজ করতে পারে।

টুকরো কথা

কোনো জীবদেহের গঠনগত ও কার্যগত ক্ষুদ্রতম একক হলো কোশ। এরা এতই ছোটো যে **মাইক্রোস্কোপ** ছাড়া সাধারণত এদের খালি চোখে দেখা যায় না।

মাইক্রোস্কোপ

কী করে এই কোশের কথা জানা গেল ?

1665 খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী রবার্ট হুক গাছের কাণ্ডের ছাল নিয়ে তার একটি সূক্ষ্ম প্রস্থচ্ছেদ তৈরি করেন। তারপর নিজের তৈরি মাইক্রোস্কোপের নীচে ওই প্রস্থচ্ছেদ দেখার সময় মৌচাকের প্রকোষ্ঠের মতো অসংখ্য কুঠুরি লক্ষ করেন। তিনি এদের Celluliae (ল্যাটিন অর্থ ঘর) বলে আখ্যা দেন। পরে এদেরই তিনি Cell (কোশ)নাম দেন।

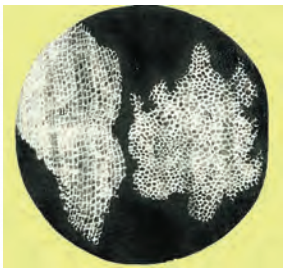

তুমি কী করে একটি কোশকে দেখতে পারো ?

খালি চোখে কোশ দেখা যায় না। দেখতে গেলে একে বহুগুণে বড়ো করা দরকার। এর জন্য আমরা লেন্সযুক্ত যে যন্ত্র ব্যবহার করি তা হলো মাইক্রোস্কোপ (Microcope)।

লিভেনহিক

টুকরো কথা

রবার্ট হুক কর্কের পাতলা ছেদ পরীক্ষা করার সময় যে কোশগুলি লক্ষ করেছিলেন সেগুলি ছিল মৃত। 1674 খ্রিস্টাব্দে ডাচ বিজ্ঞানী লিভেনহিক প্রথম সজীব কোশ পর্যবেক্ষণ করেন। মাইক্রোস্কোপের উন্নতি ঘটিয়ে তিনি নানা অণুজীব ও রক্তকোশ পর্যবেক্ষণ করেন।

কোশের গঠনকে ভালভাবে বুঝতে গেলে নানা রঙের রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। এদের রঞ্জক পদার্থ (Stain) বলে।

- কোশের গঠন পর্যবেক্ষণ করার জন্য প্রথমদিকে সরল আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Simple Light Microscope) ব্যবহার করা হতো। এতে একটিমাত্র লেন্সের সাহায্য নেওয়া হতো। ফুল কেটে তার অংশবিশেষ দেখার জন্য এই ধরনের অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করা হতো। এটা বস্তুকে 15-20 গুণ বড়ো করে দেখাতে সক্ষম।

- এরপর এলো যৌগিক আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Compound Light Microscope)। এতে দ্রষ্টব্য বস্তুকে অনেকগুণ বড়ো করে দেখানোর জন্য বিবর্ধন ক্ষমতা সম্পন্ন একাধিক লেন্স (অকিউলার লেন্স, অবজেকটিভ লেন্স) ব্যবহার করা হয়। এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃশ্যমান আলো দ্বারা দ্রষ্টব্যবস্তুকে আলোকিত করা হয়। এর জন্য একটি বিশেষ ধরনের আয়নার (Mirror) সাহায্য নেওয়া হয়। এই ধরনের লেন্স ব্যবহারের ফলে দ্রষ্টব্য বস্তুকে 2000-4000 গুণ বড়ো করে দেখা সম্ভব।

যৌগিক আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র কোথায় কোথায় ব্যবহার করা হয়?

- ব্যাকটেরিয়া, শৈবাল, ছত্রাক, বিভিন্ন এককোশী ও বহুকোশী প্রাণীর দেহের বহির্গঠন জানার জন্য।
- উদ্ভিদ দেহের বিভিন্ন অংশের (মূল, কাণ্ড ও পাতা) অন্তর্গঠন পর্যবেক্ষণের জন্য।
- জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও তার প্রস্থচ্ছেদ করে তার কলার গঠন জানার জন্য।
- কোশের ভেতরের অঙ্গাণু ও কোশের বাইরের পর্দার গঠন জানার জন্য।

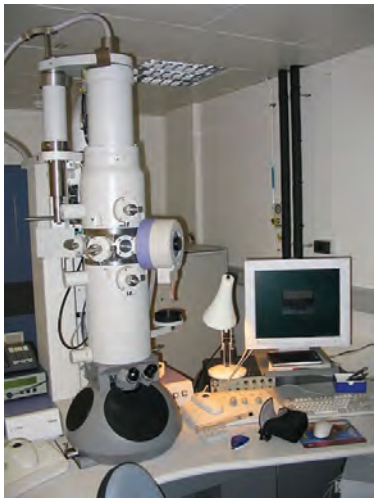

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Electron Microscope) : এই যন্ত্রে আলোর পরিবর্তে দ্রুতগতির ইলেকট্রন প্রবাহ দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্য দিয়ে পাঠানো হয়। এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কাচের লেন্সের পরিবর্তে তড়িৎচুম্বক ব্যবহার করা হয়। দ্রষ্টব্য বস্তুকে 50,000-3,00,000 গুণ বড়ো করে দেখা যায়। দ্রষ্টব্য বস্তুকে দেখার জন্য ফোটোগ্রাফিক ফিল্ম ব্যবহার করা হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে ভাইরাস ও অন্যান্য অণুজীবকে অনেক বড়ো করে দেখা সম্ভব। এছাড়াও কোশের মধ্যের অঙ্গাণুগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ গঠন জানা সম্ভব হয়।

কোশের বৈচিত্র্য

কার দেহে কত কোশ আছে?

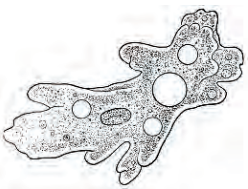

ওপরের বিভিন্ন জীবকে লক্ষ করে ছোটো থেকে বড়ো আকার (Size) অনুযায়ী সাজাও।

(1) ..... (2) ..... (3).....(4) .....

ওপরের সব জীবদেহের গঠন কিন্তু একরকম নয়। কোনো জীবের আকার (Size) যত বড়ো হয় তার দেহে কোশের সংখ্যা তত বেশি হয়।

অ্যামিবার দেহ একটি কোশ নিয়ে গঠিত। অর্থাৎ একটি কোশ একটি জীবদেহের সমতুল্য। এরা এককোশী (Unicellular)। মশা, বিড়াল ও হাতির দেহ অসংখ্য কোশ নিয়ে গঠিত। কোশের সংখ্যা সঠিকভাবে গোনা সম্ভব নয়। অর্থাৎ এই ধরনের জীবরা বহুকোশী (Multicellular)। বহুকোশী জীবে বিভিন্ন জীবন প্রক্রিয়া একই সঙ্গে ও অবিছিন্নভাবে ঘটতে পারে। পরিবর্তনশীল পরিবেশে বহুকোশী জীবের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

কোশ দেখতে কেমন? নীচের ছবিগুলো দেখে কোশের আকৃতি (Shape) কতরকম হতে পারে তা লেখো।

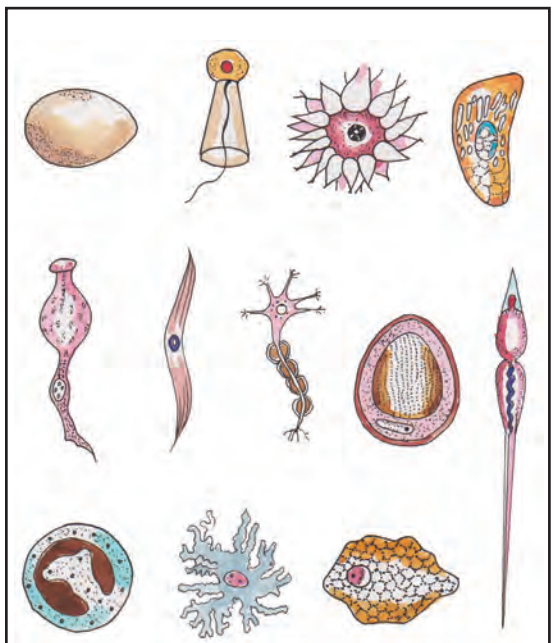

নানা ধরনের প্রাণীকোশ

নানা ধরনের উদ্ভিদকোশ

বিভিন্ন জীবের ক্ষেত্রে কোশের আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন (ডিম্বাকার, আয়তাকার, বহুভুজাকার, স্তম্ভাকার, লম্বাটে, সূত্রাকার ইত্যাদি) হয়। বহুকোশী কোনো জীবের দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কোশের আকৃতি কাজের উপর নির্ভর করে।

প্রাণীদেহে চামড়ার নীচে বা অন্যান্য অঙ্গে ফ্যাট সঞ্চয়ী চর্বিকোশ থাকে। চর্বি জমা হওয়ার ফলে কোশের নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজম সহ একদিকে সরে যায়। ফলে চর্বিকোশকে আংটির মতো দেখায়। চোখের রেটিনায় মৃদু আলো শোষণে সক্ষম দণ্ডাকার রডকোশ এবং উজ্জ্বল আলো ও বর্ণ শোষণে সক্ষম শঙ্কু আকৃতির কোণ (Cone) কোশ দেখা যায়। উদ্ভিদের বীজের আবরণ ও ফলত্বকে উপস্থিত প্রস্তরকোশে প্রোটোপ্লাজম না থাকায় কোশগুলি দণ্ডাকার, স্তম্ভাকার বা তারার মতো আকৃতি বিশিষ্ট হয়। কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়ার কোশ গোলাকার, রডের মতো বা কমা চিহ্নের মতো হয়। আবার স্পাইরোগাইরার মতো শৈবালের সূত্রাকার দেহ কতগুলো আয়তাকার কোশ দ্বারা গঠিত। কোশের বয়স, কোশমধ্যস্থ চাপ ও অন্যান্য শর্ত কোশের আকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে।

• নীচে অ্যামিবার আকৃতি লক্ষ করো। এর আকৃতি অনিয়মিত । অ্যামিবার আকৃতি অন্য জীবকোশের মতো নয়। সর্বদাই এর আকৃতি (Shape) পরিবর্তিত হয়। অ্যামিবার দেহের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বেরোনো বিভিন্ন মাপের অংশগুলো লক্ষ করো। এগুলোর নাম হলো ক্ষণপদ। ক্ষণপদ কখনও তৈরি হয় আবার পর মুহূর্তেই অদৃশ্য হয়। এগুলো অ্যামিবার চলাফেরায় সাহায্য করে।

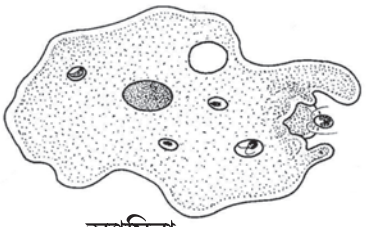

অ্যামিবা

শ্বেত রক্তকণিকা

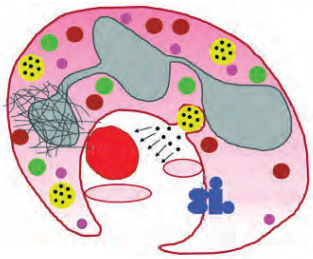

আগ্রাসী শ্বেত রক্তকণিকা

মানুষের রক্তে জীবাণুকে মেরে ফেলার জন্য শ্বেত রক্তকণিকা থাকে। এরাও অ্যামিবার মতো নিজেদের আকৃতি পরিবর্তন করতে পারে। তবে মনে রেখো অ্যামিবা একটি স্বাধীন জীব। আর শ্বেত রক্তকণিকা একটি জীবদেহের কোশ।

আমাদের দেহের কোশগুলো কোনটা কেমন?

লোহিত রক্তকণিকা

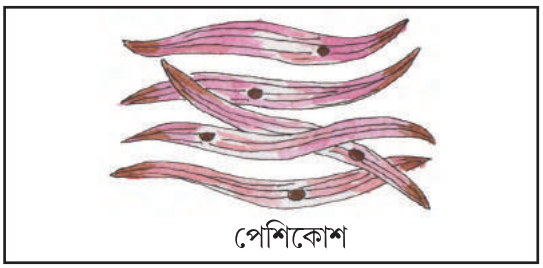

পেশিকোশ

স্নায়ুকোশ

এবার নীচে মানুষের দেহের আরও নানাধরনের কোশ লক্ষ করো।

লোহিত রক্তকণিকা গোলাকার; দু -পাশ চ্যাপটা, চাকতির মতো। বিভিন্ন ব্যাসের রক্তনালীর মধ্য দিয়ে যাতায়াতের জন্য আর বেশি পরিমাণ অক্সিজেন পরিবহন করার জন্য এদের এধরনের আকার হয়।

পেশিকোশের দু -প্রান্ত ছুঁচালো, মাঝখানটা চওড়া, সংকোচন-প্রসারণের জন্য এদের আকার এরকম হয়। পেশিকোশের সংকোচন-প্রসারণের জন্য মানুষের স্থান পরিবর্তন, খাদ্যনালীর মধ্য দিয়ে খাদ্যের স্থানান্তরণ, শ্বাসনালীর মধ্য দিয়ে বায়ুর পরিবহন, রক্তনালির মধ্য দিয়ে রক্তের সংবহন ইত্যাদি কার্য সম্পন্ন হয়।

অন্যান্য কোশের তুলনায় স্নায়ুকোশ দৈর্ঘ্যে অনেক বেশি হয়। আর এর মূল কোশদেহ তারার মতো বা গোলাকার ও তার সঙ্গে নানা আকৃতির শাখা-প্রশাখা যুক্ত থাকে। এরা পরিবেশ থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে (আলোক , শব্দ, গন্ধ, স্বাদ, চাপ, ব্যথা ও তাপ ইত্যাদি) ও তাকে পরিবহন করে। এভাবে জীবদেহের বাইরের ও ভেতরের পরিবেশের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।

যে-কোনো মেরুদণ্ডী (যেমন মাছ, ব্যাং, সাপ, পাখি, বাঘ, মানুষ) প্রাণীদের দেহে প্রায় 200-এর বেশি কোশীয় বৈচিত্র্য চোখে পড়ে। উদ্ভিদদেহেও কোশের আকৃতিগত পার্থক্য চোখে পড়ে।

মূল বা কাণ্ডের অগ্রভাগে যে কোশগুলো থাকে তারা ক্রমাগত বিভাজিত হয়। এ ধরনের কোশগুলো বহুভুজাকার। আবার কাণ্ডের ভেতরে মূল থেকে পাতা পর্যন্ত জলের ঊর্ধ্বমুখী সংবহনের সঙ্গে যে কোশগুলো যুক্ত তারা আবার নলাকার।

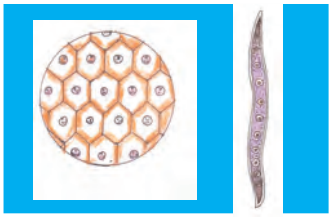

এবার কোশের আকৃতি নিয়ে নীচের সারণিটি পূরণ করো ও খাতায় প্রতিটি কোশের ছবি আঁকো। এরকম আকৃতির অন্য কোশের নাম শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্যে সারণিতে যোগ করো।

কোশের নাম	কোশের আকৃতি
(1) লোহিত রক্তকণিকা	
(2) শ্বেত রক্তকণিকা	
(3) পেশিকোশ	
(4) স্নায়ুকোশ	
(5) মূল বা কাণ্ডের অগ্রভাগের কোশ	
(6) জল পরিবহণকারী উদ্ভিদ কোশ	

টুকরো কথা

কোশের আকৃতি কী সর্বদা একরকম থাকে? কোনো ডিম্বাকার কোশ ক্যানসার কোশে রূপান্তরিত হলে গোলাকার হয়ে যায়। লোহিত রক্তকণিকা যখন বিভিন্ন ব্যাসের রক্তনালির মধ্য দিয়ে যাতায়াত করে তখন তাদের আকৃতির পরিবর্তন হয়। কোশ বিভাজনের সময়েও প্রাণীকোশের আকৃতি পরিবর্তিত হয়।

করে দেখো

একটা ডিম নিয়ে সিদ্ধ করো। তারপর খোলাটা ছাড়াও। কী দেখবে? একটা সাদা অংশ ভেতরের হলুদ অংশকে ঘিরে রয়েছে। হলুদ অংশ হলো কুসুম। এটা একটা কোশের অংশ। এই একক কোশকে খালি চোখে দেখা যায়।

স্নায়ুকোশের দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি। উটপাখির অনিষিক্ত ডিম হলো বৃহত্তম একক কোশ।

কতটা বড়ো একটা কোশ?

অন্য কোশরা কিন্তু মুরগির ডিমের মতো বড়ো নয়। কোশের আকার সাধারণত মাইক্রোমিটার বা মাইক্রন দিয়ে মাপা হয়। 1 মাইক্রোমিটার 1 মিটারের 10 লক্ষ ভাগের 1 ভাগ। 1 মিটার = 1000 মিলিমিটার, 1 মিলিমিটার = 1000 মাইক্রোমিটার,1 মাইক্রোমিটার(μm) = 1000 ন্যানোমিটার এবং 1 ন্যানোমিটার(nm) = 10 অ্যাংস্ট্রম (Å)। এ হিসাবে কোনো বাক্যের শেষে যে যতিচিহ্ন (Full Stop) আমরা ব্যবহার করি তাতে 1 মাইক্রন মাপের 400 টি কোশ এঁটে যায়। অধিকাংশ কোশের আকার 5-10 মাইক্রন।

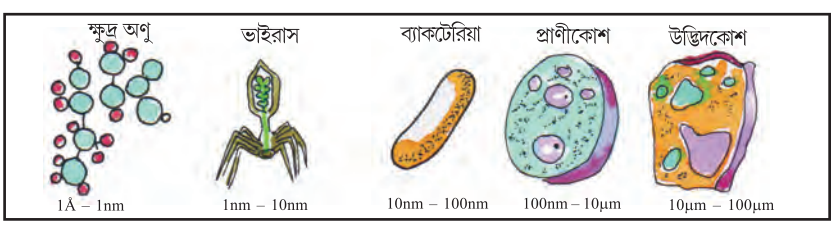

হাতির দেহের কোশ কি ইঁদুরের দেহের কোশের তুলনায় বড়ো?

কোশের আকারের (Size) সঙ্গে জীবদেহের আকারের কোনো সরাসরি সম্পর্ক নেই। কোশের আকৃতি (Shape) বরং কোশের কাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। হাতি ও ইঁদুর উভয়ের দেহেই স্নায়ুকোশ দীর্ঘ ও শাখা-প্রশাখা যুক্ত। উভয়ের দেহেই স্নায়ুকোশ উদ্দীপনা গ্রহণ ও উত্তেজনা পরিবহণের মতো কাজের সঙ্গে যুক্ত।

বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজ ও কোশীয় বিশেষত্ব

প্রাণীদেহে কী কী শারীরবৃত্তীয় কাজ হয় এসো জানি—

কাজগুলির নাম	সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া
• খাদ্যগ্রহণ, পরিপাক , শোষণ, আত্তীকরণ ও অপাচ্য খাদ্য বহিষ্করণ	পুষ্টি
• শ্বাসবায়ুর আদানপ্রদান ও শক্তি উৎপাদন	শ্বসন
• খাদ্যের সারাংশ ও শ্বাসবায়ুকে (O_2) দেহের দূরতম প্রান্তে পৌঁছে দেওয়া	সংবহন
• দেহে উৎপন্ন ক্ষতিকারক বর্জ্যকে দেহ থেকে বার করে দেওয়া	রেচন
• এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থান পরিবর্তন করা	গমন
• পরিবেশের উদ্দীপনায় সাড়া দেওয়া ও পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলা	স্নায়বিক সমন্বয়
• সংখ্যাবৃদ্ধি করা ও অস্তিত্বরক্ষা করা	জনন

উদ্ভিদদেহেও প্রাণীদেহের মতো না হলেও অন্যান্য নানা কাজ সারাদিন ধরে চলতে থাকে। যেমন—

- মাটি থেকে জল তোলা ও পাতায় পরিবহণ করা।
- অতিরিক্ত জল বাষ্পাকারে বের করে দেওয়া।
- ফুল, ফল ও বীজ তৈরি করা।
- সূর্যের আলো শোষণ করা ও খাদ্য তৈরি করা।
- খাদ্য সঞ্চয় ও পরিবহণ করা।
- সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা।

প্রাণীদেহে নানা কাজ করতে পাকস্থলী, যকৃৎ, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, বৃক্ক, মস্তিষ্কের মতো অঙ্গ ব্যবহৃত হয়। উদ্ভিদদেহে একইভাবে মূল, কাণ্ড ও পাতার মতো অঙ্গ ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেকটি অঙ্গ একাধিক কলা নিয়ে গঠিত। প্রত্যেকটি কলা আবার একইরকম কাজ করতে পারে এরকম কোশের সমষ্টিমাত্র। অর্থাৎ জীবদেহ গঠনের ধাপগুলো হলো— (জীবদেহ → অঙ্গতন্ত্র → অঙ্গ → কলা → কোশ)।

কাজ অনুযায়ী কোশের আকার ও আকৃতি যেমন বদলে যায়, তেমনি গঠনেরও পরিবর্তন ঘটে। প্রাণীদেহে যেসব কোশ শোষণ করে তাদের আকৃতি স্তম্ভাকার। আবার যারা ক্ষরণের কাজ করে তারা ঘনকাকার। আবার মুখগহ্বরের ভেতরের যে কোশগুলি প্রতিরক্ষায় অংশগ্রহণ করে তারা আবার মাছের আঁশের মতো দেখতে হয়। বিভিন্ন অঙ্গ যে কোশগুচ্ছ নিয়ে গঠিত হয় তারা গঠনগতভাবে এক বা আলাদা হলেও কার্যগতভাবে অভিন্ন। কোশমধ্যস্থ প্রোটোপ্লাজমের বিভিন্ন আন্তঃকোশীয় বস্তুর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো— অবলম্বন, শোষণ, ক্ষরণ, সংকোচনশীলতা, উত্তেজিতা, চাপ ও টান সহ্য করা ইত্যাদি। জীবনের বির্বতনের সঙ্গে সঙ্গে কোশগুলির প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে এইভাবে শ্রমবিভাজন ঘটায় কাজের পার্থক্য ঘটে। এই ঘটনা ঘটার জন্য একেক ধরনের কোশসমষ্টির উৎপত্তি হয়েছে। কোশসমষ্টিই বা কোশগুচ্ছই হলো কলা।

উদ্ভিদদেহে কোশগুচ্ছ বিভিন্ন ধরনের ভাজক কলা এবং স্থায়ী কলা গঠন করে। আর প্রাণীদেহে বিভিন্ন ধরনের কোশগুচ্ছ একত্রিত হয়ে চার ধরনের কলা গঠন করে— আবরণী কলা, যোগকলা, পেশিকলা ও স্নায়ু কলা।

জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গের গঠন ও কাজ অনুযায়ী কোশের প্রোটোপ্লাজমেরও গঠনগত নানা পরিবর্তন ঘটে। ফলে অঙ্গ ও কলাভেদে কোশের কাজও বদলে যায়। নীচের ছকে উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের বিভিন্ন কলার কাজগুলো বোঝানো হলো।

উদ্ভিদদেহে কোশের কাজের বিশেষত্ব ও কলার প্রকারভেদ

ভাজক কলা

• নতুন অঙ্গ সৃষ্টি করা, • মূল ও কাণ্ডের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করা, • নতুন পাতা, কাক্ষিক মুকুল ও শাখা উৎপন্ন করা, • ফুল উৎপন্ন করা, • রক্ষণমূলক আবরণ গঠন করা, • সংবহন কলা গঠন করা।

স্থায়ী কলা

• খাদ্য সংশ্লেষ, • সঞ্চয় ও পরিবহণ করা, • জল সংবহন করা, • ভারবহন ও দৃঢ়তা প্রদান করা, • বর্জ্য পদার্থ সঞ্চয় করা, • প্লবতা প্রদান করা, • ফল ও বীজের বিস্তার করা, • উদ্ভিদ অঙ্গের টান ও চাপ সহনশীলতা বৃদ্ধি করা, • ক্ষত নিরাময় করা।

প্রাণীদেহে কোশের কাজের বিশেষত্ব ও কলার প্রকারভেদ

আবরণী কলা

• দেহের বাইরে ও ভেতরের বিভিন্ন অঙ্গের মুক্ততলের ওপর প্রতিরক্ষামূলক আচ্ছাদন গঠন করা, • শোষণ করা, • ক্ষরণ করা, • অনুভূতি গ্রহণ করা, • বিজাতীয় বস্তু ও বর্জ্য পদার্থ অপসারণ করা, • বহিঃকঙ্কাল (আঁশ, রোম, নখ, ক্ষুর, শিং ইত্যাদি) গঠন করা।

যোগ কলা

• ভারবহন করা, • বিভিন্ন অঙ্গ ধারণ করা, • বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা, • প্রতিরক্ষা প্রদান করা, ফ্যাট সঞ্চয় করা, • তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা।

পেশি কলা

• অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালন ঘটানো, • গমনে সাহায্য করা, • খাদ্যকে গিলতে সাহায্য করা, • পৌষ্টিকনালির ও মূত্রনালির ক্রমসংকোচন ঘটানো, • হৃৎস্পন্দন ও রক্তপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা, • রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা, • শব্দ সৃষ্টি করা, • গ্রন্থির ক্ষরণ ঘটানো, • মুখের অভিব্যক্তি ঘটানো, • দৈহিক ভঙ্গির পরিবর্তন ঘটানো।

স্নায়ু কলা

• সংবেদন গ্রহণ করা, • উদ্দীপনা পরিবহন করা, • দেহের বাইরের ও ভেতরের পরিবেশের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা, • পেশি সংকোচন ঘটানো, • গ্রন্থির ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করা।

প্রাণী ও উদ্ভিদদেহের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া ও কোশীয় অঙ্গাণু

তবে আগে জানা যাক, একটা জীবকোশের গঠনে সাধারণভাবে কী কী অংশ থাকে?

সক্রিয়তামূলক কার্যাবলি

- তোমরা ঠোঁটের ভেতরের দিক বা গালের পাশের অংশ একটা পরিষ্কার টুথপিকের সাহায্যে তুলে নাও। তারপর একটা গ্লাস স্লাইডের মাঝখানে টুথপিকের মাথাটা ভালো করে ঘসে নাও।
- এবার একফোঁটা মিথিলিন ব্লু (কোশকে দেখতে সাহায্য করে এমন রঞ্জক) স্লাইডের ওপর ফেলে কভার স্লিপ দিয়ে ভালোভাবে চাপা দাও।

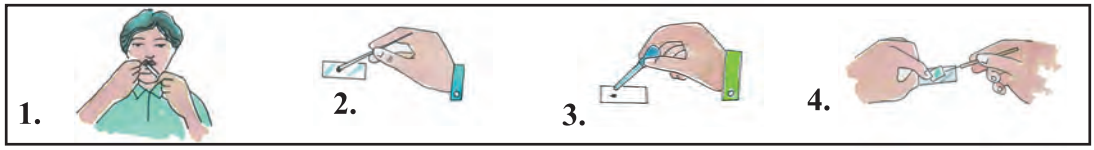

এবার মাইক্রোস্কোপের নীচে দেখলে তুমি কী দেখতে পাবে?

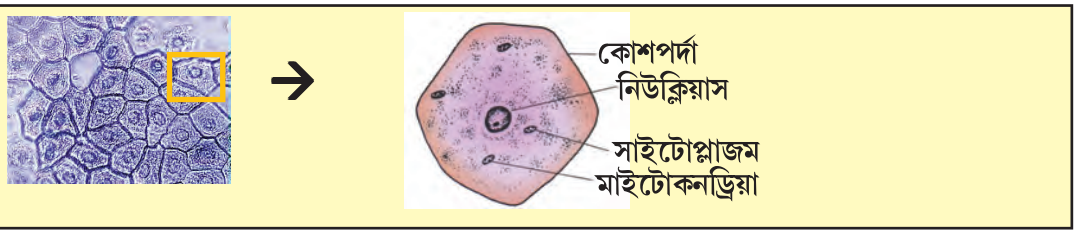

এরকম একটি প্রাণীকোশের ত্রিমাত্রিক মডেলের চিত্র নীচে দেখানো হলো।

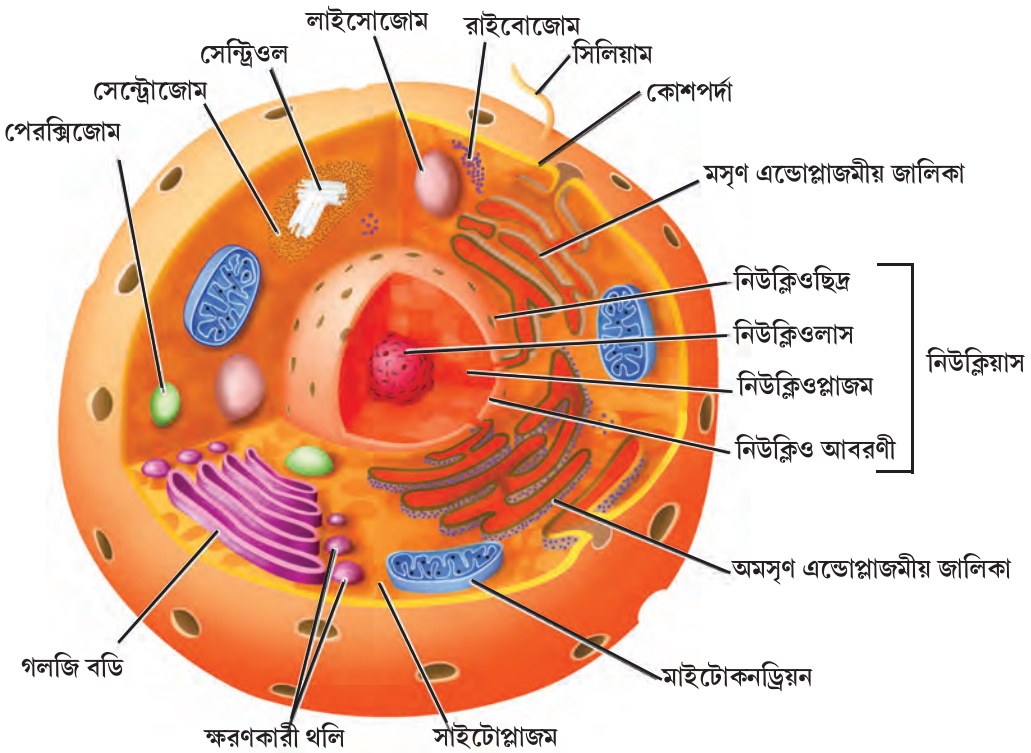

এরকম একটা প্রাণীকোশের গঠনে কী কী দেখা যায়—

• কোশপর্দা (Cell Membrane)— কোশের বাইরে যে পাতলা পর্দা দেখা যায় তা হলো প্লাজমা পর্দা বা কোশপর্দা। এটি কোশকে নির্দিষ্ট আকৃতি দেয়। এটি ছিদ্রযুক্ত। এই পর্দা একটি কোশকে পার্শ্ববর্তী অন্য একটি কোশ থেকে আলাদা করে রাখে। ছিদ্র থাকার জন্য কোশের ভেতরে ও বাইরের মধ্যে জল, খনিজপদার্থ ও অন্যান্য বস্তুর আদান-প্রদানে অংশগ্রহণ করে। তবে ছিদ্রের আকার ও প্রকৃতির ওপর এই দেওয়া-নেওয়া প্রক্রিয়া নির্ভর করে। তাই এটি সম্পূর্ণরূপে ভেদ্য নয়। এটি কোশের ভেতরে এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা, গলজিবস্তু, নিউক্লিয়াসের পর্দা ও অন্যান্য পর্দাঘেরা কোশীয় অঙ্গাণু গঠনেও সাহায্য করে।

• সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm)— কোশের ভেতরকার জেলির মতো অর্ধতরল পদার্থ। বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া চালানোর জন্য যে সমস্ত রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটানোর দরকার হয় তা সাইটোপ্লাজমে সম্পন্ন হয়।

• নিউক্লিয়াস (Nucleus)— কোশের ভেতরের ঘন গোলাকার বস্তু। এটা কোশের ভেতরে ঘটে চলা নানা প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। নিউক্লিয়াসের বাইরে নিউক্লীয় পর্দা থাকে। আর এর ভিতরে নিউক্লিওপ্লাজম নামক তরল থাকে। নিউক্লিয়াসের ভেতরে একধরনের সূক্ষ্ম জালকাকার গঠন দেখা যায় যা সুতোর মতো একে অপরকে পেঁচিয়ে থাকে। এই গঠনগুলোই হলো **DNA** । **DNA** হলো এক ধরনের বৃহৎ জৈব অণু যা নিউক্লিয়াসের মধ্যে পরিস্থিতি অনুসারে গোটানো বা আংশিক খোলা অবস্থায় থাকে ও সেটিকে সুতোর জালের মতো দেখায়। তখন একে ক্রোমাটিন জালিকা বলা হয়। গোটানো অবস্থায় কয়েক ধরনের প্রোটিনের গায়ে এটি জড়ানো থাকে। তখন **DNA** - এর এই গোটানো গঠনগুলোকে ক্রোমোজোম বলে। খোলা অবস্থায় **DNA** অণুর বিশেষ বিশেষ অংশ প্রোটিন তৈরির সংকেত বহন করে যা জীবের বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। এই অংশগুলোর প্রত্যেকটিকে এক একটি জিন (Gene) বলা হয়। পিতামাতা থেকে তাদের সন্তানদের মধ্যে বংশগত বৈশিষ্ট্য এই জিনের মাধ্যমেই বাহিত হয়। নিউক্লিয়াসের মধ্যে একটি ঘন গোলাকার অংশ দেখা যায় যেখানে রাইবোজোম তৈরি হয়। একে নিউক্লিওলাস (Nucleolus) বলে।

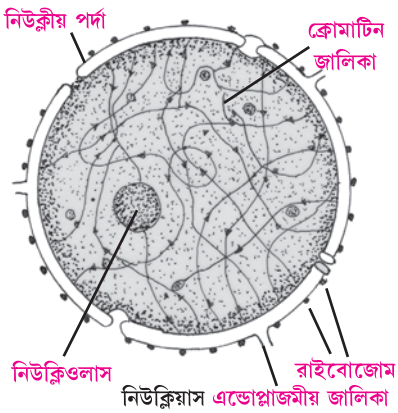

টুকরো কথা

প্রত্যেক প্রজাতিভুক্ত জীবের ক্রোমোজোম সংখ্যা নির্দিষ্ট। একজন স্বাভাবিক মানুষের দেহকোশের নিউক্লিয়াসে ক্রোমোজোম সংখ্যা হলো 46। ক্রোমোজোম সংখ্যা বা গঠন দেখেই আমরা এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতিভুক্ত জীবকে আলাদা করতে পারি।

সমস্ত কোশের নিউক্লিয়াসের গঠন কি একইরকম?

বহুকোশী জীবের নিউক্লিয়াসের মতো নিউক্লিয়াস ব্যাকটেরিয়া কোশে থাকে না (নিউক্লীয় পর্দা ও নিউক্লীয় জালিকা অনুপস্থিত)। কিন্তু পেঁয়াজের কোশ বা মুখের ভেতরের দেয়ালের কোশ নিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় এদের নিউক্লিয়াস পর্দা দিয়ে ঘেরা। আর তার ভেতরে নিউক্লীয় জালিকা আছে।

প্রোক্যারিওটিক কোশ

ব্যাকটেরিয়া, সায়ানোব্যাকটেরিয়ার মতো পর্দাবিহীন নিউক্লীয় বস্তুযুক্ত কোশকে প্রোক্যারিওটিক (Pro : পুরোনো; Karyon : নিউক্লিয়াস) বলে। ব্যাকটেরিয়া ও সায়ানোব্যাকটেরিয়া ছাড়া অন্য অধিকাংশ উদ্ভিদ ও প্রাণীকোশের নিউক্লিয়াসে পর্দা ও নিউক্লীয় জালিকা দেখা যায়। এরা হলো ইউক্যারিওটস (Eu: প্রকৃত; Karyon: নিউক্লিয়াস)।

ইউক্যারিওটিক কোশ

কোশের অভ্যন্তরে নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজমকে একত্রে প্রোটোপ্লাজম বলে।

• অন্যান্য কোশীয় অঙ্গাণু (Other Cell Organelles)— কোশের সাইটোপ্লাজমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন ধরনের সূক্ষ্ম গঠনকে অঙ্গাণু বলা হয়। এরা একত্রেও নানা ধরনের শারীরবৃত্তীয় কাজে (খাদ্যবস্তুর পরিপাক, ভাঙন ও শক্তি উৎপাদন, প্রোটিন সংশ্লেষ, পরিবহণ, সঞ্চয় ও ক্ষরণ; কোশবিভাজন; খাদ্য ও বর্জ্য পদার্থ সঞ্চয়; প্রতিরক্ষা প্রদান) অংশগ্রহণ করে।

নীচে বিভিন্ন অঙ্গাণুর মডেলের ছবি দেখানো হয়েছে।

• মাইটোকনড্রিয়া (Mitochondria) (একবচনে মাইটোকনড্রিয়ন)— গোলাকার, ডিম্বাকার বা রডের মতো দেখতে। এর ধাত্রের মধ্যে নানা ধরনের উৎসেচক, রাইবোজোম ও নিউক্লিক অ্যাসিড **(DNA ও RNA)** থাকে। এরা খাদ্যের পরিপোষককে (গ্লুকোজ, অ্যামিনো অ্যাসিড, ফ্যাটি অ্যাসিড) ভেঙে শক্তি উৎপন্ন করে। এরা দুটি প্লাজমা পর্দা দিয়ে ঘেরা কোশীয় অঙ্গাণু। অন্তঃপর্দা ভাঁজ হয়ে ক্রিস্টি গঠন করে। মাইটোকনড্রিয়া শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়।

মাইটোকনড্রিয়ন

• এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা (Endoplasmic Reticulum)— এরা প্লাজমা পর্দা থেকে উৎপন্ন হয়ে নিউক্লীয় পর্দা পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। কতকগুলো পর্দাবেষ্টিত নানা আকারের নল নিয়ে এরা গঠিত। এরা সাইটোপ্লাজমকে কতকগুলো অসম্পূর্ণ প্রকোষ্ঠে ভাগ করে। কোনো কোনো পর্দার বাইরের দিকে প্রোটিন সংশ্লেষকারী রাইবোজোম যুক্ত থাকে। তাই এদের অমসৃণ দেখায়। আর কোনো পর্দার বাইরের দিকে রাইবোজোম না থাকায় মসৃণ হয়। বিভিন্ন কোশীয় বস্তুর (প্রোটিন ও লিপিড) সংশ্লেষ, পরিবহণ ও সঞ্চয়ে এই অঙ্গাণু অংশগ্রহণ করে।

অমসৃণ ও মসৃণ এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা

• গলজি বস্তু (Golgi bodies)— নিউক্লিয়াসের কাছে থাকা চ্যাপটা থলি, লম্বা থলি বা ছোটো গহ্বরের মতো গঠনযুক্ত অঙ্গাণু। এরা পরস্পর সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত থাকে। কোশমধ্যস্থ বিভিন্ন বস্তুর (হরমোন ও উৎসেচক) পরিবহণ ও ক্ষরণে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা থেকে গলজি বস্তুর সৃষ্টি হয়।

গলজি বস্তু

• লাইসোজোম (Lysosome)—গলজি বস্তু থেকে উৎপন্ন পর্দা দিয়ে ঘেরা থলির মতো অঙ্গাণু বিশেষ। এর মধ্যে খাদ্যকে হজম করার, জীবাণুদের মেরে ফেলার ও পুরোনো জীর্ণ কোশকে ধ্বংস করার জন্য নানা ধরনের উৎসেচক থাকে। কোশের মধ্যে এটি নানা রূপে অবস্থান করে (লাইসোজোমের বহুরূপতা)। লাইসোজোম যে কোশে থাকে সেই কোশকেই ধ্বংস করতে পারে বলে একে আত্মঘাতী থলি বলে। এই অঙ্গাণুর সক্রিয়তা বৃদ্ধি পেলে ক্যানসার হবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

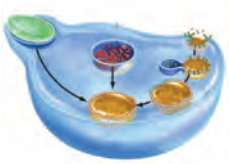
লাইসোজোম

• রাইবোজোম (Ribosome)---এরা পর্দাবিহীন। সাধারণত কোশের সাইটোপ্লাজমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও, অন্য কয়েকটি অঙ্গাণুর ভেতরে (মাইটোকনড্রিয়া, ক্লোরোপ্লাসটিড) কিংবা এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা ও নিউক্লীয় পর্দার বাইরের দিকেও এই অঙ্গাণুকে আবদ্ধ অবস্থায় দেখা যায়। প্রোটিন সংশ্লেষ করা এই অঙ্গাণুর প্রধান কাজ। সংশ্লেষিত প্রোটিন কোশের ক্ষয়পূরণে ও নতুন কোশ তৈরিতে অংশগ্রহণ করে। কোনো কোনো প্রোটিন কোশের বাইরেও ক্ষরিত হয়।

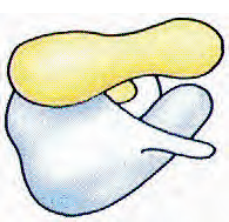
রাইবোজোম

- সেন্ট্রোজোম (Centrosome)---এরাও পর্দাবিহীন। প্রাণীকোশের বিভাজনে এই অঙ্গাণু অংশগ্রহণ করে।

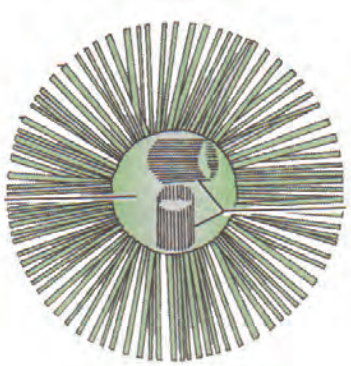

সেন্ট্রোজোম

উদ্ভিদ কোশ

সক্রিয়তামূলক কার্যাবলি

এবার একটি পেঁয়াজ নাও। পেঁয়াজের শুকনো, বাদামি খোসা ছাড়িয়ে ফেলো। ভেতরের যে-কোনো একটি সাদা শাঁসালো স্তর সংগ্রহ করো। এর থেকে একটি পাতলা স্তরকে আলাদা করো। এবার এর প্রস্থচ্ছেদ করো। প্রস্থচ্ছেদে যে অংশটি পাওয়া গেল তাকে স্লাইডে রেখে তার মধ্যে কয়েকফোঁটা মিথিলিন ব্লু যোগ করো। এবার কভার স্লিপ দিয়ে চাপা দিয়ে মাইক্রোস্কোপের নীচে লক্ষ করো।

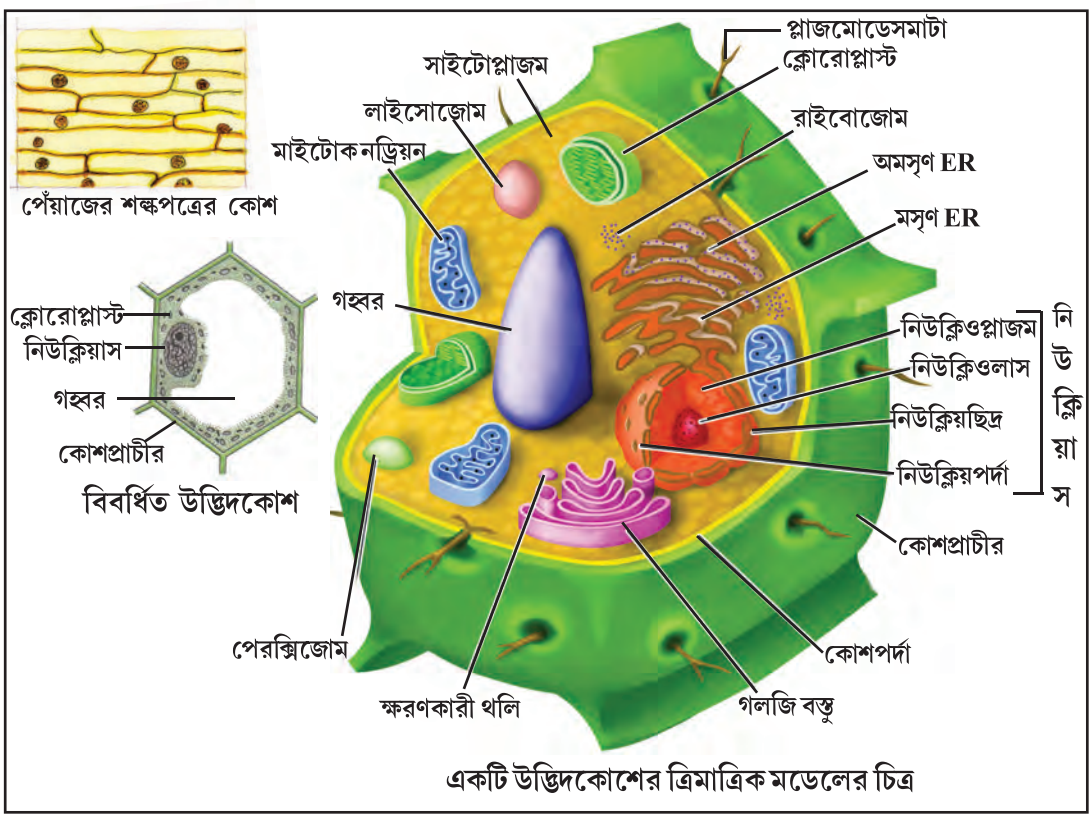

দেখোতো, কোন কোন অঙ্গাণু প্রাণীকোশে আছে আবার উদ্ভিদ কোশেও আছে। সেগুলো নীচের ছকে লেখো। আবার কোন কোন অঙ্গাণু প্রাণীকোশে নেই অথচ উদ্ভিদকোশে আছে তার নামও ওই ছকে লেখো।

প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয় কোশে আছে	প্রাণীকোশে নেই অথচ উদ্ভিদকোশে আছে

পেঁয়াজের কোশে প্লাজমা পর্দার বাইরে একটি অতিরিক্ত পুরু স্তর দেখা যায়। এই স্তরটি হলো কোশপ্রাচীর (Cell Wall)। প্রাণীকোশে এটি দেখা যায় না।

কোশপ্রাচীর ও কিছু কথা

উদ্ভিদকোশের বাইরে যে বিস্তৃত বহিঃকোশীয় ধাত্র থাকে তাই হলো কোশপ্রাচীর। এটি মৃত, পুরু, শক্ত এবং দৃঢ়। পরিবেশে প্রায়ই তাপমাত্রার পার্থক্য হয়। বায়ু প্রবাহের গতি বাড়ে বা কমে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণেরও হেরফের হয়। স্থান পরিবর্তন না করতে পারার জন্য সবসময়েই উদ্ভিদকে এধরনের পরিবেশের প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। উদ্ভিদকোশের তাই অতিরিক্ত সুরক্ষার প্রয়োজন হয়। কোশপ্রাচীর উদ্ভিদকে এই অতিরিক্ত সুরক্ষা দিয়ে থাকে।

কোশপ্রাচীরে ছিদ্রের সংখ্যা নির্দিষ্ট। পরিবেশ ও উদ্ভিদকোশের মধ্যে বৃহৎ অণুর আদান-প্রদানও সীমিত। কোশপ্রাচীরের যান্ত্রিক দৃঢ়তার জন্য বাইরে লঘুসারক (হাইপোটনিক) দ্রবণ থাকলেও উদ্ভিদকোশ সহজেই বেঁচে থাকতে পারে। এই কোশপ্রাচীরের রাসায়নিক গঠনের পার্থক্যের জন্য উদ্ভিদের কোনো অঙ্গ নরম, মাঝারি শক্ত বা খুব শক্ত ও দৃঢ় হয়।

কোশপ্রাচীরের উপস্থিতির জন্যই উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের মধ্যে আন্তঃকোশীয় সংযোগ, বৃদ্ধি, জলসাম্য বজায় রাখা, পুষ্টি, বংশবিস্তার, প্রতিরক্ষা ও বাহ্যিক গঠনের নানা পার্থক্য চোখে পড়ে।

তুমি যখন মাইক্রোস্কোপের নীচে পেঁয়াজের কোশ লক্ষ করছিলে তখন কি কোনো ফাঁকা গঠন তোমার চোখে পড়েছে?

যদি এমন গঠন তোমার চোখে পড়ে, তবে জানবে এরা হলো গহ্বর (Vacuole)। পেঁয়াজের কোশে এরা সংখ্যায় একটি আর আকৃতিতেও বড়ো। কিন্তু মুখগহ্বরের কোশে এরা সংখ্যায় অনেক আর আকৃতিতে ছোটো। সাধারণত উদ্ভিদকোশে বৃহদাকৃতির গহ্বর আর প্রাণীকোশে ছোটো আকারের গহ্বর দেখা যায়। উদ্ভিদকোশে গহ্বরের বাইরে কোনো পর্দা থাকে না। গহ্বরের আকার ক্রমশ যখন বাড়তে থাকে, তখন নিউক্লিয়াসসহ সাইটোপ্লাজম কোশপ্রাচীরের ভেতরের দিকে কোশের পরিধির দিকে সরে যায়। গহ্বরকে বেষ্টন করে সাইটোপ্লাজমের এরকম বিন্যাসকে প্রাইমরডিয়াল ইউট্রিকল বলে। উদ্ভিদকোশের গহ্বরে জল, অক্সিজেন, রেচন পদার্থ ইত্যাদি জমা থাকে।

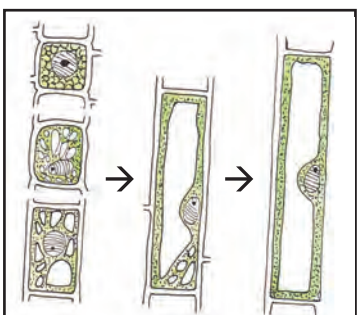
প্রাইমরডিয়াল ইউট্রিকল

উদ্ভিদকোশ সাইটোপ্লাজমের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি হলেও কুঁচকে যায় না। উদ্ভিদদেহ গঠনে গহ্বর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোশের আকার (Size) বাড়বে না কমবে তা কোশের মধ্যে জলের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। উদ্ভিদ মাটি থেকে কত পরিমাণ জল শোষণ করতে পারে তার উপর নির্ভর করে গহ্বর জল গ্রহণ করবে না ছাড়বে। প্রখর সূর্যালোকে দীর্ঘ সময় কোনো গাছের চারাকে রাখলে পাতাগুলো নুইয়ে পড়ে। আবার জলের উৎসের সংস্পর্শে এলে গাছটি আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসে। কারণটি তোমরা বোঝার চেষ্টা করো।

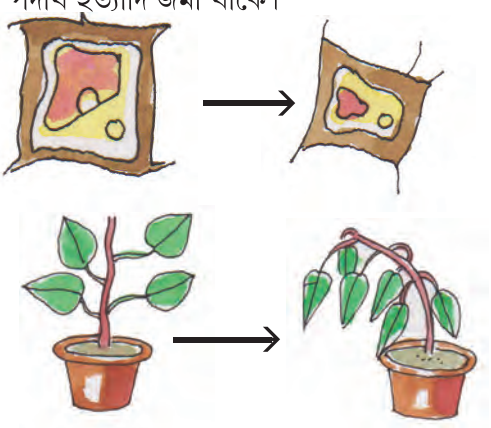

উদ্ভিদ ও প্রাণীকোশে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে আর কি কোনো পার্থক্য তোমার চোখে পড়েছে?

পাতাশেওলা, ঝাঁঝির কোশ নিয়ে তুমি যদি রং করে দেখো তবে দেখতে পাবে সাইটোপ্লাজমে এক ধরনের রঙিন গঠন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এরা হলো প্লাসটিড (Plastids)। রং করার পর এরা নানা রং-এর হয়ে থাকে। এদের কারো মধ্যে সবুজ রং-এর রঞ্জক ক্লোরোফিল থাকে। এরা হলো ক্লোরোপ্লাসটিড। ক্লোরোপ্লাস্টিড - এর মধ্যে গ্রানা নামক এক বিশেষ গঠন দেখা যায়। এদের উপস্থিতির জন্য উদ্ভিদের নানা অঙ্গ সবুজ হয়। ক্লোরোপ্লাস্টের ধাত্রেও নিউক্লিক অ্যাসিড (DNA ও RNA) থাকে। উদ্ভিদদেহের কোথায় কোথায় ক্লোরোপ্লাস্ট দেখা যায় তার একটি তালিকা তৈরি করো।

(1) ..... (2) ..... (3) ..... (4) .....

উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করে। ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে থাকা ক্লোরোফিল এই প্রক্রিয়ায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। ক্লোরোপ্লাসটিড ছাড়া আরও দু-ধরনের প্লাসটিড উদ্ভিদকোশে দেখা যায়। দ্বিতীয় ধরনের প্লাসটিডে কমলা, লাল, হলুদ ও অন্যান্য বর্ণের (সবুজ ব্যতীত) রঞ্জক থাকে। এরা ফুল ও ফলের বর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে। এদের ক্রোমোপ্লাসটিড বলা হয়। আর তৃতীয় ধরনের প্লাসটিড বর্ণহীন। নানাধরনের খাদ্য সঞ্চয় করে। এদের লিউকোপ্লাসটিড বলা হয়।

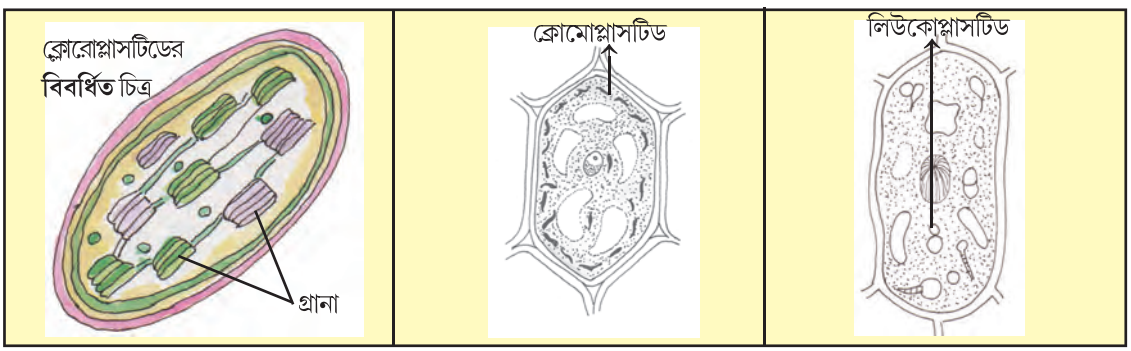

উদ্ভিদ ও প্রাণীকোশ কি একইরকম না আলাদা?

তুমি যদি পেঁয়াজ কোশ ও মুখের ভেতরের দেয়ালের কোশ ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে থাকো, তবে তাদের ছবিগুলো খাতায় এঁকে আবার লক্ষ করো ও বিভিন্ন অংশগুলি চিহ্নিত করো।

পেঁয়াজের কোশ

মুখের ভেতরের দেয়ালের কোশ

বৈশিষ্ট্য	উদ্ভিদকোশ	প্রাণীকোশ
(1) কোশপ্রাচীর		
(2) গহ্বর		
(3) প্লাসটিড		
(4) সেন্ট্রোজোম		

এবার এসো উদ্ভিদ ও প্রাণীকোশের গঠনগত বিভিন্ন অংশকে একসঙ্গে আরেকবার জেনে ও বুঝে নিই।

অঙ্গাণুর নাম	অবস্থান (উদ্ভিদকোশ/প্রাণীকোশ)	বৈশিষ্ট্য	কাজ
(1) কোশপ্রাচীর			
(2) প্লাজমা পর্দা			
(3) সাইটোপ্লাজম			
(4) নিউক্লিয়াস			
(5) মাইটোকনড্রিয়া			
(6) গলজি বস্তু			
(7) লাইসোজোম			
(8) সেন্ট্রোজোম			
(9) রাইবোজোম			
(10) প্লাসটিড			
(11) গহ্বর			

- দেখোতো, নীচের ছকে দু-পাশের কথাগুলো দাগ টেনে মেলাতে পারো কিনা। ডানদিকে একটি বাড়তি নাম দেওয়া আছে।

A স্তম্ভ	B স্তম্ভ
(ক) যে অঙ্গাণু কোশের শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়	(i) লাইসোজোম
(খ) প্রাণীকোশ বিভাজনে যে অঙ্গাণু অংশগ্রহণ করে ।	(ii) ভ্যাকুওল
(গ) উদ্ভিদকোশে যে অংশ থাকার জন্য গাছের গুঁড়ি ভীষণ শক্ত হয়।	(iii) গলজিবডি
(ঘ) কোশের যে অংশটির মধ্যে জিন থাকে।	(iv) নিউক্লিয়াস
(ঙ) চ্যাপটা থলি লম্বা থলি আর ছোটো গহ্বরের ভাঁড়ার।	(v) প্লাসটিড
(চ) রোগজীবাণু পাচন করে ধ্বংস করার সময়ে শ্বেতরক্তকণিকায় যে অঙ্গাণুর সংখ্যা বাড়ে।	(vi) মাইটোকনড্রিয়া (vii) রাইবোজোম

A স্তম্ভ	B স্তম্ভ
(ছ) উদ্ভিদকোশে এখানে জল, খাদ্য, রেচনদ্রব্য, বায়ু এসব জমানো থাকে।	(viii)কোশপ্রাচীর
(জ) সাইটোপ্লাজমকে কতকগুলি অসম্পূর্ণ প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করে।	(ix) সেন্ট্রোজোম
(ঝ) খাদ্য তৈরি করে, খাদ্য সঞ্চয় করে, আবার ফুল-ফলের রং-ও নির্ধারণ করে।	(x) এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা
(ঞ) প্রোটিন সংশ্লেষকারী কোশে এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকার বাইরের দেয়ালে যা লেগে থাকার জন্য অমসৃণ লাগে।	(xi)কোশপর্দা

- নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও (একের বেশি উত্তর ঠিক হতে পারে)।

(i) প্রোটিন তৈরি করতে সাহায্য করে :

(i) লাইসোজোম (ii) রাইবোজোম (iii) নিউক্লিওলাস (iv) গলজি বস্তু (v) সাইটোপ্লাজম (vi) এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা (vii) ক্ষরণ দানা (viii) ভ্যাকুওল (টিক দাও)

(ii) কোশের নানা উপাদান সংশ্লেষ, সঞ্চয় আর ক্ষরণ করতে সাহায্য করে।

(i) এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা (ii) গলজি বস্তু (iii) লাইসোজোম (iv) সেন্ট্রোজোম (v) ভ্যাকুওল (টিক দাও)

- কোন কোন অঙ্গাণু একটি অপরটির বিপরীত কাজ করে খুঁজে বার করে লেখো।

(i) উদ্ভিদকোশে খাদ্য সংশ্লেষ ও ভাঙন

(ii) প্রাণীকোশে কোশের ভেতরে প্রোটিন সংশ্লেষ ও প্রোটিন পাচন

- কোশের কোন অঙ্গাণু থেকে কোন অঙ্গাণুটি উৎপন্ন হয় লেখো।

(i) গলজি বস্তু : মাইটোকনড্রিয়া/কোশপর্দা/ এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা

(ii) লাইসোজোম :সেন্ট্রোজোম/ গলজি বস্তু/ এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা

(iii) এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা : কোশপর্দা/প্লাসটিড/ গলজি বস্তু

(iv) রাইবোজোম : নিউক্লিওলাস/ সেন্ট্রোজোম/ লাইসোজোম

- নখ ও চুলের প্রান্তদেশের কোশগুলি বারবার বিভাজিত হয়ে নখ আর চুলের বৃদ্ধি ঘটায়। এই কোশগুলিতে কোন অঙ্গাণুটি খুব সক্রিয় থাকে?
- শ্বেতরক্তকণিকাগুলি নিজের কোশের মধ্যে রোগজীবাণুদের পাচন করে ধ্বংস করে। ওই সময়ে কোন অঙ্গাণুটির সংখ্যা বেড়ে যায় ও কেন?

- খাওয়ার পরেপরেই পাকস্থলীর উৎসেচক ক্ষরণকারী গ্রন্থিকোশগুলিতে কোন অঙ্গাণুটির সংখ্যা খুব বেড়ে যায়?
- অন্ত্রের দেয়ালের পেশিকোশগুলি আস্তে আস্তে নড়াচড়া করে। কিন্তু হাত-পায়ের পেশিকোশগুলি নড়াচড়া করে খুব তাড়াতাড়ি। তাহলে হাত-পায়ের পেশির কোশে কোন অঙ্গাণুটি অনেক সংখ্যায় আছে?
- যেমন করে পেঁয়াজের শল্কপত্রের কোশ দেখেছিলে, তেমনি করে স্লাইডের ওপর রেখে পর্যবেক্ষণ করো এবং কীরকম কোন কোশ পেলে লেখো ঃ

  (i) পুঁই বা লাউডাঁটার ছাল

  (ii) পুঁই অথবা লিলিপাতার ছাল

  (iii) ভাঙা ডিমের ভাসতে থাকা পর্দার মতো অংশ (মুরগির ভ্রূণ)

  (iv) মাংসের গায়ে লেগে থাকা সাদা পর্দার মতো অংশ

বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশ ও কোশের ওপর প্রভাব

জীবজগৎ নানাধরনের পরিবেশে বাস করে। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান (বায়ুর উষ্ণতা, আর্দ্রতা, অক্সিজেনের পরিমাণ, সালফারের পরিমাণ, চাপ) -এর সঙ্গে মানিয়ে চলার জন্য জীবদেহে গঠনগত ও কার্যগত নানা বৈচিত্র্য চোখে পড়ে। আর এই গঠনগত ও কার্যগত নানা বৈচিত্র্যের প্রকাশ কোশীয় পরিবেশেও চোখে পড়ে। এবার দেখা যাক জীবরা কত বিভিন্ন ধরনের পরিবেশে নিজেদের মানিয়ে নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করে।

(1) খুব শুকনো ও অত্যন্ত গরম পরিবেশ (মরু অঞ্চল)

(2) খুব শুকনো ও অত্যন্ত ঠান্ডা পরিবেশ (মেরু অঞ্চল)

(3) জলজ পরিবেশ (পুকুর, হ্রদ, নদী, খাল, বিল ইত্যাদি)

(4) লবণাক্ত পরিবেশে (সমুদ্র, খাঁড়ি, মোহনা)

(5) কম অক্সিজেনযুক্ত পরিবেশ

(6) অধিক সালফার যুক্ত পরিবেশ

(7) পচনশীল জৈব পদার্থযুক্ত পরিবেশ

(8) বায়বীয় পরিবেশ

(9) উচ্চ চাপযুক্ত পরিবেশ (সমুদ্রের গভীর অঞ্চলে)

(10) অধিক উচ্চতাযুক্ত পরিবেশ (15000 ফুটের অধিক উচ্চতায়)

বিভিন্ন পরিবেশ ও জীবের নানান সমস্যা :

এসো দেখি ওই পরিবেশে বাস করা জীবরা কী করে নিজেরাই এই সমস্যা সমাধান করেছে?

- খুব শুকনো ও গরম পরিবেশে ক্যাকটাস জাতীয় উদ্ভিদ জন্মায়। এদের কাণ্ডের কোশে জল

সঞ্চয়ী উপাদান মিউসিলেজের আধিক্য চোখে পড়ে। আর কোশের বাইরে মোমজাতীয় পদার্থের আস্তরণ দেখা যায় যা বাষ্পমোচনের হার কমায়।

ক্যাকটাস

- খুব শুকনো ও ঠান্ডা পরিবেশে বসবাসকারী প্রাণীদের কোশে অ্যান্টিফ্রিজ প্রোটিন থাকে যা কোশীয় তরলে বরফের কেলাস তৈরিতে বাধা দেয়। এছাড়াও তাপ সংরক্ষণের প্রয়োজনে এদের দেহে ফ্যাট সঞ্চয়কারী কোশের প্রাচুর্য থাকে।
- মিষ্টিজলে বসবাসকারী উদ্ভিদের পুষ্প ও পত্রবৃন্তে বায়ুগহ্বরযুক্ত প্যারেনকাইমা কোশ থাকে। এধরনের কোশ থাকার জন্য এরা সহজেই জলে ভেসে থাকতে পারে।
- লবণাক্ত পরিবেশে বসবাসকারী উদ্ভিদের মূলে লবণপূর্ণ কোশ থাকে। প্রাণীদের ফুলকায় ক্লোরাইড কোশ থাকে যা অতিরিক্ত Na^+ ও Cl^- দেহ থেকে বার করে দিতে পারে।

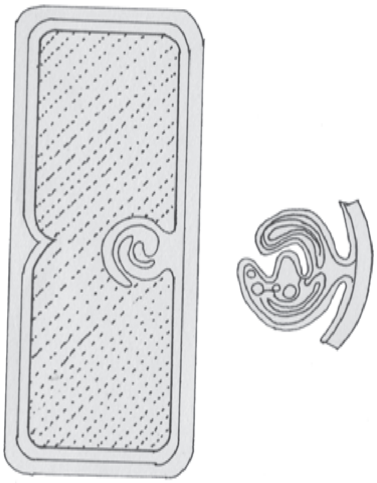

মেসোজোম

- কম অক্সিজেনযুক্ত পরিবেশে বিকল্প শ্বসন চালানোর জন্য ব্যাকটেরিয়ার কোশে মাইটোকনড্রিয়া অনুপস্থিত। পরিবর্তে কোশপর্দা ভিতরে সাইটোপ্লাজমের দিকে ভাঁজ হয়ে থলির মতো মেসোজোম গঠন করে। মেসোজোম শ্বসনে অংশগ্রহণ করে।
- উষ্ণ ও অধিক সালফার বা সালফার যৌগযুক্ত পরিবেশে বসবাসকারী ব্যাকটেরিয়া বিভিন্ন বিজারণ বিক্রিয়ার সাহায্যে শক্তি সংগ্রহ করে।
- পচনশীল জৈবপদার্থ যুক্ত পরিবেশে বসবাসকারী জীবদেহের কোশে অধিক অম্লত্ব সহ্য করার ক্ষমতা বর্তমান।
- বায়বীয় পরিবেশে উড়তে ও ভেসে থাকতে সক্ষম প্রাণীদের লোহিতরক্তকণিকায় অতিরিক্ত অক্সিজেন পরিবহণের প্রয়োজনে অধিক মাত্রায় হিমোগ্লোবিন থাকে। খাদ্য ভেঙে দ্রুত শক্তি পাওয়ার প্রয়োজনে কোশে মাইটোকনড্রিয়ার সংখ্যার আধিক্যও চোখে পড়ে। পতঙ্গের দ্রুত ডানা ঝাপটানোর প্রয়োজনে ডানা সংলগ্ন পেশিকোশের এত সংখ্যক মাইটোকনড্রিয়া থাকে যে তারা একত্রিত হয়ে প্রায় কেলাসাকার গঠন সৃষ্টি করে।
- সমুদ্রের গভীরে উচ্চচাপযুক্ত পরিবেশে যে সকল প্রাণী বসবাস করে তাদের কোশেও মাইটোকনড্রিয়া সংখ্যায় বেশি থাকে। অন্তঃকঙ্কালের কোশে ক্যালশিয়ামের মাত্রা তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে।
- অধিক উচ্চতা যুক্ত পরিবেশে বসবাসের জন্য প্রাণীদের রক্তে লোহিতরক্তকণিকার সংখ্যা বেড়ে যায়। পেশিকোশে মাইটোকনড্রিয়া ও মায়োগ্লোবিনের (অক্সিজেন সরবরাহকারী শ্বাসরঞ্জক) সংখ্যা ও পরিমাণ স্বাভাবিকের থেকে অনেক বেড়ে যায়। লোহিতরক্তকণিকার সংখ্যা বাড়ায় তাতে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণও বেড়ে যায়।

7 অণুজীবের জগৎ

অণুজীবের বৈচিত্র্য

ওপরে বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীদের ছবি লক্ষ করো। এরা পরিবেশের সজীব উপাদান। বায়ু, জল, মাটি অথবা অন্য নানা জায়গায় এদের দেখা যায়। কিন্তু আমরা কী জানি আমাদের চারদিকে এরা ছাড়াও আরও নানা ধরনের জীব ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এদের খালি চোখে দেখা যায় না। এরা হলো অণুজীব। আমরা এই অদৃশ্য অণুজীবদের সম্পর্কে এসো জানার চেষ্টা করি।

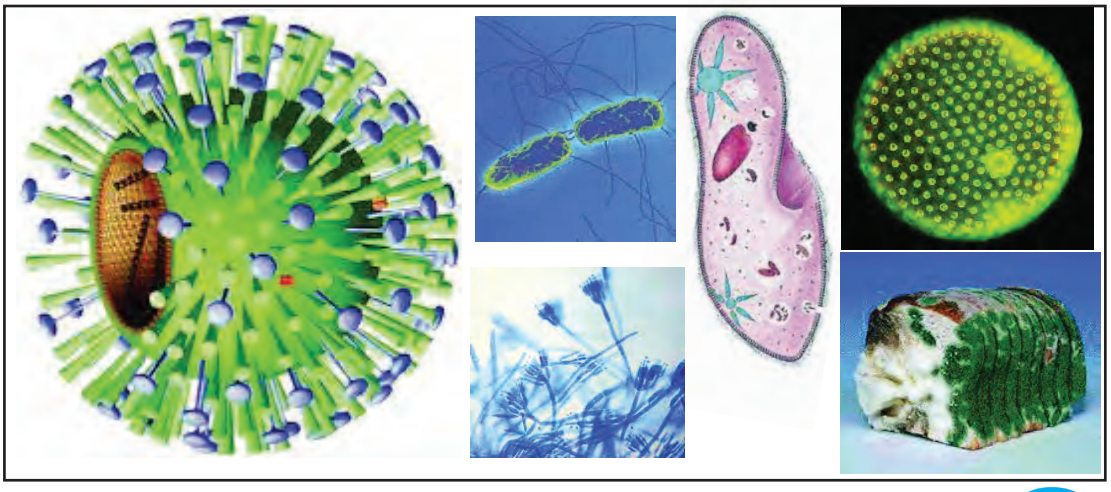

তোমার কাজ

বর্ষাকালে পাঁউরুটি ভিজে গেলে বা জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে দীর্ঘক্ষণ থাকলে তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়। এর ওপরে ধূসর সাদা রঙের স্তর তৈরি হয়। একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস (Magnifying glass) জোগাড় করে তা দিয়ে পাঁউরুটির ওপর ছাপছাপ জায়গাগুলো দেখার চেষ্টা করো। তুমি কতকগুলো খুব ছোটো, সূক্ষ্ম কালো রঙের গোল গোল কিছু দেখতে পাবে। এই ধরনের গঠন কী এবং এরা কোথা থেকে আসে?

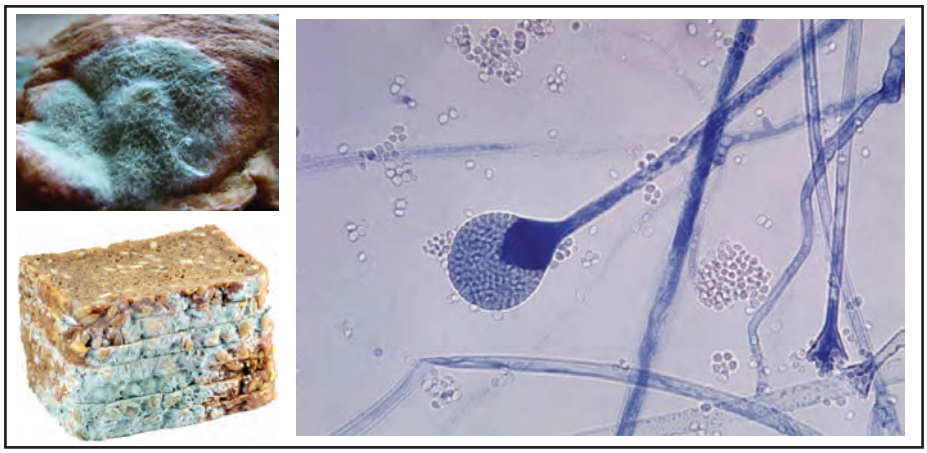

তুমি আর কোথায় কোথায় অণুজীব দেখতে পারো

(a) নীচের নমুনাগুলো সংগ্রহ করে প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদা ভাবে রাখো। কাছাকাছি কোনো আবদ্ধ জলাশয় বা পুকুর থেকে একটা গ্লাসে কিছুটা জল নাও। একটুকরো কাপড়ের মধ্য দিয়ে জলটাকে যেতে দাও। তারপর ছাঁকা পুকুরের জলকে রেখে দাও।

(b) একটা পাতা সংগ্রহ করো। এর ওপরের তলটা জল দিয়ে ভালো করে ধোও এবং ধোওয়া জলটা সংগ্রহ করো।

(c) তোমার নোংরা হাত জল দিয়ে ধোও এবং ধোওয়ার সময় সেই জল একটা পাত্রে সংগ্রহ করো।

(d) এক-দু-ফোঁটা দই নিয়ে তাতে একটু জল মেশাও।

(e) তোমার আশপাশের জমি থেকে কিছুটা ভেজা মাটি সংগ্রহ করো। মাটির নমুনাকে বিকারে রেখে জল মেশাতে থাকো। মাটির কণা তলায় থিতিয়ে পড়লে ওপরের জল সংগ্রহ করো।

যখন তুমি ওপরের যে-কোনো নমুনা লক্ষ করবে, দেখবে সবগুলোই প্রায় স্বচ্ছ। কিন্তু গ্লাস স্লাইডে যে-কোনো নমুনার এক-দু-ফোঁটা নিয়ে মাইক্রোস্কোপের নীচে দেখলে দেখবে কত ছোটো ছোটো জীব তাতে ভেসে আছে। কিলবিল করছে বা এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে। এর থেকে কী কী সিদ্ধান্তে তুমি আসতে পারো?

1.

2.

অণুজীবদের কথা

পৃথিবীতে আজ অবধি যতরকম জীবের অস্তিত্ব লক্ষ করা গেছে তার মধ্যে সব থেকে পুরোনো হলো এই অণুজীবরা। প্রায় 350 কোটি (3.5 বিলিয়ন) বছর ধরে এরা পৃথিবীতে টিঁকে আছে। কিন্তু তার পরে আসা বহু জীব পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অণুজীবদের সবার ওজন যদি যোগ করা যায়, তবে দেখা যাবে খালিচোখে দেখতে না পাওয়া এই অণুজীবদের ভর পৃথিবীর সমস্ত জীব-ভরের প্রায় 60%। আমরা প্রশ্বাসের সময় যে পরিমাণ (O_2) গ্রহণ করি তার অর্ধেক পরিমাণই তৈরি করে বিশেষ কিছু অণুজীব। তোমার পায়ের নীচে যে মাটি আছে তাতে প্রায় বহু ধরনের অণুজীব বসবাস করে। আর এক গ্রাম মাটিতে প্রায় 100 কোটি অণুজীব থাকে।

অণুজীবদের বৈশিষ্ট্য :

1. পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র এদের পাওয়া যায়— গরম মরুভূমি, মেরু অঞ্চলের বরফের স্তূপে, নোনা জলে, জলাভূমিতে, উষ্ণ প্রস্রবণে, এমনকী অন্য জীবদেহের ভেতরেও (মানুষের খাদ্যনালিতে, উইপোকার খাদ্যনালিতে)। কোথায় কোথায় অণুজীব থাকতে পারে তা আলোচনা করে লেখো।

2. অধিকাংশ অণুজীবদের বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় আবার ইস্ট কিংবা টিটেনাস রোগসৃষ্টিকারী অণুজীবরা কম অক্সিজেন ঘনত্বেও বেঁচে থাকতে পারে। পরিবেশের কোন কোন স্থানে অক্সিজেনের ঘনত্ব বেশি বা কম থাকে তা আলোচনা করে লেখো।

3. এদের বেঁচে থাকার জন্য ভেজা জায়গা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

4. অন্ধকারময় জায়গায় এরা তাড়াতাড়ি বাড়ে। সরাসরি সূর্যের আলোর সংস্পর্শে এলে কোনো কোনো অণুজীব মারা যায়।

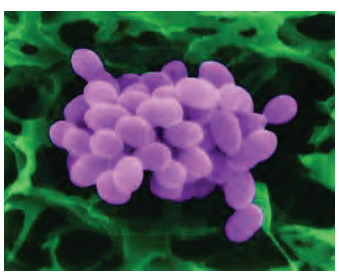

5. এদের কেউ কেউ পচা-গলা বস্তু থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। আবার অন্যরা অন্য কোনো জীবদেহে বাসা বাঁধে ও ওই জীবদেহের নানা অঙ্গ, তরল বা কলাকোশ থেকে বেঁচে থাকার খাদ্য সংগ্রহ করে। আবার কেউ কেউ নিজেদের খাদ্য নিজেরাই তৈরি করে নিতে পারে।

(i) অন্য কোনো জীবদেহে বাসা বাঁধে বা অন্য কোনো জীবদেহ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। এমন ধরনের অণুজীব হলো ভাইরাস, কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়া (মোনেরা), ছত্রাক ও কোনো কোনো আদ্যপ্রাণী (প্রোটিস্টা)।

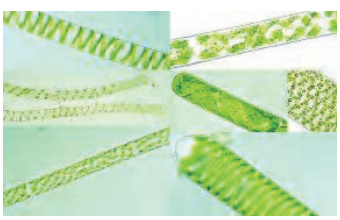

(ii) অ্যালগি ও কয়েক ধরনের অণুজীব নিজেদের খাদ্য নিজেরাই তৈরি করতে পারে।

6. সাধারণত বেশিরভাগ অণুজীব 25^0C থেকে 38^0C তাপমাত্রার মধ্যে তাড়াতাড়ি বাড়ে ও বেঁচে থাকে। তবে কোনো কোনো অণুজীব -10^0C এর নীচে বা 100^0C তাপমাত্রার ওপরেও বেঁচে থাকতে পারে। বিশেষ কিছু থার্মোফিলিক ব্যাকটেরিয়া 100^0C তাপমাত্রার কাছাকাছি বংশবৃদ্ধি করে। নানান উষ্ণ প্রস্রবণের জলে বা গভীর সমুদ্রের গরম জল বেরোবার উৎসের (hydrothermal vent) কাছাকাছি থার্মোফিলিক ব্যাকটেরিয়া পাওয়া যায়।

7. অনেকক্ষেত্রে অণুজীবদের অণুবীক্ষণের মধ্যে দিয়ে দেখার সময় বিশেষ বিশেষ রঙের সাহায্যে রাঙিয়ে নিতে হয়। এই রঙগুলোকে বলে স্টেইন (Stain) এবং রাঙিয়ে নেবার পদ্ধতিকে বলে স্টেইনিং (Staining)।

অণুজীবরা কত ধরনের

অণুজীবরা প্রধানত চার ধরনের। এরা হলো —

- ব্যাকটেরিয়া (মোনেরা)
- আদ্যপ্রাণী (প্রোটিস্টা)
- ছত্রাক (ফাংগি)
- শৈবাল (প্লান্টি)

এছাড়া ভাইরাসরাও আণুবীক্ষণিক। আর এরাও নানারকম ভূমিকা (উপকারী বা অপকারী) পালন করে।

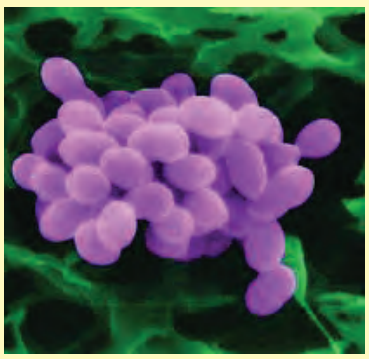

(A) ব্যাকটেরিয়া (মোনেরা)

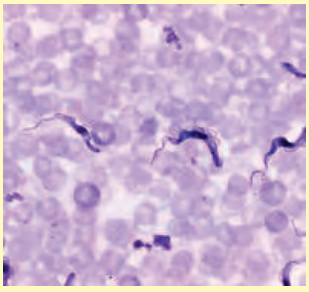

(B) আদ্যপ্রাণী (প্রোটিস্টা)

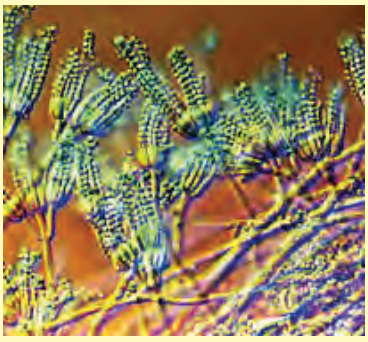

(C) ছত্রাক (ফাংগি)

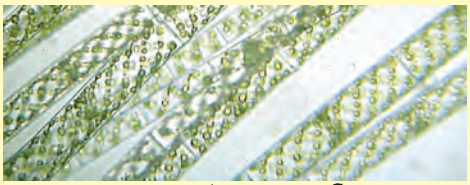
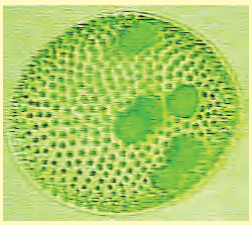

(D) শৈবাল (প্লান্টি)

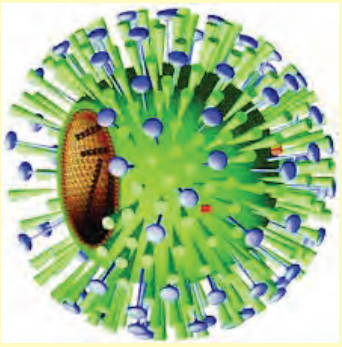

(E) ভাইরাস

ব্যাকটেরিয়া

- জীবজগতের কোশীয় জীবদের মধ্যে আকারে সবথেকে ছোটো ও কোশীয় গঠনের দিক থেকে সরলতম।
- এরা নানা আকারের হয় — কমা, রড, প্যাঁচানো স্ক্রু, বা গোলাকার।
- কোশপ্রাচীর থাকলেও উদ্ভিদ কোশের মতো নয়।
- প্রকৃত নিউক্লিয়াস থাকে না, পরিবর্তে প্যাঁচানো DNA থাকে।
- একক পর্দা দিয়ে ঘেরা কোনো অঙ্গাণু (যেমন-মাইটোকনড্রিয়া, লাইসোজোম, প্লাস্টিড ইত্যাদি) থাকে না। তবে পর্দাবিহীন অঙ্গাণু রাইবোজোম থাকে।

টুকরো কথা

লুই পাস্তুর

1674 সালে আন্তন ফন লিভেনহিক নামে হল্যান্ডের এক লেন্স ও অণুবীক্ষণ যন্ত্র প্রস্তুতকারক সর্বপ্রথম নিজের তৈরি অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ব্যাকটেরিয়ার অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। ফরাসি বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর জলাতঙ্কের টিকা ও জার্মান বিজ্ঞানী রবার্ট কখ নানা রোগসৃষ্টিতে (যক্ষ্মা ও কলেরা) ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা আবিষ্কার করেন। এরেনবার্গ (1828) ব্যাকটেরিয়া শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। বর্তমানে ব্যাকটেরিয়াকে 'মোনেরা' গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়।

রবার্ট কখ

আদ্যপ্রাণী

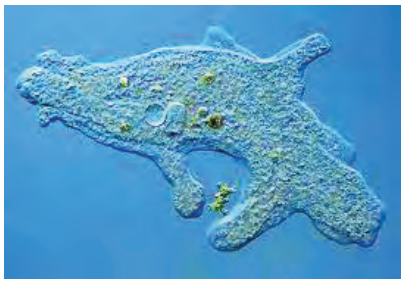

অ্যামিবা

- এদের দেহ একটিমাত্র কোশ নিয়ে গঠিত। এদের এখন প্রোটিস্টা বলা হয়। কোশে এক বা একাধিক নিউক্লিয়াস থাকে।
- এরা নানা আকারের হয় — গোলাকার, ডিম্বাকার, লম্বা বা থালার মতো।
- এরা স্বাধীনভাবে একা থাকে। আবার অনেকে মিলে একসঙ্গে থাকে। আবার কেউ কেউ পোষক কোশের মধ্যে থেকে নানা রোগ সৃষ্টি করে।
- এরা নানাভাবে চলাচল করে। কারো দেহে ক্ষণপদ, আবার কারোর দেহে চাবুকের মতো ফ্ল্যাজেলা বা চুলের মতো সিলিয়া থাকে।

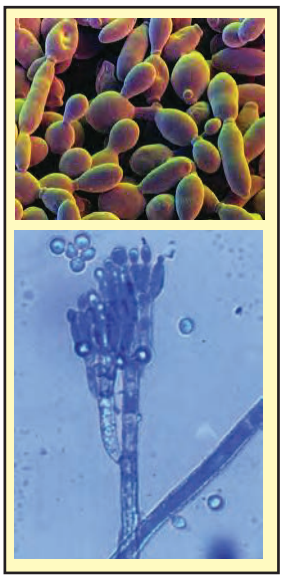

ওপরে ইস্ট ও নীচে পেনিসিলিয়াম

ছত্রাক

- এদের দেহকে মূল, কাণ্ড বা পাতায় আলাদা করা যায় না।
- এদের দেহ এককোশী গোলাকার (ইস্ট) বা সরু সুতোর মতো অংশ দিয়ে তৈরি। এই সুতোর মতো অংশের নাম হলো হাইফি। হাইফি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শাখাপ্রশাখায় ভাগ হয়ে নিজেদের মধ্যে জট পাকিয়ে মাইসেলিয়াম নামে একরকম গঠন তৈরি করে। মিউকর, পেনিসিলিয়াম ছত্রাকে এই ধরনের গঠন দেখা যায়। 194 পৃষ্ঠার ছত্রাকের ছবিগুলোতে প্রথম দুটি ছত্রাক আণুবীক্ষণিক এবং তৃতীয় ছত্রাকটি খালি চোখে দেখা যায়।
- এদের কোশে কোশপ্রাচীর, নিউক্লিয়াস, নানা অঙ্গাণু থাকলেও ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে না। তাই এরা নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে না।
- এদের কোশপ্রাচীর সবুজ উদ্ভিদের কোশের মতো নয়।
- এরা জলে, স্থলে, আলোর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে থাকতে পারে।

শৈবাল

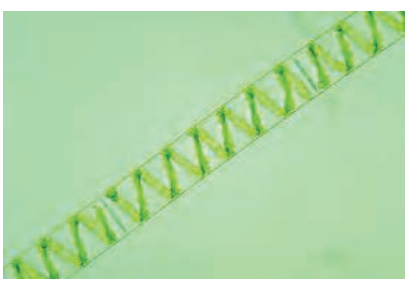

স্পাইরোগাইরা

- এদের দেহকেও ছত্রাকের মতো মূল, কাণ্ড বা পাতায় আলাদা করা যায় না।
- এদের দেহ এককোশী বা বহুকোশী। অনেকসময় একাধিক কোশ পরস্পর যুক্ত হয়ে বলের মতো গঠন তৈরি করে (এককোশী— ক্ল্যামাইডোমোনাস; এককোশী কিন্তু কোশগুলি পরস্পর যুক্ত— ভলভক্স; বহুকোশী — স্পাইরোগাইরা)।
- এদের কোশে কোশপ্রাচীর, নিউক্লিয়াস, নানা অঙ্গাণু থাকে। নানা আকৃতির ক্লোরোপ্লাস্ট থাকায় এরা নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে।
- এদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য আলোর প্রয়োজন হয়।
- প্রধানত জলে থাকে।

ভাইরাস

এডওয়ার্ড জেনার

বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড জেনারের (1796) বসন্তরোগ সম্পর্কে গবেষণা থেকে আমরা ভাইরাসের কথা জানতে পারি। তবে 1940-এর দশকে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কারের আগে কোনো ভাইরাসকে দেখা সম্ভব হয়নি। সাধারণ অণুবীক্ষণে ভাইরাস দেখা যায় না। ভাইরাস কথাটির শব্দগত অর্থ হলো বিষ।

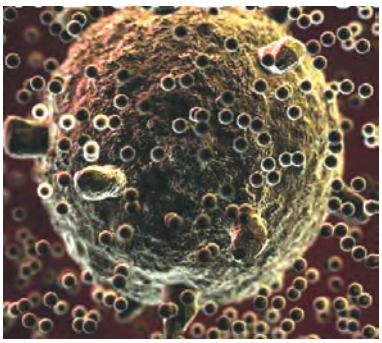
চিকেন পক্স ভাইরাস

- এদের কোনোরকম কোশীয় গঠন নেই।
- এদের কোনো কোশ আবরণী, সাইটোপ্লাজম বা নিউক্লিয়াস থাকে না। পরিবর্তে বাইরে প্রোটিনের তৈরি খোলকের মধ্যে নিউক্লিক অ্যাসিড (DNA বা RNA) থাকে।
- এরা সবাই পরজীবী বা রোগসৃষ্টিকারী। কেবলমাত্র পোষক জীবকোশে প্রবেশ করলে এদের মধ্যে জীবনের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। আর পোষক কোশের বাইরে থাকার সময় এরা জড় বস্তুর মতো আচরণ করে। 195 পৃষ্ঠার (E) চিহ্নিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছবি দুটি ভাইরাসের মডেল।

জীবজগতের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্ক (পরজীবী, মিথোজীবী ও মৃতজীবী)

মানুষসহ বিভিন্ন জীব প্রাণী ও উদ্ভিদদেহে যে নানা রোগের প্রকাশ দেখা যায় তা প্রধানত অণুজীবদের জন্য। বিভিন্ন প্রকার অণুজীব বায়ু, জল, খাদ্য বা রক্তের মাধ্যমে মানুষের বা অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে প্রবেশ করে নানা রোগ সৃষ্টি করে।

এখন দেখা যাক কোন ধরনের অণুজীব মানুষের দেহে কী ধরনের রোগ সৃষ্টি করে।

1) ব্যাকটেরিয়াঘটিত রোগ - যক্ষ্মা, কলেরা, ডায়ারিয়া, টাইফয়েড, টিটেনাস, হুপিংকাশি, ডিপথেরিয়া, নিউমোনিয়া ইত্যাদি।
2) ভাইরাসঘটিত রোগ - ইনফ্লুয়েঞ্জা, পক্স , মাম্পস, মিসলস (হাম), পোলিও, জলাতঙ্ক, হেপাটাইটিস, ডেঙ্গুজ্বর, AIDS ইত্যাদি।
3) আদ্যপ্রাণীঘটিত রোগ - অ্যামিবিয়াসিস, জিয়ার্ডিয়াসিস, ম্যালেরিয়া, স্লিপিং সিকনেস, কালাজ্বর ইত্যাদি।
4) ছত্রাকঘটিত রোগ - দাদ, হাজা, ছুলি, অ্যালার্জি, নাক, মুখ, কান, গলা বা ফুসফুসে রোগ, খাদ্য বিষাক্তকরণ।

   কতকগুলো রঙিন ছত্রাক খুব বিষাক্ত ধরনের। এধরনের ছত্রাক যদি কোনো মানুষ ভুল করে খান তবে বমি, পাতলা পায়খানা, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

মানুষের দেহে কোন কোন পথ দিয়ে কোন কোন রোগের অণুজীব প্রবেশ করে তার একটা তালিকা তৈরি করো।

(1) পানীয় জলের মাধ্যমে — ডায়ারিয়া.....
(2) হাঁচি কাশির সময় সংক্রামিত বায়ুর শ্বাস গ্রহণের মাধ্যমে — যক্ষ্মা .....
(3) খাদ্যের মাধ্যমে —অ্যামিবিয়াসিস..... (4) রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে — হেপাটাইটিস .....
(5) বাহকের মাধ্যমে — ম্যালেরিয়া.....
(6) অন্যান্যভাবে — AIDS.....

টুকরো কথা

জীবজগতের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্ক

কোনো কোনো রোগের জীবাণু (যেমন- ম্যালেরিয়ার জীবাণু) জীবদেহে প্রবেশের পর বিভিন্ন অঙ্গের কোশের মধ্যে প্রবেশ করে। তারপর খাদ্য ও আশ্রয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে ওই কোশের বা অঙ্গের বা জীবদেহের ওপর নির্ভরশীল থাকে। অর্থাৎ এরা স্বাধীনভাবে একা একা বেঁচে থাকতে পারে না। কোশের মধ্যে প্রবেশ করলে কোশের নানা অঙ্গাণুর কাজে এরা বাধা সৃষ্টি করে। ফলে পোষকের দেহের স্বাভাবিক ছন্দ নষ্ট হয়, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। পোষক জীবদেহের সঙ্গে অণুজীবদের এরকম সম্পর্ক হলো পরজীবিতা (Parasitism)।

আবার অনেকসময় দেখা যায় এই অণুজীবদের কেউ কেউ পোষক জীবদেহে থাকলেও তার কোনো ক্ষতি করে না। পরিবর্তে পোষক জীবদেহে নানাভাবে উপকার করে। 1888 সালে বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেন যে সিম, মটর জাতীয় উদ্ভিদের চাষ করার সময় যদি মাটিতে নাইট্রোজেন বা অ্যামোনিয়া সার না দেওয়া হয় তাহলেও এদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় না।

তোমরা লক্ষ করে থাকবে কোনো ব্যাকটেরিয়াঘটিত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে তিনি তাকে রোগ অনুযায়ী নানা ওষুধ খেতে দেন। ওষুধের মধ্যে যেমন ওই রোগের জীবাণুকে মারার ওষুধ থাকে আবার B কমপ্লেক্স জাতীয় ভিটামিনও থাকে। এখন প্রশ্ন হলো ডাক্তারবাবু কী ওই ব্যক্তির মধ্যে ভিটামিনের অভাব লক্ষ করেছিলেন না অন্য কোনো কারণে তাকে ভিটামিন খেতে দিলেন?

অনেক গবেষণার পর দেখা গেছে মানুষের দেহের ক্ষুদ্রান্ত্রে একধরনের ব্যাকটেরিয়া থাকে যারা ভিটামিন B_{12} তৈরি করে। আমাদের রক্তের কোশ লোহিত রক্তকণিকার ভেতরে থাকা হিমোগ্লোবিন তৈরিতে এই ভিটামিন কাজে লাগে। এখন অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ খেলে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া যেমন মারা যায়, তেমনি অন্ত্রের এই ব্যাকটেরিয়াও মারা যায়। তখন হঠাৎ করে ভিটামিনের অভাব দেখা দিতে পারে।

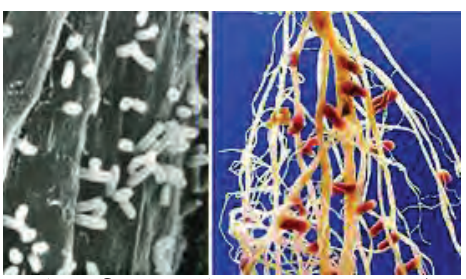

রাইজোবিয়াম ও মটর গাছের মূলের অর্বুদ

ডাল জাতীয় গাছের মূলের অর্বুদে রাইজোবিয়াম এবং এশ্চেরিচিয়া কোলাই ব্যাকটেরিয়ার মতো অণুজীবরা মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রে থেকে আশ্রয় ও পুষ্টি গ্রহণ করে। পরিবর্তে রাইজোবিয়াম বায়ুর নাইট্রোজেন টেনে নিয়ে যৌগ তৈরি করে মটর গাছের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে বা এশ্চেরিচিয়া কোলাই মানুষের দেহের প্রয়োজনীয় ভিটামিন B_{12} সরবরাহ করে।

অনেকসময় একাধিক অণুজীব একে অপরের সঙ্গে সহাবস্থান করে পুষ্টি বিনিময় করে। শৈবাল ও ছত্রাক এরকম পাশাপাশি থাকে। ছত্রাক জল ও অজৈব লবণ শোষণ করে শৈবালদের দেয়। আর শৈবালরা ওই পুষ্টিরস ব্যবহার করে নিজেদের দেহে খাদ্য তৈরি করে। ওই খাদ্যের কিছু অংশ ছত্রাকরা ব্যবহার করে। শৈবাল ও ছত্রাকের এরকম সহাবস্থানই হলো লাইকেন। এও একধরনের মিথোজীবিতা।

টুকরো কথা

জীবজগতের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্ক

মটরগাছের মূলের অর্বুদে থাকা রাইজোবিয়াম বা মানুষের অন্ত্রে থাকা *Escherichia coli* ব্যাকটেরিয়ার পোষক দেহের সঙ্গে ক্ষতি না করে সহাবস্থানের মাধ্যমে থাকার এই পদ্ধতিই হলো মিথোজীবিতা (Symbiosis)।

টুকরো কথা

জীবজগতের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্ক

বহু অণুজীব মৃত, পচাগলা বস্তুর ওপর নিজদেহ থেকে উৎসেচক ক্ষরণ করে ওই উৎসেচকের ক্রিয়ায় জটিল খাদ্যবস্তুকে ভেঙে দেয়। ফলে নানা শোষণযোগ্য ও ব্যবহারযোগ্য উপাদান তৈরি হয়। বহু ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাক এই পদ্ধতিতে পুষ্টিকার্য সম্পন্ন করে। এখানে একই সঙ্গে জটিল জৈববস্তু বিয়োজন ও রূপান্তর ঘটে। এই পদ্ধতিই হলো মৃতজীবিতা (Saprophytism)। এর ফলে পরিবেশ দূষণমুক্ত হয়, জীবাণুর সংক্রমণ ঘটার সম্ভাবনা কমে ও মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায়।

পরিবেশে অণুজীবের ভূমিকা (কৃষি, খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ, ওষুধ প্রস্তুতি, বর্জ্য পরিষ্কার)

কৃষি

অণুজীবরা মানুষসহ অন্যান্য জীবদেহে যে যে অপকারী ভূমিকা পালন করে তার একটি তালিকা তৈরি করো। তবে অপকারই নয়, নানা ক্ষেত্রে এরা উপকারী ভূমিকাও পালন করে। এসো কৃষিকাজে ঘটে চলা কতকগুলি ঘটনার সঙ্গে আমরা পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করি।

ঘটনা	সমস্যা
1. বিভিন্ন চাষ করা ফসলের দেহ গঠনের প্রধান উপাদান হলো প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিড। এগুলো নাইট্রোজেন ছাড়া তৈরি করা যায় না। কিন্তু কোনো উদ্ভিদই বাতাসের নাইট্রোজেন সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না।	কীভাবে বাতাসের নাইট্রোজেন উদ্ভিদের ব্যবহারযোগ্য নাইট্রোজেনে পরিণত হতে পারে?
2. পাটগাছ বড়ো হয়ে গেলে তাকে কেটে ডোবা বা পুকুরের অপরিষ্কার জলে কিছুদিন ডুবিয়ে রাখা হয়।	কীভাবে পাটের তন্তু পাটের কাণ্ড থেকে আলাদা করা সম্ভব?

● অধিকাংশ উদ্ভিদই নাইট্রোজেনকে নাইট্রেট NO^{-}_{3} বা অ্যামোনিয়াম NH^{+}_{4} রূপে ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু মাটিতে এদের পরিমাণ খুবই কম এবং এরা সহজেই মাটি থেকে ধুয়ে চলে যায় বা অন্যভাবে নষ্ট হয়ে যায়।

অণুজীবরা নানাভাবে মাটিতে সরাসরি বাতাসের নাইট্রোজেন যুক্ত করে বা নাইট্রোজেনযুক্ত ব্যবহার উপযোগী যৌগ তৈরি করে মাটিতে মিশিয়ে দেয়—

(i) ক্লসট্রিডিয়াম, অ্যাজোটোব্যাকটার জাতীয় স্বাধীনজীবী ব্যাকটেরিয়া ও নানা সায়ানোব্যাকটেরিয়া সরাসরি বাতাসের নাইট্রোজেনকে শোষণ করে নিজেদের দেহে নাইট্রোজেন যৌগ গঠন করে। এসব অণুজীব মরে গেলে ওই নাইট্রোজেন যৌগগুলো মাটিতে মুক্ত হয়।

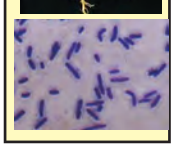

(ii) ডাল, সয়াবিন জাতীয় উদ্ভিদের মূলের অর্বুদে বসবাসকারী মিথোজীবী ব্যাকটেরিয়া রাইজোবিয়াম নাইট্রোজেন স্থিতিকরণে (Nitrogen Fixation) সমর্থ। এরা নাইট্রোজেনকে নাইট্রোজেন যৌগে পরিণত করে। এর কিছুটা অংশ আশ্রয়দাতা উদ্ভিদকে সরবরাহ করে। বাকিটা অর্বুদ পচে গেলে মাটিতে মিশে যায়।

(iii) উদ্ভিদ বা প্রাণীরা যখন মারা যায়, তখন তাদের দেহের নানা নাইট্রোজেনযুক্ত যৌগ ভেঙে গিয়ে অ্যামোনিয়া তৈরি হয়। এই পদ্ধতিকে অ্যামোনিফিকেশন (Ammonification) বলে। নাইট্রোসোমোনাস, নাইট্রোব্যাকটার নামক নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া অ্যামোনিয়ামকে যথাক্রমে নাইট্রাইট ও নাইট্রেটে রূপান্তরিত করে। এই পদ্ধতিকে নাইট্রিফিকেশন বলে।

- পাট গাছকে কয়েকদিন পুকুর বা ডোবার অপরিষ্কার জলে চুবিয়ে রাখলে জলের ব্যাকটেরিয়া পাটের কাণ্ডে থাকা পেকটিন নষ্ট করে দেয়। ফলে পাটের তন্তুগুলো পাটকাঠি থেকে সহজেই আলাদা করা সম্ভব হয়।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ

(i) দই তৈরি — যখন দই-এর মধ্যে থাকা ল্যাকটোব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া 37^0C উষ্ণতায় গরম দুধের সঙ্গে মেশানো হয় তখন তাদের সংখ্যা খুব তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকে। এই ব্যাকটেরিয়া দুধের ল্যাকটোজকে ল্যাকটিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত করে।

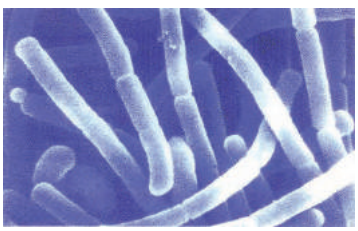

ল্যাকটোব্যাসিলাস

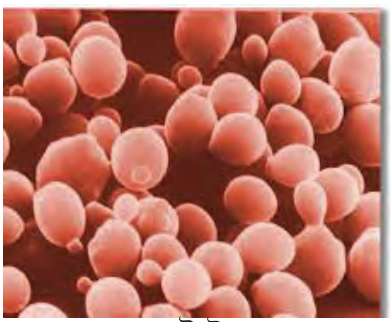

ইস্ট

(ii) বিশেষ বিশেষ ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়ায় চিজ, কেক, ধোকলা, ইডলি, দোসা, পাঁউরুটির মতো নানা খাবার বানানো যায়।

(iii) ইস্টের কোশ ফলের রসে থাকা শর্করাকে ভেঙে অ্যালকোহল তৈরি করে। ব্যাকটেরিয়া এই অ্যালকোহলকে ভিনিগারে রূপান্তরিত করে।

টুকরো কথা

খাওয়ার পর তোমরা কি কেউ কখনও অসুস্থ হয়েছ? যদি কেউ খাদ্য খাওয়ার পর অসুস্থ হন, তবে বুঝতে হবে খাদ্যে কোনো অণুজীবের সংক্রমণ ঘটে থাকতে পারে। সাধারণত ছত্রাক আর ব্যাকটেরিয়া খাদ্যের সংস্পর্শে এলে খাদ্যস্থিত নানা যৌগকে ভেঙে ফেলে। আর অণুজীবদের দেহ থেকে বেরোনো বিষাক্ত পদার্থ খাদ্যের সঙ্গে মিশে খাদ্যকে ব্যবহারের অনুপযোগী করে তোলে।

কীভাবে খাদ্যকে ভালো রাখা সম্ভব?

- কোনো পাত্রে বায়ুশূন্য করে খাদ্যকে রেখে (Canning) বা বিশেষ মোড়কে রেখে (Packaging)
- কোনো কোনো সবজি (যেমন- বাঁধাকপি) ও ফলকে (যেমন- টুকরো বা কাটা আম) দীর্ঘসময় রোদে শুকিয়ে নিয়ে (Sun drying)
- মাছ, মাংস বা ফলে নুন মাখিয়ে রাখলে (Salting)
- কাটা আম, লেবু, বাঁধাকপি, পিঁয়াজে ভিনিগার যোগ করলে (Pickling)
- ফলে চিনি যোগ করে (Adding Sugar)
- খাদ্যকে কম তাপমাত্রায় রেখে (Refrigeration)
- পাস্তুরাইজেশন (Pasteurization)

ওষুধ প্রস্তুতি

বিশেষ কিছু ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের দেহনিঃসৃত কিছু কিছু জৈব যৌগ অন্যান্য ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধিতে বাধা দেয় অথবা তাদের মেরেও ফেলে। এইসব যৌগকে নানাভাবে বিশুদ্ধিকরণের ও প্রয়োজনে রাসায়নিকভাবে পরিবর্তনের মাধ্যমে নানান জীবনদায়ী ওষুধ তৈরি করা হয়। এই জীবনদায়ী ওষুধগুলোকে অ্যান্টিবায়োটিক (antibiotic) বলা হয়।

টুকরো কথা

আলেকজান্ডার ফ্লেমিং 1928 সালে প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি অ্যাগার (agar) প্লেটে ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি দেখছিলেন। কিন্তু একটা প্লেট তিনি অসাবধানতাবশত খোলা রেখেছিলেন। প্লেটের ওপরে একটা ছত্রাক ক্রমশ সংখ্যায় বাড়তে লাগল এবং ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি ব্যাহত হলো। এই ছত্রাকটি ছিল পেনিসিলিয়াম নোটেটাম। এই ছত্রাকের দেহ থেকে পাওয়া যৌগটি ছিল পেনিসিলিন। যা ছিল মানুষের আবিষ্কৃত প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক।

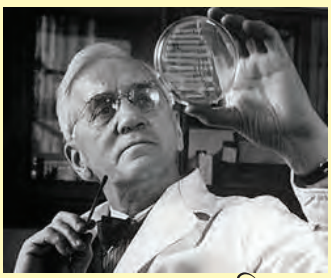

আলেকজান্ডার ফ্লেমিং

এরপর স্ট্রেপটোমাইসিন, ক্লোরোমাইসেটিন, অ্যাম্পিসিলিনের মতো নানা অ্যান্টিবায়োটিক মানুষ আবিষ্কার করেছে। এইসব অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঠেকানো যায়। ভাইরাস বা ছত্রাকঘটিত কোনো রোগে এরা কাজ করে না।

ভ্যাকসিন — যখন কোনো জীবাণু (ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া বা ছত্রাক) আমাদের দেহে প্রবেশ করে, তখন জীবাণুর গাত্র বা দেহ থেকে বেরোনো নানা ক্ষতিকারক যৌগ আমাদের দেহে প্রবেশ করে। এরা হলো অ্যান্টিজেন। এদের ধ্বংস করার জন্য আমাদের শরীরে একধরনের যৌগ তৈরি হয়। এরা অ্যান্টিজেনকে আক্রমণ করে ও ধ্বংস করে। এই প্রোটিনধর্মী যৌগগুলি হলো অ্যান্টিবডি। কোনো জীবদেহের রোগ প্রতিরোধের স্বাভাবিক এই ক্ষমতাই হলো অনাক্রম্যতা বা ইমিউনিটি (Immunity)।

এখন কোনো মৃত, দুর্বল, জীবিত অণুজীবকে বা সরাসরি অণুজীবের দেহ থেকে বেরোনো দুর্বল বিষকে নির্দিষ্ট ডোজে আগে থেকে কোনো মানুষের দেহে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হলে কী হতে পারে? ওই ধরনের অণুজীবদের বিরুদ্ধে আগে থেকেই রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই পদ্ধতিকে বলা হয় টীকাকরণ বা অনাক্রম্যকরণ (Vaccination বা Immunization)। ভ্যাকসিন ব্যবহার করে টাইফয়েড, টিটেনাস, পোলিও, ডিপথেরিয়ার মতো বহু রোগকে ঠেকানো সম্ভব হয়েছে।

বর্জ্য পরিষ্কার

(i) মল বা মূত্রের মতো অশোধিত বর্জ্য মানব স্বাস্থ্যের পক্ষে এক বিশেষ ঝুঁকি। কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়া কম অক্সিজেনযুক্ত পরিবেশে থাকে। এরা এধরনের বর্জ্যকে ভেঙে নানা ব্যবহারযোগ্য যৌগ তৈরি করে। এরা রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা কমায়। আবার মাটির উর্বরতাও বাড়ায়।

(ii) ভারত বা চিনের মতো দেশে গ্রামের দিকে মানুষ ও অন্য জন্তুর মল, তরকারির খোসার মতো বর্জ্যকে মেথানোজেনিক ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে ভেঙে মিথেন গ্যাস তৈরি করা হয়। এই গ্যাস কয়লা, কেরোসিনের মতো জ্বালানির বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

(iii) মহাকাশযানে বাতাস পরিষ্কার করতে কোনো কোনো শ্যাওলাকে ব্যবহার করা হয়।

ফসল, ফসলের বৈচিত্র্য ও ফসল উৎপাদন

কৃষিবিজ্ঞান

আমরা নানারকম খাবার খাই। তার কোনোটা আমরা পাই উদ্ভিদ থেকে আবার কোনোটা পাই প্রাণীদের থেকে। উন্নতমানের উদ্ভিদজাত আর প্রাণীজাত খাবার যথেষ্ট পরিমাণে পেতে গেলে কিছু বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। তার জন্য বিজ্ঞানের একটা শাখায় খাদ্য উৎপাদনের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। বিজ্ঞানের এই শাখাটাকেই আমরা বলি কৃষিবিজ্ঞান (Agriculture)। নতুন আর উন্নত ধরনের শস্য বা ফসল উৎপাদনের পদ্ধতির আবিষ্কার, বেশি দুধ আর উন্নত মানের ডিম বা ক্ষেত্রবিশেষে মাংস পাওয়ার জন্য বিভিন্ন পশু-পাখি (যেমন গোরু, ছাগল, ভেড়া আর মুরগি ইত্যাদি) পালন করার পদ্ধতি— এসব নিয়েই কৃষিবিজ্ঞানে আলোচনা করা হয়।

কৃষিবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়

1. মাটির ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ মাটিকে ফসল ফলানোর উপযোগী করে তোলা(Soil management)
2. ফসল উৎপাদন (Crop production)
3. ফল, সবজি, ফুল আর সাজানোর কাজে লাগে এমন বিভিন্ন উদ্ভিদের চাষ (Horticulture)
4. পশুপালন (Animal husbandry)

ফসল কী?

বড়ো মাপে কোনো উদ্ভিদের চাষ করার সময় সেই উদ্ভিদের চাহিদার দিকে বিশেষভাবে নজর রাখা হয়, যাতে ওই উদ্ভিদের ফলন বাড়ে। এইভাবে অনেকটা জায়গা জুড়ে একই ধরনের উদ্ভিদের চাষ যখন করা হয়, তখন ওই উদ্ভিদদের একসঙ্গে বলা হয় শস্য বা ফসল (Crop)।

ফসলের বৈচিত্র্য

ফসল বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। নীচের তালিকায় বিভিন্ন ধরনের ফসলের কথা বলা হলো। তোমার জানা আরো কিছু ফসলের নাম সারণিতে যোগ করতে পারো।

ফসলের ধরন	উদাহরণ
1. তণ্ডুল জাতীয় ফসল	ধান, গম, ...
2. তন্তু জাতীয় ফসল	তুলো, পাট, ...
3. ডালজাতীয় ফসল	ছোলা, মটর, বিন, ...
4. তৈলবীজ পাওয়া যায় এমন ফসল	সরষে, সূর্যমুখী, ...
5. কন্দ জাতীয় ফসল	আলু, আদা, ...
6. চিনি পাওয়া যায় এমন ফসল	আখ,.....
7. বাগানে চাষ করা হয় এমন ফসল	চা, কফি, রবার, ...
8. ওষুধ পাওয়া যায় এমন গাছ	তুলসী, ...
9. মশলা পাওয়া যায় এমন গাছ	গোলমরিচ, আদা, ...

তোমরা কি লক্ষ করেছ যে এমন কিছু খাবার আছে যা আমরা প্রতিদিন খাই অথচ সেগুলো ওপরের তালিকায় নেই? কী বলোতো? সবজি আর ফলকে ওই তালিকায় রাখা হয়নি। কারণ কৃষিবিজ্ঞানেরই আরেক শাখা উদ্যানবিজ্ঞান (Horticulture)-এ ফল আর সবজি চাষের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। নীচের তালিকায় এই ধরনের ফসলের নাম দেওয়া আছে । তোমরাও তার সঙ্গে আরো কিছু নাম যোগ করতে পারো।

ফসলের ধরন	উদাহরণ
1. সবজি	টম্যাটো, বাঁধাকপি, ...
2. ফল	কলা, আঙুর, ...
3. আলংকারিক উদ্ভিদ	ক্যাকটাস, বোগেনভেলিয়া, ...
4. ফুল	গোলাপ, জুঁই, ...

অনেকসময় আবার এমনও হয়, একটা ফসল কোনো বিশেষ ঋতুতে খুব ভালো হয়। অর্থাৎ ওই বিশেষ ঋতুর তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত, ওই ফসলের বেড়ে ওঠার জন্য উপযোগী। কোন ঋতুতে হয় তার ওপর নির্ভর করে ফসলকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়।

i) খারিফ ফসল

সাধারণত বর্ষার শুরুতে (জুন/জুলাই) এই ধরনের ফসলের চাষ শুরু হয়। আর সাধারণত বর্ষার শেষে (সেপ্টেম্বর/ অক্টোবর) এই ফসল তোলা হয়। খারিফ ফসলের ফলন নির্ভর করে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর ওপর। ধান, ভুট্টা, তুলো, চিনেবাদাম, সয়াবিন— এরা হলো কয়েকটা খারিফ ফসল।

ii) রবি ফসল

সাধারণত শীতের শুরুতে (অক্টোবর/নভেম্বর) এই ধরনের ফসলের চাষ শুরু হয়। আর মার্চ/এপ্রিল মাসে ফসল তোলা হয়। রবি ফসল বর্ষার ওপর নির্ভরশীল নয়। গম, বার্লি, ছোলা, মটর, সরষে — এরা হলো কয়েকটা রবি ফসল।

ফসল উৎপাদন

ফসল উৎপাদনের জন্য একজন কৃষক বা চাষিকে বেশ কিছুটা সময় জুড়ে নানারকম কাজ করে যেতে হয়। একজন কৃষক এই যে কাজগুলো করেন, এটাই হলো কৃষিকাজ (Agricultural practices)। এই কাজগুলো নীচে দেওয়া হলো। আমরা একে একে এইসব কাজগুলো সম্বন্ধে এরপর জানব।

1. চাষের জমির মাটি তৈরি করা	**5. আগাছা দমন**
2. বীজ বপন করা / বীজ বোনা	**6. ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ থেকে ফসলকে বাঁচানো**
3. সার প্রয়োগ	**7. ফসল তোলা**
4. জলসেচ	**8. ফসল সঞ্চয় করে রাখা**

1. চাষের জমির মাটি তৈরি করা (Preparation of soil of cultivable land)

বীজের অঙ্কুরোদগম আর উদ্ভিদের বেড়ে ওঠার মাধ্যম হলো মাটি। উদ্ভিদেরা জল আর নানান খনিজ মৌল পায় মাটি থেকে। বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদের বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন ধরনের মাটি। তাই কোনো ফসলের চাষ শুরু করার আগে মাটিকে চাষের উপযোগী করে তোলা খুবই জরুরি। চাষের জমির মাটিকে তাই ওপর-নীচ করা হয়। এর ফলে উদ্ভিদের মূল সহজেই মাটির গভীরে যেতে পারে।

মাটিতে থাকে বিভিন্ন খনিজ পদার্থ, জল, বায়ু, পচা-গলা জৈব বস্তু আর বিভিন্ন জীব। মাটি আলগা করলে, মাটিতে বায়ু চলাচল হলে তা কেঁচো আর মাটিতে বাস করা জীবাণুদের বেড়ে ওঠার পক্ষে সহায়ক হয়। ওইসব জীবেরা যে মাটিকে শুধু আরও আলগা করতে সাহায্য করে তাই নয়, এরা মাটির জৈব অংশ যা হিউমাস বাড়াতেও সাহায্য করে। এইসব জীবেরা কৃষকের বন্ধুর মতোই কাজ করে। মাটিতে বাস করা কিছু জীবাণু মৃত উদ্ভিদ বা প্রাণীদের দেহকে পচিয়ে ওইসব জীবের দেহের নানা যৌগ আর মৌলগুলোকে মাটিতে মিশিয়ে দেয়। এগুলোই উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান (nutrients), যা উদ্ভিদেরা মাটি থেকে গ্রহণ করে। মাটির ওপরের দিকের মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার পুরু স্তরটাই উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। তাই নীচের মাটি ওপরে আনলে বা ওপরের মাটি নীচে পাঠালে আর মাটি আলগা করে দিলে উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানগুলো মাটির ওপরের দিকে চলে আসে। ফলে উদ্ভিদেরা ওই যৌগ আর মৌলগুলোকে সহজেই নিজেদের কাজে লাগাতে পারে।

ভূমি কর্ষণের যন্ত্রপাতি

তোমরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে চাষের জমির মাটি ওপর-নীচ করা আর মাটি আলগা করার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছ। যে পদ্ধতিতে চাষের জমির মাটিকে ওপর-নীচ আর আলগা করা হয় তার নাম জানো কি? সহজ কথায় জমি চষা আর ভালো বাংলায় বললে ভূমিকর্ষণ করা। জমি চষতে লাগে লাঙল। এসো এবারে চাষের কাজে লাগে এমন কিছু যন্ত্রপাতির কথা জেনে নিই।

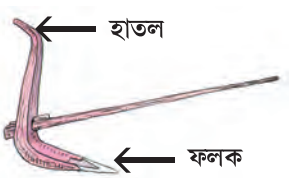

লাঙল

লাঙল (Plough)

বহু প্রাচীনকাল থেকেই চাষের কাজে লাঙলের ব্যবহার আছে। জমি চষা, মাটিতে সার মেশানো বা মাটি থেকে আগাছা তুলে ফেলার মতো নানান কাজে লাঙল ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে দেশি কাঠের তৈরি লাঙলের জায়গা নিয়ে নিচ্ছে লোহার তৈরি লাঙল।

নিড়ানি

নিড়ানি (Hoe)

নিড়ানির সাহায্যে চাষের জমি থেকে আগাছা তুলে ফেলা আর মাটি আলগা করার কাজ করা হয়।

কর্ষক (Cultivator)

বর্তমানে বড়ো বড়ো চাষের জমি কর্ষণ করতে ট্রাক্টরের সাহায্য নেওয়া হয়। ট্রাক্টরের পেছনে লাগানো কর্ষকের সাহায্যে খুব অল্প সময়েই অনেকটা জমি চষে ফেলা যায়। ছোটো জমি বা ফুলের বাগানে এখন অনেকসময় এই কাজে পাওয়ার টিলার ব্যবহার করা হয়।

ট্রাক্টর ও কর্ষক

এরপর একটা কাঠ বা লোহার তৈরি যন্ত্রের (Leveller) সাহায্যে চাষের উঁচু-নীচু জমিকে সমান করে নেওয়া হয়। এর ফলে জল বা বায়ুর প্রভাবে মাটির ক্ষয় কম হয়। অনেকসময় জমি চষার আগে মাটিতে জৈব সার মেশানো হয়। এর ফলে মাটির সঙ্গে সার ভালোভাবে মিশে যেতে পারে।

2. বীজ বপন/ বীজ বোনা (Sowing of Seeds)

বীজ বপন বা বীজ বোনা হলো চাষের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। বীজ বপনের আগে দেখে নেওয়া দরকার বীজগুলো ভালো গুণের অধিকারী অর্থাৎ বীজগুলো সুস্থ, খরা ও অতিবৃষ্টি -সহনক্ষম আর সংক্রমণ-মুক্ত কিনা। বেশি ফলন দেবে এমন বীজই চাষিরা পছন্দ করেন।

ভালো, সুস্থ বীজ আর খারাপ বীজ চিনবে কী করে? এসো একটা ছোটো পরীক্ষা করে দেখি। একটা গ্লাস বা বিকারে জল অর্ধেক ভরতি করো। একমুঠো গমের বীজ নিয়ে জলে ফেলে ভালো করে নাড়ো। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো। কী দেখতে পেলে নীচের সারণিতে লেখো।

কী করলে	কী দেখলে	কেন এমন হলো

সংক্রমণ বা অন্যান্য কারণে নষ্ট হয়ে যাওয়া বীজের ভেতরটা ফাঁপা। তাই নষ্ট হয়ে যাওয়া বীজগুলো হালকা বলে জলে ভেসে থাকে। আর ভালো, সুস্থ বীজগুলো ভারী হওয়ার জন্য জলে ডুবে যায়।

বীজ বপনের যন্ত্রপাতি

ছবিতে ফানেল আকৃতির একটা জিনিস নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ। ফানেলের নীচে তীক্ষ্ণ প্রান্তযুক্ত দুটো বা তিনটে পাইপ লাগানো থাকে। বীজগুলোকে ওই ফানেলে ভরা হয়। পাইপের তীক্ষ্ণ প্রান্ত মাটি ভেদ করে। আর ফানেল থেকে পাইপ বেয়ে বীজগুলো মাটির নীচে গিয়ে পড়ে। অনেক সময় চাষিরা লাঙলের সঙ্গেই বীজ বোনার উপযোগী এই ফানেল আর নল যোগ করে, লাঙল দিয়ে চষার ফলে তৈরি খাতে (Furrow) বীজ বোনেন।

বীজ বপন যন্ত্র (Seed Drill)

এখনকার দিনে অবশ্য জমিতে বীজ বোনার জন্য উন্নত বীজ বপন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এর সাহায্যে সঠিক দূরত্ব এবং গভীরতায় বীজ বোনা সম্ভব। বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে বীজ বোনা হলে বীজগুলো সবসময়ই মাটি দিয়ে ঢাকা থাকে। ফলে পাখিরাও আর ওই বীজের নাগাল পায় না। সময় ও শ্রমের সাশ্রয় হয়।

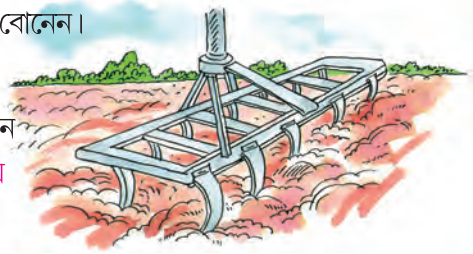

বীজ বপন যন্ত্র

অনেক সময় বীজ বোনার আগে চাষিরা বীজগুলোকে কোনো কোনো রাসায়নিকে ডুবিয়ে নেন। ওই রাসায়নিক পদার্থগুলো বীজগুলোকে জীবাণু সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচায়। ধান বা কিছু সবজির (টম্যাটো, পিঁয়াজ) বীজ প্রথমে বীজতলায় বোনা হয় । এরপর বীজতলায় চারাগাছগুলো কিছুটা বড়ো হলে, তাদের মধ্যে থেকে সুস্থ, সবল আর নীরোগ চারাগাছ বেছে নিয়ে চাষের জমিতে লাগানো হয়। ফলে উন্নত মানের চারাগাছ বেছে নেওয়া সম্ভব হয়। প্রতিস্থাপিত চারাগাছগুলোও মাটির গভীরে মূল প্রবেশ করাতে সক্ষম হয়। ফলে ফলনও বাড়ে।

3. সার প্রয়োগ (Adding manures and fertilizers)

উদ্ভিদের ঠিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন হয় কিছু মৌলের — এরাই হলো উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান (nutrients)। উদ্ভিদের এই পুষ্টি উপাদানগুলো আবার দু-ধরনের হয়।

a) মুখ্য খাদ্য উপাদান (Macronutrients) : C, H, O, N, P, K, Mg, S।

b) গৌণ খাদ্য উপাদান (Micronutrients) : Fe, Mn, Cu, B, Mo, Zn, Cl।

এইসব পুষ্টি উপাদানগুলোকে মৌল হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও এগুলো আসলে যৌগ হিসাবে উদ্ভিদদেহে গৃহীত হয়। মাটি উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানগুলো সরবরাহ করে। উদ্ভিদের বেড়ে ওঠার জন্য এই পুষ্টি উপাদানগুলো খুবই জরুরি। কোনো কোনো অঞ্চলে চাষিরা হয়তো একই জমিতে একটার পরে একটা ফসল ফলিয়ে যান বা একই ফসল বারবার চাষ করেন। জমি কখনই অনাবাদী হিসেবে ফেলে রাখেন না। ভেবে দেখোতো তাহলে মাটিতে থাকা উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানগুলোর কী অবস্থা হবে?

একই জমিতে বারবার ফসল ফলানো হলে মাটিতে থাকা উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানগুলো ফুরিয়ে আসে। তাই চাষের জমিতে সার মেশাতে হয়। যাতে মাটি উদ্ভিদের হারিয়ে যাওয়া পুষ্টি উপাদানগুলো আবার ফিরে পায়। অর্থাৎ মাটিতে থাকা উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি পুষিয়ে দিয়ে উদ্ভিদের বৃদ্ধির সহায়ক হয় যেসব পদার্থ, তারাই হলো সার। এই সার আবার দু-রকমের হয়। জৈব সার আর অজৈব সার ।

জৈব সার (Organic manure)

মৃত উদ্ভিদ আর প্রাণীদের বর্জ্য পচিয়ে তৈরি হয় জৈব সার। চাষিরা খোলা জায়গায় একটা গর্ত খুঁড়ে সেখানে মৃত উদ্ভিদ আর প্রাণীদের বর্জ্য পদার্থ ফেলে রাখেন পচে যাওয়ার জন্য। ব্যাকটেরিয়া আর ছত্রাকের বিয়োজন ও রূপান্তর ক্রিয়ায় ওইসব বর্জ্য পদার্থগুলো পচে গিয়ে তৈরি হয় জৈব সার।

অজৈব সার (Inorganic fertilizer)

অজৈব সার হলো একধরনের রাসায়নিক পদার্থ। এতে থাকে নানা অজৈব লবণ, যা উদ্ভিদের বৃদ্ধির সহায়ক। সার কারখানায় তৈরি হয় অজৈব সার। অজৈব সার প্রধানত তিন ধরনের মৌলের ঘাটতি পূরণ করে— নাইট্রোজেন (N), ফসফরাস (P) আর পটাশিয়াম (K)। NPK সারে এই তিনটি প্রধান উপাদান বিভিন্ন মাত্রায় মেশানো থাকে। আবার কখনও বা কোনো অজৈব সারে এই তিনটি উপাদানের যে-কোনো একটা উপাদান উপস্থিত থাকে। যেমন পটাস সার বা সুপার ফসফেট। আরও কয়েকটা অজৈব সার হলো ইউরিয়া, অ্যামোনিয়াম সালফেট।

নিজে করো

ছোলা, মুগ বা অন্য যে-কোনো তিনটে একই উচ্চতার একই ধরনের চারাগাছ নাও। তিনটে ফাঁকা গ্লাস নাও। গ্লাসগুলোতে 1, 2, 3 নম্বর দাও। 1 নং গ্লাসে অল্প একটু ইউরিয়া মেশানো মাটি নাও। 2 নং গ্লাসে অল্প একটু গোবর সার মেশানো মাটি নাও। খেয়াল রেখো যাতে 1 আর 2 নং গ্লাসে নেওয়া মাটির পরিমাণ একই হয়। 3 নং গ্লাসে একই পরিমাণ মাটি নাও। এই মাটিতে কিছু মিশিও না। তিনটে গ্লাসের মাটি একই জায়গা থেকে নিও। তিনটে গ্লাসে সমপরিমাণ জল দাও। এবারে তিনটে চারাগাছ তিনটে গ্লাসে বসিয়ে দাও। প্রতিদিন নিয়ম করে গ্লাসগুলোতে পরিমাণ মতো জল দাও। 7 - 10 দিন ধরে তিনটে গ্লাসে চারাগাছের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করো।

কী দেখলে নীচের সারণিতে লেখো।

দিন	1ম গ্লাস	2য় গ্লাস	3য় গ্লাস	মন্তব্য

10 দিন পরে

1. চারাগাছের বৃদ্ধি সব গ্লাসে কি একই হারে হয়েছে?
2. কোন গ্লাসে চারাগাছের বৃদ্ধি সবচেয়ে ভালো হয়েছে?
3. কোন গ্লাসে চারাগাছের বৃদ্ধি সবচেয়ে তাড়াতাড়ি হয়েছে? এরকম হওয়ার পেছনে কী কারণ আছে বলে তোমার মনে হয়।

অজৈব সার ব্যবহারের সমস্যা

অজৈব সারের ব্যবহার, চাষিদের বিভিন্ন ফসল যেমন ধান, গম আর ভুট্টার খুব ভালো ফলন পেতে সাহায্য করে। কিন্তু অজৈব সারের অত্যধিক আর অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার মাটিতে থাকা উপকারী ব্যাকটেরিয়ার কাজে বাধা সৃষ্টি করে মাটির উর্বরাশক্তি বা উৎপাদন ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। মাটির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অজৈব সার ব্যবহার না করলে মাটির রসায়ন পালটে গিয়ে ভালোর চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়। যেমন-— অ্যামোনিয়াম সালফেট $[(NH_4)_2 SO_4]$ ব্যবহার করলে যেমন মাটির আম্লিক ভাব বেড়ে যায়, তেমনি সোডিয়াম নাইট্রেট ($NaNO_3$) ব্যবহারে মাটির ক্ষারকীয়তাও বেড়ে যেতে পারে। উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য মাটির অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য বজায় থাকাটা খুবই জরুরি। তাছাড়াও অজৈব সার ব্যবহার করা হয়েছে এমন চাষের জমি থেকে নাইট্রোজেন বা ফসফরাসের যৌগমিশ্রিত জল নদী বা পুকুরের জলে মিশে জলদূষণ ঘটায়। মাটির উর্বরাশক্তি বজায় রাখতে তাই বর্তমানে অজৈব সারের পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহারের চেষ্টা করা হচ্ছে।

জৈব সার কেন অজৈব সারের চেয়ে ভালো?

i) জৈব সার মাটির জলধারণ ক্ষমতা বাড়ায়।

ii) জৈব সার ব্যবহার করলে মাটি রন্ধ্রযুক্ত হয়। ফলে মাটির মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন গ্যাসের আদান-প্রদান ভালো হয়।

iii) মাটিতে থাকা উপকারী জীবাণুদের সংখ্যা বাড়াতে সাহায্য করে জৈব সার।

iv) জৈব সার মাটির গঠন উন্নত করতে সাহায্য করে ।

এবারে তাহলে চট করে অজৈব সার আর জৈব সারে কী পার্থক্য লিখে ফেলার চেষ্টা করো ।

বাইরে থেকে সার ব্যবহার না করে মাটি থেকে হারিয়ে যাওয়া উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান প্রাকৃতিক কী কী উপায়ে আবার ফিরিয়ে আনা যায় এবারে দেখে নেওয়া যাক ।

a) চাষের জমি অনাবাদী ফেলে রাখা

দুটো ফসল চাষের মাঝের সময়টা যদি জমিতে কোনো চাষ না করা যায় তবে প্রাকৃতিক উপায়েই মাটি তার হারানো উপাদানগুলো ফিরে পায়। কারণ এই সময়ে মাঠে জমা হওয়া মৃত উদ্ভিদ, প্রাণী বা অন্যান্য জৈব বস্তু নানারকম জীবাণুর ক্রিয়ায় পচে মাটিতে মিশে যায়। ফলে মাটি তার ফুরিয়ে যাওয়া উপাদানগুলো আবার ফিরে পায়।

b) শস্য আবর্তন

মাটি থেকে পাওয়া পুষ্টি উপাদানের চাহিদা বিভিন্ন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম। একই জমিতে ক্রমাগত একই উদ্ভিদের চাষ করে গেলে ওই উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানগুলো মাটি থেকে ক্রমশ ফুরিয়ে যায়। তাই অনেকসময় দুটো চাষের মাঝে একবার শিম্বীগোত্রীয় উদ্ভিদ যেমন মটর, বিন, ছোলা বা ডালের চাষ করা হয়। এই ধরনের উদ্ভিদের মূলে বাসা বাঁধে রাইজোবিয়াম নামে একধরনের মিথোজীবী ব্যাকটেরিয়া। উদ্ভিদেরা

বাতাস থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে না। এই ব্যাকটেরিয়া পরিবেশ থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে উদ্ভিদের ব্যবহারযোগ্য নাইট্রোজেন যৌগে পরিবর্তিত করে উদ্ভিদদের দেয়। এই নাইট্রোজেনের যৌগগুলো উদ্ভিদদের ব্যবহারের পরে বাকিটা মাটিতে রয়ে যায়। তাই শিম্বীগোত্রীয় উদ্ভিদের ফসল তোলার পরেও মাটিতে যথেষ্ট নাইট্রোজেন থাকে। এর পরে ধান, গম ও ভুট্টা জাতীয় ফসল চাষ করলে এই উদ্ভিদেরা মাটি থেকে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেনের যৌগ গ্রহণ করতে পারে। তাই এই ধরনের ফসল একবার চাষ করে, মাঝে একবার শিম্বীগোত্রীয় উদ্ভিদের চাষ করলে মাটি আবার তার হারানো নাইট্রোজেন যৌগ ফিরে পায়। একই ফসল বারবার চাষ না করে মাঝে একবার অন্য ধরনের ফসল (বিশেষতঃ শিম্বীগোত্রীয় উদ্ভিদ) চাষ করা — এটাই হলো **শস্য আবর্তন**।

মাটির পুষ্টি উপাদানগুলো বজায় রাখার জন্য অনেকসময় মাটিতে নানারকম মিথোজীবী অণুজীব মেশানো হয়। এটাই অণুজীব সার। এই সার মাটির জলধারণ ক্ষমতা বাড়ায়। আর মাটিকে রন্ধ্রযুক্ত করে বায়ু চলাচল বাড়ায়।

4. জলসেচ (Irrigation)

প্রত্যেক জীবেরই বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন জল। উদ্ভিদের বেড়ে ওঠা আর ফুল-ফল-বীজের বিকাশের জন্য জল খুবই প্রয়োজন। তোমরা তো জানো যে উদ্ভিদ তার মূলের সাহায্যে জল শোষণ করে। আর জলের সঙ্গেই মাটি থেকে গ্রহণ করে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান আর সার।

উদ্ভিদের দেহে প্রায় 90 % জল থাকে। বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্য জল একান্তই প্রয়োজন। তাছাড়াও জলের সঙ্গে মিশে পুষ্টি উপাদানগুলো উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গে পৌঁছোয়। ভালো ফসল পেতে গেলে মাটির আর্দ্রতা বজায় রাখা খুব জরুরি। মাঠের ফসলে নির্দিষ্ট সময় অন্তর তাই জল সরবরাহ করা দরকার। এটাই **জলসেচ**। সাধারণত নদী-হ্রদ, পুকুর, খাল-বিল, জলাধার, কুয়ো, টিউবওয়েল— এইসব উৎসের জল সেচের কাজে ব্যবহার করা হয়। অঞ্চলভেদে এই জল সংগ্রহ করার পদ্ধতিতেও ফারাক থাকে। তারপরে সেই জল খাল দিয়ে বা পাইপ দিয়ে ইলেকট্রিক বা ডিজেল পাম্পের সাহায্যে চাষের জমিতে পৌঁছে দেওয়া হয়। অনেকসময় ইলেকট্রিক বা ডিজেলের পরিবর্তে সৌরশক্তি বা বায়োগ্যাসও ব্যবহার করা হয়। এই কাজে চিরাচরিত পদ্ধতিতে সাধারণত মানুষের শ্রম বা পশুশক্তি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে এই পদ্ধতিগুলো তুলনায় সস্তা হলেও কম কার্যকরী হয়। আর জলেরও অপচয় ঘটে।

চিরাচরিত পদ্ধতি

দড়ি-বালতি-পুলি-নালা পদ্ধতি

দোলানো বালতি পদ্ধতি

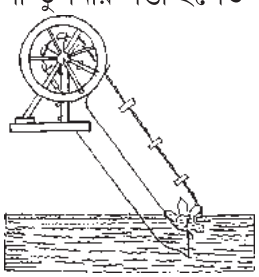

চেন পাম্প পদ্ধতি

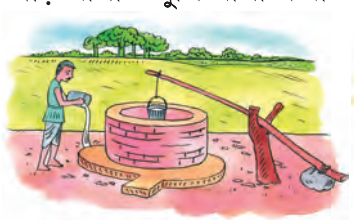

ঢেকাল পদ্ধাত

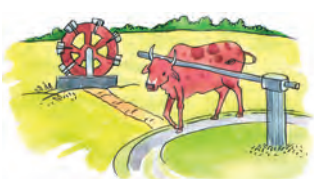

পারসি চাকা বা রাহাত পদ্ধতি

রাহাত পদ্ধতিতে একটা বড়ো কুয়ো আর চাকা ব্যবহার করা হয়। চাকার গায়ে অনেকগুলো বালতি লাগানো থাকে। পশুশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ওই চাকাটা ঘুরিয়ে কুয়ো থেকে বালতিতে জল তোলা হয়। তারপর সেই জল চাষের জমিতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

আধুনিক পদ্ধতি : আধুনিক পদ্ধতিগুলোয় জলের অপচয় কমানো সম্ভব হয়।

ফোয়ারা পদ্ধতি (Sprinkler system)

চাষের জমিতে ফসলের ওপর ফোয়ারার মতো জল ফেলা হয়।

ড্রিপ পদ্ধতি (Drip system)

পাইপের সাহায্যে উদ্ভিদের মূলের ঠিক কাছে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরে পড়ার ব্যবস্থা করা হয়।

5. আগাছা দমন (Protection from weeds)

অনেকসময় চাষের জমিতে যে ফসলের চাষ করা হচ্ছে, সেটা ছাড়াও অন্যান্য আরও কিছু উদ্ভিদ জন্মায়। এই অপ্রয়োজনীয় উদ্ভিদগুলোই হলো আগাছা। এই আগাছাগুলো যে উদ্ভিদের চাষ করা হচ্ছে, তাদের জল, পুষ্টি উপাদান, থাকার জায়গা আর আলোয় ভাগ বসায়। তাই ফসলের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। কোনো কোনো আগাছা ফসল তোলায় বাধা সৃষ্টি করে। চাষিরা আগাছা নির্মূল করার জন্য নানা পদ্ধতি ব্যবহার করেন। জমিতে বীজ বোনার আগে চাষিরা যখন জমি চষেন তখনই আগাছাগুলো মূলশুদ্ধ উপড়ে আসে। আর তারপর শুকিয়ে গিয়ে মাটিতে মিশে যায়।

অ্যামারান্থাস ঘাস চেনোপোডিয়াম

চাষিরা অনেকসময় হাতে করে মাটি থেকে আগাছা তুলে ফেলেন। কখনও বা আগাছাগুলোকে মাটির খুব কাছ থেকে কেটে দেন। অনেকসময় আবার কিছু রাসায়নিক (যেমন 2, 4-D, ড্যালাপোন, পিক্লোরাম ইত্যাদি) স্প্রে করেও আগাছা দমন করা হয়। এই রাসায়নিক পদার্থগুলোই হলো আগাছানাশক (weedicide)। এই রাসায়নিকগুলো ফসলের কোনো ক্ষতি করে না। এই রাসায়নিক পদার্থগুলো মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক। তাই স্প্রে করার সময় চাষিদের নাক আর মুখ ঢেকে নেওয়া দরকার।

আগাছা দমনের কথা তো আমরা জানলাম। এবারে এসো এই ফাঁকে চাষের জমির কয়েকটা সাধারণ আগাছার নাম তোমাদের জানিয়ে রাখি। এরা হলো— পার্থেনিয়াম, অ্যামারান্থাস, চেনোপোডিয়াম, ঘাস ইত্যাদি।

6. ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ থেকে ফসলকে বাঁচানো (Protection from pests)

ইঁদুর, বিভিন্ন পোকা (পঙ্গপাল, উই, গুবরে জাতীয় পোকা) ফসল খেয়ে নেয় বা নষ্ট করে। এরাই হলো ফসল-ধ্বংসকারী প্রাণী (Pest)। পঙ্গপালরা দল বেঁধে উড়ে আসে আর আখ, গমের মতো উদ্ভিদের পাতা খেয়ে ব্যাপক ক্ষতি করে। কিছু পোকা আছে যারা কাণ্ডটা কুরে কুরে খায়। এরা হল stem borer। আবার উই উদ্ভিদের মূল খায়।

পঙ্গপাল

উই

গুবরে জাতীয় পোকা

এছাড়াও ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক আর ভাইরাসও উদ্ভিদে নানারকম রোগ সৃষ্টি করে ফসলের উৎপাদন কমিয়ে দেয়। কিছু ছত্রাক যেমন গমে মরিচা রোগ আর আলুতে ধসা রোগ সৃষ্টি করে। আবার কিছু ব্যাকটেরিয়া উইলট (Wilt) নামে একটা রোগ সৃষ্টি করে।

ফসল ধ্বংসকারী প্রাণীদের দমনের দুটি উপায় আছে - রাসায়নিক (Chemical) ও জৈবিক (Biological)।

রাসায়নিক দমন পদ্ধতি

ডিডিটি (DDT), বিএইচসি (BHC), ম্যালাথিওন পতঙ্গদের দমনে সাহায্য করে। সালফার আর তামার বিভিন্ন লবণ ছত্রাক দমনে সাহায্য করে। জিঙ্ক ফসফাইড আর ওয়ারফেরিন ইঁদুর জাতীয় প্রাণীদের দমন করে।

রাসায়নিক দমন পদ্ধতিতে ক্ষতিকারক প্রাণীদের মৃত্যু খুব তাড়াতাড়ি হলেও নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে।

i) অনেকসময় ক্ষতিকারক প্রাণীগুলো নির্দিষ্ট একটা রাসায়নিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

ii) আবার অনেকসময় এই রাসায়নিক পদার্থগুলো নদী বা হ্রদের জলে মিশে দূষণ ছড়ায়।

iii) রাসায়নিক পদার্থগুলো খাদ্যশৃঙ্খলে প্রবেশ করলে, খাদ্যশৃঙ্খলের শেষের দিকের জীবদের ক্ষতি হতে পারে।

iv) রাসায়নিক পদার্থগুলো ফল বা সবজির মাধ্যমে মানুষের দেহে প্রবেশ করলে নানা সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।

v) রাসায়নিক পদার্থগুলো অনেকসময় উপকারী পতঙ্গদের (মৌমাছি, প্রজাপতি) মেরে ফেলে।

এইসব কারণেই অনেকসময় ফসল ধ্বংসকারী জীবদের দমনে জৈবিক দমন পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়।

জৈবিক দমন পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে একটি জীবকে অন্য জীবের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা হয়। পরভুক (predator) আর পরজীবীদের (parasites) মাধ্যমে ফসল ধ্বংসকারী জীবদের নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়। প্রকৃতিগতভাবে কয়েক ধরনের মাকড়সা, বোলতা, ভীমরুল, গঙ্গাফড়িং ও বেশ কিছু ধরনের পাখি, ফসলের শত্রুদের (যেমন মথ, রস- শোষক পোকা, উই, উচ্চিংড়ে প্রভৃতি) ধরে খায়। তাছাড়াও কিছু ছত্রাক, প্রোটোজোয়া, ব্যাকটেরিয়া আর ভাইরাস ফসলের শত্রুদের দেহে পরজীবী রূপে বাস করে ওইসব জীবদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ রাখে।

7. ফসল তোলা (Harvesting)

ফসল পরিণত হলে ফসল সংগ্রহ করা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ফসল তোলার সময় ফসল বিশেষে কখনও হাত দিয়ে তোলা হয়। আবার কখনও বা মাটির খুব কাছ থেকে কাস্তে দিয়ে কেটে নেওয়া হয়।

কাস্তে

মাড়াই (Threshing)

দানা জাতীয় ফসলের ক্ষেত্রে ফসল উদ্ভিদকে (Crop plant) ভোজ্য অংশ থেকে আলাদা করতে হয়। এটাই হলো মাড়াই। অনেকসময় ফসল উদ্ভিদকে মাটিতে আছড়েও এই কাজটা করা হয়। কখনও বা মাটিতে ফসল উদ্ভিদটি রেখে তার ওপর দিয়ে গাধা বা ষাঁড়দের হাঁটানো হয়।

ঝাড়াই (Winnowing)

এরপর ঝাড়াই করে দানাশস্য আর ভূষি আলাদা করা হয়। এই কাজে সাহায্য নেওয়া হয় বাতাসের। উঁচু জায়গা থেকে ফেললে, ভূষি হালকা বলে হাওয়ায় উড়ে যায় আর দানাশস্যগুলো মাটিতে এসে পড়ে।

কম্বাইন হারভেস্টার (Combine Harvester) বা কম্বাইন (Combine) নামের মেশিনের সাহায্যে ফসল তোলা, মাড়াই আর ঝাড়াই সবই করা যায়।

কম্বাইন

ফসল তুলে নেওয়ার পর কাণ্ডের যে অংশগুলো চাষের জমিতে রয়ে যায়, সেগুলো আর ভূষি গবাদিপশুদের খাবার হিসাবে দেওয়া হয়। গবাদিপশুদের এই খাবারই হলো জাব (fodder)।

8. ফসল সঞ্চয় করে রাখা / মজুত করা (Storage)

ফসল তোলার পরে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য ফসল মজুত করে রাখা। দীর্ঘ সময় ধরে মজুত করার সময় পোকা, ইঁদুর আর বিভিন্ন অণুজীবদের হাত থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। সদ্য সংগ্রহ করা ফসলে আর্দ্রতা বেশি থাকে। দানা জাতীয় শস্য শুকিয়ে নিয়ে মজুত না করা হলে, তাতে নানা অণুজীবের আক্রমণ ঘটতে পারে। তাই মজুত করার আগে দানা জাতীয় শস্য ভালো করে সূর্যের আলোয় শুকিয়ে নেওয়া দরকার। আর্দ্রতা কম থাকলে বিভিন্ন পোকা, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাকের আক্রমণ রোধ করা সম্ভব।

শস্যাগার

চাষিরা চটের ব্যাগ বা ধাতব পাত্রে দানাজাতীয় শস্য রাখেন। এছাড়াও ব্যাপক মাত্রায় সঞ্চয়ের জন্য শস্যাগার বা বায়ুহীন ঘর (Silo) ব্যবহার করা হয়। উন্নত মানের এইসব শস্যাগার বায়ুহীন, আর্দ্রতাশূন্য হয়। ইঁদুর জাতীয় প্রাণী এখানে ঢুকতে পারে না। এমনকি সারাক্ষণ একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রাখার ব্যবস্থাও থাকে এখানে। অনেকসময় ফসল মজুত করার আগে ফসলের গুদামে আর ফসল মজুত রাখার ব্যাগ বা পাত্রে কীটনাশক আর ছত্রাকনাশক স্প্রে করা হয়।

বর্তমানে শস্যাগারের মধ্যে সারাক্ষণ নাইট্রোজেন গ্যাস চালনা করার ফলে ফসল-ধ্বংসকারী জীবেরা(ইঁদুর জাতীয় প্রাণী, পোকা আর অণুজীব) শস্যাগারের মধ্যে অক্সিজেনের অভাবে বাঁচতে পারে না।

বীজ সংরক্ষণ: পরের মরসুমে চাষের জন্য চাষিরা বীজ সংরক্ষণ করেন। এছাড়াও হারিয়ে যেতে বসা বিভিন্ন শস্যের বীজও নানাভাবে সংরক্ষণ করা হয়।

উদ্ভিদজাত খাদ্য চাষের বিভিন্ন পদ্ধতি

ধান

ধান পৃথিবীর এক গুরুত্বপূর্ণ শস্য। ভারতের অন্যতম প্রধান খাদ্যশস্য হলো ধান।

তুমি কতরকম ধানের কথা জানো বা শুনেছ? তোমার এলাকায় চাষের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করে জানার চেষ্টা করো সেই অঞ্চলে কোন কোন ধানের চাষ হয়। আগে হতো অথচ এখন আর চাষ হয় না এমন ধানের নামও তাঁদের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করো।

তোমার জানা ধানের নাম	এখন যেসব ধানের চাষ হয়	এখন যেসব ধানের চাষ আর হয় না

ধান ক্ষেতের ছবি আঁকো।

ভারতের কোথায় কোথায় ধান চাষ হয়

ভারতের প্রায় সব রাজ্যেই কম-বেশি ধান চাষ হয়। তবে পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, আর তামিলনাড়ুতে ধানের উৎপাদন যথেষ্ট ভালো।

চালের পুষ্টিমূল্য

ধান থেকে পাওয়া যায় চাল। চালে 79.1% কার্বোহাইড্রেট, 6% প্রোটিন আর 0.4% বিভিন্ন মৌল থাকে। এছাড়াও থাকে ভিটামিন B- কমপ্লেক্স আর অন্যান্য কিছু ভিটামিন। এছাড়াও ধানের ভূষি থেকে তেল পাওয়া যায়।

ধানের প্রকারভেদ

জাতিগত বৈশিষ্ট্য আর চাষ করার পদ্ধতি অনুসারে ধানকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। এরা হলো আউশ বা শরৎকালীন ধান, আমন বা শীতকালীন ধান আর বোরো বা গ্রীষ্মকালীন ধান।

উৎপাদন ক্ষমতা অনুসারে আবার ধানকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়— অপেক্ষাকৃত কম ফলনশীল দেশি প্রকারের ধান আর উচ্চফলনশীল প্রকারের ধান।

এবারে আউশ, আমন আর বোরো ধানের চাষ সম্বন্ধে সাধারণ কয়েকটা কথা জেনে নিই।

আউশ

আউশ ধান সাধারণত জমিতে একেবারে সরাসরি বোনা হয়। তাই এর চাষের পদ্ধতি, আমন ও বোরো ধান চাষের পদ্ধতির থেকে একটু আলাদা। সাধারণত রবি ফসল তুলে নেওয়ার পরেই জমি তৈরি করে জমিতে ধান বোনা হয়। পলি, দোঁয়াশ বা এঁটেল — প্রায় সব ধরনের মাটিতেই আউশ ধান বোনা হয়। কোনো কোনো অঞ্চলে অবশ্য সরাসরি বীজ না বুনে, বীজতলা তৈরি করেও আউশ ধান বোনা হয়।

আমন

যে-কোনো ধরণের মাটিতে বর্ষাকালে আমন ধানের চাষ করা হয়। তবে কাদা মাটি বা এঁটেল মাটিই চাষের জন্য ভালো। পশ্চিমবঙ্গে আমন ধানের চাষই বেশি। আমাদের দেশে প্রায় কয়েক হাজার জাতের আমন ধান রয়েছে। বিভিন্ন প্রকার দেশি জাতগুলো বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত। দেশি আমন ধানের মধ্যে উৎকৃষ্ট জাতগুলো হলো — ভাসামানিক, ঝিঙ্গাশাল, রঘুশাল, পাটনাই - 23, বাসমতী প্রভৃতি। আমন ধান চাষের জন্য আগে বীজতলায় বীজ ফেলে চারাগাছ তৈরি করা হয়। এরপরে চাষের জমিতে চারাগাছগুলো রোপণ করা হয়। বীজতলায় ফেলার আগে বীজগুলো শোধন করে নেওয়া দরকার।

বোরো

আমন ধান কাটার পরে বীজতলা তৈরি করে এই ধরনের ধান রোপণ করা হয়। আর মার্চ-এপ্রিল মাস নাগাদ ধান কাটা হয়। যেসব অঞ্চলে জলসেচের ব্যবস্থা আছে, সেখানে বোরো ধানের চাষ হয়।

ধান কত তাড়াতাড়ি পাকে, তার ভিত্তিতে আবার ধানকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

i) জলদি জাত/স্বল্পমেয়াদি জাত — ধান খুব তাড়াতাড়ি পেকে যায়। যেমন রত্না জাতের ধান 95-115 দিনের মধ্যে পেকে যায়।

ii) মাঝারি জাত/মধ্যমেয়াদি জাত — ধান পাকতে মাঝারি রকম সময় লাগে। জয়া, জয়ন্তী প্রভৃতি জাতের ধান 116-135 দিনের মধ্যে পাকে।

iii) নাবি জাত বা দীর্ঘমেয়াদি জাত — ধান পাকতে বেশিদিন সময় লাগে। স্বর্ণ, মাসুরি, পঙ্কজ প্রভৃতি ধান পাকতে 140-150 দিন সময় লাগে।

আউশ, আমন, বোরো সবারই জলদি, মাঝারি আর নাবি জাতের ধান আছে। আর একটা কথাও কিন্তু খেয়াল রেখো, একই জাতের ধানকে আউশ, আমন বা বোরো এই তিন মরশুমেই চাষ করা যায়।

গোল্ডেন রাইস : ভিটামিন A-এর চাহিদা মেটাতে কৃষি বিজ্ঞানীরা এই বিশেষ ধরনের ধান তৈরি করেছেন।

নীচের তালিকায় আউশ, আমন ও বোরো ধান চাষের একটা সাধারণ সময়সূচি দেওয়া হলো।

ধানের প্রকার	বীজতলা তৈরি করা	ধান রোপণ করা	ধান বোনা	ধান কাটা
1. আউশ	x x x	x x x	উঃবঙ্গ: মার্চ-এপ্রিল দঃবঙ্গ: মে-জুন	জুলাই-সেপ্টেম্বর
2. আমন	জুন-জুলাই	জুলাই-আগস্ট	x x x	ডিসেম্বর-জানুয়ারি
3. বোরো	নভেম্বর	ডিসেম্বর	x x x	এপ্রিল-মে

চাষের পদ্ধতি

চাষের ধাপ	কী করা হয়
i) বীজ বাছাই	ঘন নুন জলে বীজগুলোকে ডুবিয়ে নাড়ানো হলে সুস্থ আর পুষ্ট বীজগুলো ভারী বলে জলে ডুবে যায়। এই বীজগুলোকে পরিষ্কার জলে ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হয়।
ii) বীজ শোধন	*a) শুষ্ক শোধন পদ্ধতি :* জমিতে সরাসরি বীজ বোনার জন্য বা শুকনো বীজতলায় বীজ বোনার জন্য এই পদ্ধতি কাজে লাগে। বীজবাহিত রোগজীবাণু ধ্বংস করার জন্য বীজের সঙ্গে রাসায়নিক পদার্থের গুঁড়ো মেশানো হয়।
	b) সিক্ত শোধন পদ্ধতি : সিক্ত বীজতলায় অঙ্কুরিত বীজ বোনার জন্য এই পদ্ধতি উপযোগী। বীজবাহিত রোগজীবাণু ধ্বংসের জন্য বীজগুলোকে রাসায়নিক পদার্থের জলীয় মিশ্রণে ভিজিয়ে রাখা হয়। অনেকসময় উষ্ণ জলেও বীজ শোধন করা হয়।
iii) বীজতলা প্রস্তুতি ও চারাগাছ তৈরি	*a) শুষ্ক বীজতলা :* খারিফ ঋতুতে ভালো বৃষ্টি হয় এমন অঞ্চলের পক্ষে শুষ্ক বীজতলা উপযোগী। হালকা লাঙল দিয়ে জমি দু-একবার চষে, জমির আগাছা নির্মূল করা হয়। জমি চষার সময় যথাযথ পরিমাণে জৈব বা অজৈব সার ব্যবহার করা হয়। চারাগাছগুলো 5-6 টি পাতাবিশিষ্ট আর 12-15 সেমি লম্বা হলে রোপণের উপযোগী হয়ে ওঠে।
	b) সিক্ত বা কাদান বীজতলা : নির্বাচিত জমিতে জল বেঁধে রেখে জৈব সার দেওয়া হয়। মাটি নরম হয়ে উঠলেই জমি চষতে হয়। ফলে কয়েকদিনের মধ্যে মাটি কাদা কাদা হয়ে যায়। জমিতে পরিমাণমতো অজৈব সার দেওয়া হয়। এরপর বীজতলায় অঙ্কুরিত বীজ বোনা হয়। পর্যায়ক্রমে বীজতলাকে শুকনো আর জলসেচ করার ফলে চারাগাছগুলোর মূলের বৃদ্ধি ভালো হয়। প্রয়োজনমতো কীটনাশক ওষুধ ও সার দেওয়া হয়।
(iv) জমি তৈরি	*a) শুষ্ক পদ্ধতি :* আউশ ধান ও কোনো কোনো অঞ্চলে নীচু জমিতে আমন ধান চাষ করার সময় বীজতলা ব্যবহার না করে জমিতে সরাসরি বীজ বোনা হয়। রবি শস্য তুলে নেওয়ার পরেই দু-একবার চষে জমি ফেলে রাখা হয়। তার ফলে জমির আগাছাগুলো নষ্ট হয় আর জমি বেশ শুকনো হয়। জমিতে পরিমাণমতো জৈব আর অজৈব সার দেওয়া হয়।

চাষের ধাপ	কী করা হয়
	b) সিক্ত বা কাদান জমি তৈরি: সিক্ত বীজতলা থেকে ধানের চারাগাছ রোপণ করার জন্য সিক্ত বা কাদান জমি তৈরি করা প্রয়োজন। শুষ্ক পদ্ধতির মতো রবি শস্য তুলে নেওয়ার পর দু-একবার চষে জমি ফেলে রাখা হয়। এইসময় জমিতে 5 সেন্টিমিটারের মতো গভীর জল 2-4 দিন বেঁধে রেখে লাঙল দিয়ে কয়েকবার চষলে মাটি কাদা কাদা হয়ে যায়। শেষবার জমি চষার সময় প্রয়োজনমতো জৈব ও অজৈব সার দেওয়া হয়।
v) বীজ বোনা আর চারাগাছ রোপণ	*a)* **বীজ বোনা :** আউশ ধানের বীজ সরাসরি জমিতে বোনা হয়। মাটি বেশ নরম থাকতে থাকতেই, হাতে করে ছিটিয়ে বা জমি চষার সময় লাঙলের পেছনে তৈরি হওয়া খাতে হাত দিয়ে বীজ ফেলে বা বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে জমিতে বীজ বোনা হয়।
	b) **চারাগাছ রোপণ :** সকালের দিকে বীজতলা থেকে চারাগাছগুলোকে সাবধানে তুলে আনা হয়। তারপর তৈরি জমিতে 2-3 সেন্টিমিটারের মতো জল বেঁধে রেখে সারিবদ্ধভাবে চারাগাছগুলো রোপণ করা হয়।
vi) সার প্রয়োগ	জমির উর্বরতার মান আর ধানের জাত অনুসারে সারের প্রকার আর মাত্রা বিভিন্ন রকমের হয়। এক্ষেত্রে জৈব আর অজৈব দু-রকম সারই ব্যবহার করা হয়।
vii) অন্তবর্তী কর্ষণ ও পরিচর্যা	ধান জমিতে সময়ে সময়ে নিড়ান দিলে জমির আগাছা সহজে দমন করা যায়। মাটিও নরম থাকে আর চারাগাছগুলোর বৃদ্ধিও ভালো হয়। অনেকসময় রাসায়নিক আগাছানাশক পদার্থ ব্যবহার করেও ধানজমির আগাছা ধ্বংস করা হয়।
viii) জলসেচ	রোপণ করা আউশ, আমন আর বোরো ধানের বেড়ে ওঠার সময় ও পরিণত অবস্থায় গাছের গোড়ায় 30 মিলিমিটার থেকে 50 মিলিমিটার গভীর জল থাকা প্রয়োজন। এছাড়াও খারিফ ঋতুতে অনিয়মিত বৃষ্টিপাতে, প্রাক-খারিফ ও বোরো ধান চাষে নিয়মিত জলসেচের প্রয়োজন হয়।
ix) ফসল তোলা	ফসল তুলে আঁটি বেঁধে খামারে তোলা হয়। এরপর মাড়াই করে দানাগুলোকে খড় থেকে আলাদা করে নেওয়া হয়।

আম

ফলের রাজা হলো আম। তোমরাও নিশ্চয়ই আম খেয়েছ। তোমরা কোন কোন ধরনের আমের নাম জানো? সেই নামগুলো নীচের সারণিতে লিখে ফেলো। বছরের কোন সময়ে ওই আম হয় সেটাও লেখো।

আমের নাম	বছরের কোন সময় হয়

আম থেকে কী ধরনের খাবার তৈরি হয়?

আমের জন্মস্থান আমাদের এই ভারতবর্ষ। পরে আম নিয়ে যাওয়া হয়েছে শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে। ভারতে প্রায় সব জায়গাতেই কম বেশি আমের চাষ হয়। পশ্চিমবঙ্গে মালদা, মুর্শিদাবাদ আর নদিয়াতে সবচেয়ে বেশি আমের চাষ হয়।

আমগাছ তো নিশ্চয়ই দেখেছ। আম গাছের ছবি আঁকো।

আমের গুণাগুণ

ভালো জাতের আমে সুন্দর গন্ধযুক্ত শাঁস থাকে ; আঁশ না থাকাই বাঞ্ছনীয়। আমে থাকে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট ও খনিজ পদার্থ (Ca, P, Fe ইত্যাদি)। প্রচুর পরিমাণে থাকে ভিটামিন A, B-কমপ্লেক্স ও C। এছাড়াও থাকে জল, তন্তু আর ফাইটোকেমিক্যাল (বিটা-ক্যারোটিন)।

আবহাওয়া

এবারে দেখে নেওয়া যাক কীরকম আবহাওয়া আমের বেড়ে ওঠার পক্ষে উপযোগী। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 1500 মিটার উচ্চতা অবধি আম গাছ ভালো জন্মায়। কিন্তু বেশি উচ্চতায় আম গাছ বাড়লেও বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা যায় না। আমগাছে মুকুল আসার সময় আকাশ বেশ পরিষ্কার থাকা, তুষারপাত ও কুয়াশা না হওয়া একান্তভাবে জরুরি। কারণ বৃষ্টিপাত ও কুয়াশা আমের মুকুলের পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকারক।

মাটি কেমন হওয়া দরকার

আম বিভিন্ন ধরনের মাটিতে জন্মায়। কিন্তু তবুও নদী অববাহিকার পলিমাটি আর উর্বর দোঁয়াশ মাটি আম চাষের পক্ষে বিশেষভাবে উপযুক্ত। বেলে মাটি আর কাদা বা এঁটেল মাটি আম চাষের পক্ষে অনুপযুক্ত।

আমের জাত

হিমসাগর, বোম্বাই, ল্যাংড়া, গোলাপখাস, সফদরপসন্দ বা বীড়া, পেয়ারাফুলি, রানিপসন্দ, ঝুমকোফজলি, নীলাম, চৌসা, দশেরি, আম্রপালি, আলফানসো, বেগমফুলি — সারা ভারতে নানা জাতের আম পাওয়া যায়। তাদের স্বাদ আর গন্ধও আলাদা আলাদা রকমের। পশ্চিমবঙ্গে হিমসাগর, গোলাপখাস, সফদরপসন্দ বা বীড়া, পেয়ারাফুলি, রানিপসন্দ, ঝুমকোফজলি প্রায় প্রতি বছরই ফলন দেয়। এই ব্যাপারে ল্যাংড়া বড়োই খামখেয়ালি। প্রতি বছর ঠিকমতো ফলন পাওয়া যায় না। পশ্চিমবঙ্গের যে আমগুলোর নাম করা হলো, তাদের মধ্যে সবচেয়ে আগে পাকে গোলাপখাস আর সব থেকে শেষে ঝুমকোফজলি। ঝুমকোফজলি আসলে একজাতের ফজলি। আকারে কিছুটা ছোটো। থোকা থোকা হয়ে ফলে। প্রচুর পরিমাণে আর নিয়মিত ফলে।

বংশবিস্তার

বীজ থেকে আমের বংশবিস্তার করার রেওয়াজই অনেককাল ধরে বহুল প্রচলিত। কিন্তু বীজের আম গাছে কখনও তার জাত-বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি বজায় থাকে না। একটা ভালো জাতের আমের আঁটি পুঁতলে যে চারাগাছটা জন্মাবে, তাতে কিন্তু ওই ভালো জাতের সব গুণবিশিষ্ট আম ফলবে না।

এই সমস্যা এড়াতে ভালো জাতের আম গাছ থেকে কলম করা হয়। কলম থেকে তৈরি চারাগাছের ভালো জাতের সব গুণ বজায় থাকে। তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছ, কলম করা আবার কী? তোমরা হয়তো দেখেছ যে করবী বা জবা গাছের একটা ডাল কেটে মাটিতে পুঁতে দিলে, সেখান থেকে নতুন গাছ বেরোয়। এটাও কিন্তু একধরনের

কলম করা। একে বলে শাখাকলম। অর্থাৎ উদ্ভিদের কোনো একটা অঙ্গ থেকে নতুন উদ্ভিদ তৈরি করা। এটা উদ্ভিদের একধরনের অঙ্গজ বিস্তার (propagation) যা কৃত্রিম পদ্ধতিতে করানো হয়।

আমগাছের কলম বিভিন্ন পদ্ধতিতে করা হয়— যেমন জোড় কলম, ভিনিয়ার কলম, চিপ কলম, আঁটির কলম। আমরা এখানে কেবল সবচেয়ে প্রচলিত যে কলম পদ্ধতি, জোড় কলম, সেটা নিয়ে সংক্ষেপে জানব।

আমের জোড়কলম

আঁটি থেকে তৈরি করা একটা চারাগাছের (স্টক) সঙ্গে উন্নত জাতের আম গাছের (সিয়ন) শাখা এক সঙ্গে জোড় বেঁধে কলম করা হয়। সেইজন্য এই পদ্ধতির নাম জোড়কলম। সাধারণত আষাঢ় মাসে এই কলম করা হয়।

i) কলম করার জন্য চারাগাছ আর উন্নত জাতের আমগাছের শাখা, দুটোরই কিছুটা করে অংশ কেটে নিয়ে দুটোকে জোড়া লাগিয়ে সুতলি দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। জোড়া না লাগা পর্যন্ত চারাগাছটাতে জল দেওয়া হয়।

ii) জোড়া লাগা সম্পূর্ণ হলে নির্বাচিত সিয়ন গাছটার জোড়ের নীচের দিকের অংশ ও চারাগাছের জোড়ের ওপরের দিকের অংশ একবারে না কেটে 2 থেকে 3 বারে কেটে ফেলা হয়। (কাটার জায়গাটা ছবিতে তিরচিহ্নের সাহায্যে দেখানো হয়েছে।)

iii) জোড়কলমের মাধ্যমে তৈরি হওয়া গাছটাকে কয়েকদিনের জন্য ছায়ায় রাখা হয়। তারপর নার্সারিতে লাগানো হয়।

চাষের পদ্ধতি

চাষের ধাপ	কী করা হয়
i) জমি তৈরি	পর্যাপ্ত সূর্যের আলো আসে আর জল নিষ্কাশনের ভালো ক্ষমতা আছে এমন উঁচু জমি বেছে নেওয়া হয়। ভালোভাবে চষে জমি সমান করে নেওয়া হয়। এরপর জমিতে শণের বীজ বোনা হয়। শণ গাছগুলোর বয়স 5-6 সপ্তাহের মতো হলে লাঙল ও মইয়ের সাহায্যে মাটিতে ভালোভাবে মাড়িয়ে, পচিয়ে সবুজ সার তৈরি করা হয়।
ii) চারাগাছ লাগানো	কলম করার অন্তত কয়েকমাস পরে চারাগাছ লাগানোই ভালো। আমাদের দেশে সাধারণত বর্ষায় চারাগাছ লাগালেই ভালো হয়। সমান দূরত্বে গর্ত খুঁড়ে, গর্ত থেকে তোলা মাটির সঙ্গে পরিমাণ মতো গোবর সার, সুপার ফসফেট আর ছাই মিশিয়ে আবার গর্তগুলো ভরতি করে দেওয়া হয়। এরপর চারাগাছগুলোকে সোজাভাবে লাগিয়ে প্রতিটা গাছে একটা করে কাঠি পুঁতে হালকাভাবে বেঁধে দিলে গাছ সোজাভাবে বেড়ে ওঠে।
iii) সার প্রয়োগ	নিয়মিত ও পরিমাণমতো আমের ফলন পেতে হলে প্রতি বছরই সঠিক পরিমাণে সার দেওয়া প্রয়োজন। গাছের প্রাথমিক বৃদ্ধিতে নাইট্রোজেনের চাহিদা বেশি থাকে। তাই অ্যামোনিয়াম সালফেট বা ইউরিয়া দেওয়া হয়।
iv) জলসেচ	চারাগাছের 6 মাস বয়স পর্যন্ত সপ্তাহে দুবার আর তারপর সপ্তাহে একবার করে সেচের ব্যবস্থা করতে পারলে ভালো হয়। গাছ বড়ো হয়ে গেলে 15 দিন অন্তর সেচ দেওয়া উচিত।

চাষের ধাপ	কী করা হয়
v) অন্যান্য পরিচর্যা	আমগাছ লাগানোর পর শুধু জল আর সার দিলে চলবে না। সেইসঙ্গে বাগানের জমি নিয়মিত চষে পরিষ্কার রাখতে হয় — একবার বর্ষার শুরুতে আর একবার বর্ষার শেষে। এর ফলে ঝরে পড়া পাতা আর আগাছা মাটির সঙ্গে মিশে জৈব সারে পরিণত হয়।
vi) ফল সংগ্রহ	ফুল থেকে ফল আসতে প্রায় 4-5 মাস সময় লাগে। পশ্চিমবঙ্গে সাধারণত পৌষ-মাঘ মাসে আমে মুকুল আসে। আম পুরোপুরি পাকার আগেই গাছ থেকে পেড়ে নেওয়া উচিত। নইলে পাখিতে আম নষ্ট করে। আম যখন ফিকে-সবুজ হতে আরম্ভ করে, তখনই বোঝা যায় যে আম পাড়ার সময় হয়েছে।
vii) ফলন	কলমের আমগাছে পরের বছরেই ফুল চলে এলেও 5 বছরের আগে গাছ থেকে ফল নেওয়া উচিত নয়। মুকুল এলেই ভেঙে দিতে হয়। গাছের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফলের সংখ্যা ও পরিমাণ বাড়তে থাকে।
viii) ফল সংরক্ষণ	উন্নত জাতের আমকে পরিণত, শক্ত ও সবুজ অবস্থায় তুলে ভালোভাবে প্যাকিং করে হিমঘরে যথাযথ উষ্ণতা আর আর্দ্রতায় বেশ কয়েক সপ্তাহ ভালোভাবে রাখা যায়।

চা

চা-এর সঙ্গে তোমাদের সবারই অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইরাবতী নদীর অববাহিকা চায়ের আদি নিবাস। চিনা ভাষায় Tey থেকে Tea শব্দটা এসেছে বলে মনে করা হয়। চিন, ভারত, কেনিয়া, শ্রীলঙ্কা আর টার্কি পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি চা উৎপাদন করে। ভারতের প্রধান চা উৎপাদনকারী রাজ্যগুলো হলো আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু আর কেরালা। 1000 থেকে 2500 মিটার উঁচু এলাকার পাহাড়ের গায়ে আম্লিক মাটিতে চায়ের চাষ হয়। ভারতে নানা ধরনের চা পাওয়া যায়। তার মধ্যে দার্জিলিং, আসাম আর নীলগিরির চা বিখ্যাত।

চায়ের গুণাগুণ

i) চা পান করলে শরীরে উদ্দীপনা আসে। এর মূলে আছে চায়ে ক্যাফিনের উপস্থিতি।

ii) চায়ে থাকে ফ্ল্যাভোনয়েড, ট্যানিন, উদ্‌বায়ী তেল আর ভিটামিন B- কমপ্লেক্স — যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।

iii) চায়ে উপস্থিত পলিফেনল রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। এছাড়া উচ্চ রক্তচাপ, হেপাটাইটিস সারাতেও সাহায্য করে।

iv) চায়ের প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড, ক্যাফিন ও থিয়োফাইলিন স্নায়ুকে উদ্দীপিত করে আর হৃৎপিণ্ডকে ভালো রাখে।

v) চায়ে বেশি পরিমাণে থাকা ফ্লুওরাইড দাঁতের ক্ষয় রোধ করে।

vi) কালো চায়ে প্রচুর ভিটামিন B-কমপ্লেক্স আর ফলিক অ্যাসিড থাকে। এদের প্রদাহ-প্রতিরোধী আর ক্যানসার-প্রতিরোধী ভূমিকা আছে।

vii) সবুজ চায়ে থাকে ভিটামিন K যা শরীরের ভেতরে হওয়া রক্তক্ষরণ, রিউম্যাটিক প্রদাহ আর হার্ট অ্যাটাক হতে বাধা দেয়।

চা গাছের প্রকারভেদ

উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা *Camellia* গণের অন্তর্ভুক্ত চা উৎপাদনকারী তিন ধরনের গাছকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করেন। এরা হলো চিনা জাত, আসামি জাত আর ক্যাম্বোড সংকর জাত। এছাড়াও চা তৈরি করা হয় না অথচ *Camellia* গণের অন্তর্ভুক্ত এরকম আরো অনেক প্রজাতির উদ্ভিদ আছে। বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা হয় এমন চা গাছের উৎপত্তিতে এদের সবার ভূমিকা রয়েছে। তাই বাণিজ্যিক চা গাছগুলোকে বিশেষ কোনো জাতের বলে চিহ্নিত করা মুশকিল।

বংশ বিস্তার (Propagation)

বীজ থেকে বা উদ্ভিদ অঙ্গ থেকে, এই দু-ভাবেই চা গাছের বংশবিস্তার করানো হয়।

বীজ থেকে

ভালো জাতের সুস্থ, সবল আর সতেজ বীজ বেছে নেওয়া হয়। এরপর বালির ওপরে (Sand bed) বীজগুলোর অঙ্কুরোদগম ঘটানো হয়। অঙ্কুরিত বীজগুলোকে পলিথিনের প্যাকেটে নার্সারি বাগিচায় স্থানান্তরিত করা হয়। নার্সারি বাগিচায় জল নিষ্কাশনের ভালো ব্যবস্থা থাকা দরকার। মাথার ওপর শামিয়ানা খাটিয়ে বা প্যান্ডেল তৈরি করে ছায়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। 15-18 মাস পরে চারাগাছগুলো অন্য জায়গায় স্থানান্তরণের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

অঙ্গজ বিস্তার

পর্ব থেকে কেটে নেওয়া শাখা অঙ্গজ বিস্তারের জন্য ব্যবহার করা হয়। ছায়া নেই এমন জায়গায় জন্মানো আর পাতা তোলা হয় না এমন চা গাছের ঝোপ থেকে শাখা কেটে নেওয়া হয়। সাধারণত সকালে আর সন্ধ্যায় এই কাজটা করা হয়। সাধারণত 3- 4 সেন্টিমিটার লম্বা শাখা কাটা হয় যাতে একটা পাতা আর একটা ফোলা সুপ্ত কাক্ষিক মুকুল আছে। এই কেটে নেওয়া শাখাগুলোকে এরপর নার্সারি বাগিচা আর তারপর পলিথিনের প্যাকেটে স্থানান্তরিত করা হয়। শামিয়ানা বা প্যান্ডেল খাটিয়ে ছায়ার ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণত 12-18 মাস বয়সের চারাগাছ চাষের জমিতে লাগানো হয়।

চাষের পদ্ধতি

চাষের ধাপ	কী করা হয়
i) জমি তৈরি	চা চাষের জমিতে দাঁড়িয়ে থাকা সব উদ্ভিদ মূলশুদ্ধ উপড়ে ফেলা হয়। কারণ মাটির নীচে মূল রয়ে গেলে সেখান থেকে নতুন চা উদ্ভিদে নানা রোগের সংক্রমণ ঘটতে পারে। তারপর অন্তত 45 সেন্টিমিটার অবধি গভীরভাবে মাটি চষা হয়। এরপর গুয়াটেমালা ঘাস, সিট্রোনেলা ঘাস, ক্রোটালারিয়া ও আরও অন্যান্য কিছু উদ্ভিদের চাষ করা হয়। NPK জাতীয় অজৈব সার বা জৈব সার দেওয়া হয়। এই ধরনের ফসলের চাষ মাটির গঠন উন্নত করে আর মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বাড়ায়। এইসব ফসলের উপস্থিতি মাটিতে থাকা বহু রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুদের মেরে ফেলতে বা নিষ্ক্রিয় করতে সাহায্য করে। এরপর এই উদ্ভিদগুলোকে সরিয়ে দিয়ে চা গাছের চারা রোপণের প্রস্তুতি শুরু করা হয়।

চাষের ধাপ	কী করা হয়
ii) চারাগাছ রোপণ	রোপণের এক সপ্তাহ আগে গভীর গর্ত খোঁড়া হয়। এরপর গর্তগুলো জমির ওপরের স্তরের মাটি (top soil) দিয়ে ভরতি করে 12-18 মাসের চারাগাছগুলো পোঁতা হয়। চারাগাছগুলোর গোড়ার চারধারে ভেজা পাতা, খড় ইত্যাদি রাখা হয় (mulching) ।
iii) ছায়ার ব্যবস্থা	ক্রান্তীয় আর উপ-ক্রান্তীয় অঞ্চলে ছায়ায় চা গাছের চাষ করা হয়। চা গাছকে এই ছায়া দেয় কিছু ছায়া তরু (Shade tree)। ছায়া তরুরা সূর্যের বিকিরণের বেশ কিছু অংশ শোষণ করে চারপাশের তাপমাত্রা কমিয়ে দেয়। ফলে গ্রীষ্মে চা পাতার সালোকসংশ্লেষের যথাযথ হার বজায় থাকে। ছায়া তরুর পাতা মাটিতে পড়ে মাটির জৈব পদার্থের পরিমাণও বাড়ায়। সিলভার ওক জাতীয় গাছ ছায়া তরুর কাজ করে।
iv) আগাছা দমন	চা বাগানে একবীজপত্রী আর দ্বিবীজপত্রী, এই দু-ধরনের আগাছাই জন্মায়। আগাছানাশক নানা রাসায়নিক পদার্থ (ডাইইউরন, সিমাজিন, 2.4-D ইত্যাদি) ব্যবহার করা হয়। জলের সঙ্গে মিশিয়ে এই আগাছানাশকগুলো স্প্রে করা হয়।
v) সার প্রয়োগ	চা যেহেতু একটা পাতা জাতীয় ফসল, তাই নাইট্রোজেনযুক্ত সার প্রয়োগে উৎপাদন বাড়ে। ইউরিয়া, অ্যামোনিয়াম সালফেট বা ক্যালশিয়াম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট প্রভৃতি সার ব্যবহারের মাধ্যমে মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়ানো হয়।
vi) জলসেচ	উত্তর- পূর্ব ভারতে শুখা মরশুমে (অক্টোবর-ফেব্রুয়ারি) সাধারণত ফোয়ারা পদ্ধতিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়।
vii) ফসল তোলা	অগ্রমুকুল, পর্বমধ্য আর তার ঠিক নীচের 2টো বা 3টে পাতাযুক্ত চা গাছের নবীন শাখা তোলা হয় অর্থাৎ 1 টা কুঁড়ি আর 2 টো বা 3 টে পাতা। এই কাজের ওপরেই নির্ভর করে চায়ের উৎপাদন আর চায়ের গুণাগুণ। বাণিজ্যিক চাগাছগুলো থেকে বছরে 35-40 বার পাতা তোলা হয়। একেকবার প্রতিটি গাছ থেকে 10-15 গ্রাম পাতা তোলা হয়।
viii) চা-পাতা তৈরি	চা গাছ থেকে তোলা পাতা কিন্তু চা তৈরির জন্য উপযুক্ত নয়। তোলার পরে নানারকম পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পরেই চা-পাতা চা তৈরির উপযুক্ত হয়ে ওঠে।
ix) চায়ের গুণাগুণ পরীক্ষা	চা-পাতা তৈরির একটা গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো চায়ের স্বাদ পরীক্ষা করে দেখা । বিক্রির আগে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চা পরীক্ষকরা চায়ের স্বাদ, বর্ণ, গন্ধ পরীক্ষা করে দেখেন।

চা পাতা তৈরির ধরন অনুযায়ী বাণিজ্যিক চা-কে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এই তিন ধরনের চা হলো — কালো চা (Black tea), সবুজ চা (Green tea) আর উলং চা (Oolong tea)। সারা পৃথিবীর চা উৎপাদনের প্রায় 75 শতাংশই হলো কালো চা।

প্রাণিজ খাদ্য চাষের বিভিন্ন পদ্ধতি

আমরা উদ্ভিদ থেকে যেমন নানা ধরনের খাবার পাই, তেমনই প্রাণীদের থেকেও পাই। তোমরা এর আগে দেখেছ যে উদ্ভিদজাত খাবার পেতে গেলে চাষ করতে হয়। একইভাবে প্রাণীজাত খাবার নিয়মিত আর যথেষ্ট পরিমাণে পেতে গেলেও সেইসব প্রাণীদের যত্নের সঙ্গে প্রতিপালন করা দরকার। আর সেইসঙ্গে দরকার তাদের প্রজননের সুব্যবস্থা করা। এটাই হলো পশুপালন (Animal husbandry)।

আমরা এখানে মৌমাছি, মাছ আর মুরগি পালন সম্বন্ধে জানব।

মৌমাছি

মৌমাছি তোমরা অনেকেই দেখেছ। আর মৌচাক দেখেছ? গাছের ডালে, বাড়ির কার্নিসে, ঝোপঝাড় বা অন্যান্য জায়গায় মৌচাক ঝুলে থাকতে দেখেছ নিশ্চয়ই। মৌমাছিদের কাছ থেকে আমরা পাই মধু আর মোম। গাছের ডালে বা অন্যান্য জায়গায় যে মৌচাক তোমরা দেখো, সেগুলো কিন্তু আসলে বুনো মৌমাছিদের তৈরি করা চাক। বুনো মৌমাছি বলছি তার কারণ ওই মৌমাছিদের পালন করা হয়নি। ওরা নিজেদের তাগিদেই মৌচাক বানায়। আর সেখানে মধুও তৈরি করে।

মৌচাক

মৌমাছিদের সমাজ

মৌমাছিদের মধ্যে বিভিন্ন কাজ করার জন্য নানাধরনের মৌমাছি দেখা যায়— রানি মৌমাছি, পুরুষ মৌমাছি আর শ্রমিক মৌমাছি। মৌমাছিরা সমাজবদ্ধ জীব। মৌমাছিদের সমাজে তিন ধরনের মৌমাছিদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট কাজ আছে। রানি মৌমাছির কাজ ডিম পাড়া। পুরুষ মৌমাছির কাজ রানি মৌমাছির সঙ্গে প্রজননে অংশ নেওয়া। আর শ্রমিক মৌমাছির কাজ অনেক - মৌচাক তৈরি করা, ফুলের পরাগরেণু আর মকরন্দ সংগ্রহ করা, রানি ও পুরুষ মৌমাছিদের সেবা করা, মধু ও মোম তৈরি করা, সন্তান লালনপালন করা, মৌচাক পাহারা দেওয়া।

শ্রমিক রানি পুরুষ

মৌচাক আর মধু তৈরি

মৌমাছিরা মৌচাক কীভাবে তৈরি করে জানো কি? শ্রমিক মৌমাছিদের পেটের অনেক থলিতে থাকে মোম গ্রন্থি। এই মোম গ্রন্থির ক্ষরণ দিয়ে তারা মৌচাক তৈরি করে। প্রতিটি মৌচাকে অসংখ্য ষড়ভুজাকৃতি প্রকোষ্ঠ থাকে।

আর মৌমাছি মধু কীভাবে তৈরি করে? শ্রমিক মৌমাছিরা ফুল থেকে মকরন্দ সংগ্রহ করে। সংগ্রহ করা মকরন্দ নিজেদের দেহের মধুথলিতে জমা রাখে। মধুথলিতে মকরন্দের সঙ্গে লালারস মেশে। এর ফলে

মকরন্দে থাকা শর্করার কিছু পরিবর্তন হয়। শ্রমিক মৌমাছি এরপর এই মিশ্রণকে মধু প্রকোষ্ঠে উগরে দেয়। আর ডানা দিয়ে ক্রমাগত বাতাস করতে থাকে। ফলে জল বাষ্পীভূত হয়ে মধুতে পরিণত হয়।

মধুর পুষ্টিগুণ

মধুতে প্রচুর গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ থাকায় এটি পুষ্টিকর। এছাড়াও এতে অ্যামাইনো অ্যাসিড ও বিভিন্ন খনিজ পদার্থ (Na, K, Ca, Fe, Mg, P) থাকে। এছাড়াও ভিটামিন A, B-কমপ্লেক্স ও C থাকে।

মৌমাছিরা কীভাবে বেড়ে ওঠে

এসো এবারে চট করে জেনে নেওয়া যাক, মৌমাছিরা কীভাবে ছোটো থেকে বড়ো হয়ে ওঠে। মৌমাছিদের জীবনে চারটে দশা দেখা যায়— ডিম, লার্ভা, পিউপা, পূর্ণাঙ্গ। রানি আর পুরুষ মৌমাছির মিলনের পর রানি মৌমাছি ডিম দেয়। তারপর ডিম থেকে লার্ভা আর লার্ভা থেকে হয় পিউপা। আর পিউপারা পরিণত হয় পূর্ণাঙ্গ মৌমাছিতে।

মৌমাছিদের রকমভেদ

পাহাড়ি মৌমাছি

ভারতীয় মৌমাছি

ছোটো মৌমাছি

ইউরোপীয় মৌমাছি

মৌমাছি পালন

বুনো মৌমাছির চাক থেকে যে মধু পাওয়া যায়, তার পরিমাণ খুবই অল্প। আর সেটা নিয়মিত পাওয়াও যায় না। আর ওই মধুর গুণাগুণও নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। তাই বিজ্ঞানসম্মত ও কৃত্রিম উপায়ে মৌমাছি প্রতিপালন করা হয়। এটাই মৌমাছি পালন বা মৌচাষ। মৌমাছি পালন করার জন্য মৌমাছিদের যে প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম থাকার জায়গা ব্যবহার করা হয়, সেটাই হলো মধুমক্ষীশালা বা এপিয়ারি।

ভারতে মৌমাছি পালনের জন্য দু-ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় — দেশীয় পদ্ধতি আর আধুনিক বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

দেশীয় পদ্ধতি

i) এই পদ্ধতিতে মৌমাছিদের প্রতিপালন করা হয় না। প্রাকৃতিকভাবে গাছের ডাল, ঘরের দেয়াল বা কার্নিস প্রভৃতি জায়গায় তৈরি হওয়া মৌচাক খুঁজে বার করা হয়।

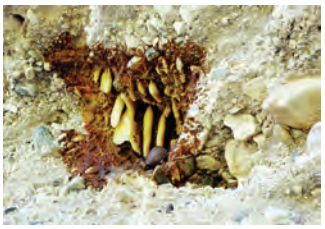

ii) অনেক সময় আবার ফাঁকা কাঠের গুঁড়ি, কাঠের বাক্স বা মাটির হাঁড়ি মৌমাছিদের চলাচলের জায়গায় রেখে দেওয়া হয়। মৌমাছিরা স্বেচ্ছায় এইসব জায়গায় এসে চাক তৈরি করতে পারে।

iii) পরে আগুন, জল বা ধোঁয়া দিয়ে সেই চাক থেকে মৌমাছিদের তাড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ফলে মৌমাছিরা চাক ছেড়ে পালিয়ে যায় আবার কখনও বা মারাও যায়। তারপর সেই মৌচাক ভেঙে মধু বের করে নেওয়া হয়।

আধুনিক পদ্ধতি

i) এই পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক মৌচাক তৈরির কৌশল অবলম্বনে কৃত্রিম মৌচাক তৈরি করা হয়। প্রকৃতিতে স্বাভাবিক উপায়ে তৈরি মৌচাকে নীচের দিকে থাকে মৌমাছিদের সন্তান পালনের ঘর। আর ওপরের দিকে থাকে মধু প্রকোষ্ঠ। এই কৃত্রিম চাকেও সেইরকম ব্যবস্থা করা থাকে।

কৃত্রিম মৌচাক

ii) একটা রানি মৌমাছি আর কতগুলো শ্রমিক মৌমাছিদের ধরে এনে কৃত্রিম মৌচাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা যায় আরও অনেক মৌমাছি ওই মৌচাকে এসে জড়ো হয়েছে।

iii) খুব অল্প সময়ের মধ্যে রানি মৌমাছির ডিম থেকে মৌচাকে প্রচুর মৌমাছির সৃষ্টি হয়।

iv) আম, জাম, লেবু, পেয়ারা, গাজর, ধনে, সরষে, মৌরি, লাউ, কুমড়ো, পেঁয়াজ, মটর ইত্যাদি নানান রকম গাছ থেকে মৌমাছিরা মকরন্দ সংগ্রহ করে। তাই মৌমাছি পালন করতে গেলে মধুমক্ষীশালার কাছাকাছি এইসব গাছ থাকা দরকার।

v) মৌচাক থেকে বিশুদ্ধ মধু সংগ্রহ করার জন্য বিশেষ ধরনের মধু নিষ্কাশন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

মাছ

মাছ চাষ (Fisheries), কথাটা খুব ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। মাছ ছাড়াও চিংড়ি, শামুক, ঝিনুক, ব্যাঙ ইত্যাদি প্রাণীদের চাষও মাছ চাষের মধ্যেই পড়ে। আমরা কেবল মাছের চাষ (Pisciculture) নিয়েই আলোচনা করব।

মাছ চাষের প্রকারভেদ

মাছ উৎপাদনের ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী মাছ চাষকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়।

মাছ চাষ (মাছ উৎপাদনের ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী)

সংগ্রহভিত্তিক (Capture)	**পালনভিত্তিক** (Culture)
নদ-নদী ও বিশাল জলাশয়ে মাছ পালন করা সম্ভব হয় না। তাই নদ-নদী ও বিশাল জলাশয়গুলোতে কেবল মাছ ধরা হয়।	পুকুর, খাল, বিল, ডোবা, ভেড়ি প্রভৃতি জলাশয়ে মাছের চারা ছাড়া হয়। নিয়মিত সার প্রয়োগ, খাদ্য সরবরাহ, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য পরিচর্যার মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়।

মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্র অনুযায়ী মাছ চাষকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

মাছ চাষ (মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্র অনুযায়ী)

- **অন্তর্দেশীয়** (Inland)
  - **স্বাদু/ মিঠেজল** (Fresh water)
  - **অল্প লবণাক্ত জল** (Brackish water)
- **সামুদ্রিক** (Marine)
  - **উপকূলীয়** (Coastal)
  - **গভীর সামুদ্রিক** (Deep Sea)

আমরা এখানে মূলত স্বাদু জলে পালনভিত্তিক মাছ চাষ নিয়ে আলোচনা করব।

মাছ চাষ নিয়ে আলোচনা শুরু করার আগে সাধারণত যেসব মাছের চাষ করা হয় তাদের সম্বন্ধে জেনে নিই।

কার্প কী?

মিঠে জলে বাস করা যেসব অস্থিযুক্ত মাছের ত্রিকোণাকৃতি মাথায় আঁশ থাকে না, অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র ও চোয়ালে দাঁত অনুপস্থিত আর দেহের ভেতরে পটকা থাকে— তারাই হলো কার্প। যেমন রুই, কাতলা, বাটা ইত্যাদি মাছ। কার্পকে আবার দু-ভাগে ভাগ করা যায়।

কার্প

- **দেশি কার্প** (Indigenous carp)
  - **মেজর কার্প**
    - i) আকারে বড়ো।
    - ii) তাড়াতাড়ি বাড়ে। সাধারণত বদ্ধ জলে ডিম পাড়ে না।
    - iii) ব্যবসায়িক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ আর চাহিদাও বেশি।
    - উদাহরণ: রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবোস
  - **মাইনর কার্প**
    - i) আকারে ছোটো।
    - ii) তাড়াতাড়ি বাড়ে না। সাধারণত বদ্ধ জলে ডিম পাড়ে।
    - iii) ব্যবসায়িক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ নয়।
    - উদাহরণ: বাটা, পুঁটি ইত্যাদি
- **বহিরাগত কার্প** (Exotic carp)
  - i) বিদেশ থেকে আমদানি করা।
  - ii) ভারতীয় জলবায়ুতে মানিয়ে নিয়ে বেড়ে ওঠে আর প্রজননেও সক্ষম।
  - উদাহরণ: গ্রাস কার্প/ঘেসো রুই, কমন কার্প/আমেরিকান রুই, সিলভার কার্প

রুই

কাতলা

মৃগেল

কালবোস

পুঁটি

কমন কার্প

সিলভার কার্প

গ্রাস কার্প

মাছ চাষের বিভিন্ন পর্যায়

1. ডিম পোনা সংগ্রহ

প্রজনন ঋতুতে অর্থাৎ জুন-জুলাই (আষাঢ়-শ্রাবণ) মাসে রুই, কাতলা, মৃগেলের স্ত্রী মাছগুলো অগভীর জলে ডিম ছাড়ে আর পুরুষ মাছ তার শুক্রাণু নিঃসরণ করে। শুক্রাণু আর ডিম্বাণুর মিলনে ডিম পোনা তৈরি হয়। আর মাছ চাষিরা জাল দিয়ে ছেঁকে ডিম পোনা আর নিষিক্ত ডিমগুলোকে হাঁড়িতে সংগ্রহ করে। নিষিক্ত ডিম কোনগুলো জানো? যেসব ডিমের সঙ্গে শুক্রাণুর মিলন হয়েছে, সেগুলোই হলো নিষিক্ত ডিম। আর এই মিলনের প্রক্রিয়াটাই হলো নিষেক। নিষিক্ত ডিমগুলো থেকেই ডিম পোনা তৈরি হয়।

কৃত্রিম পদ্ধতি

i) কৃত্রিম পদ্ধতিতে ডিমপোনা তৈরি করলে কোন কোন মাছের ডিমপোনা তৈরি হচ্ছে সেটা নিয়ন্ত্রণে থাকে। আর ডিমপোনা সংগ্রহেও অনেক সুবিধা হয়।

ii) এই পদ্ধতিতে প্রতিটা সুস্থ, সবল স্ত্রী মাছের জন্য দুটো সুস্থ, সবল পুরুষ মাছ নেওয়া হয়। মাছের মাথায় মানুষের মতোই একটা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থাকে— এর নাম পিটুইট্যারি গ্রন্থি। মাছের পিটুইট্যারি গ্রন্থির নির্যাস নিয়ে ওই বাছাই করা মাছদের ইনজেকশান দেওয়া হয়। আর পুরুষ ও স্ত্রী মাছের কোনটাকে কখন কতবার কতটা ইনজেকশান দেওয়া হবে তার একটা নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। তোমরা পরে এবিষয়ে বিশদে জানবে।

iii) পিটুইট্যারি ইনজেকশান দেওয়ার ফলে স্ত্রী মাছ ডিম আর পুরুষ মাছ শুক্রাণু নিঃসরণ করে। শুক্রাণু আর ডিম্বাণুর মিলনে ডিম পোনা তৈরি হয়।

2. ডিম পোনা থেকে পূর্ণাঙ্গ মাছ

প্রকৃতি থেকে মাছ চাষীদের সংগ্রহ করা নিষিক্ত ডিমগুলো থেকে ডিম পোনা তৈরি করার জন্য একটা পুকুরে রাখা হয়। এটাই হ্যাচারি। আর ডিম পোনাদের পরপর বেশ কয়েকটা পুকুরে প্রতিপালন করে পূর্ণাঙ্গ মাছ তৈরি করা হয়। এই পুকুরগুলো হলো আঁতুড় পুকুর, পালন পুকুর আর সঞ্চয়ী পুকুর।

ডিম পোনা —(আঁতুড় পুকুর)→ ধানি পোনা —(পালন পুকুর)→ চারা পোনা —(সঞ্চয়ী পুকুর)→ পূর্ণাঙ্গ মাছ

মিশ্র মাছ চাষ

দেশি মাছদের মধ্যে রুই, কাতলা, মৃগেল---এরা পুকুরের জলের বিভিন্ন স্তরে বাস করে আর সেখান থেকেই খাবার সংগ্রহ করে। যেমন কাতলা মাছ ও সিলভার কার্প জলের ওপরের স্তর থেকে, রুই মাছ ও গ্রাস কার্প জলের মাঝের স্তর থেকে আর মৃগেল মাছ ও কমন কার্প জলের নীচের স্তর থেকে খাবার সংগ্রহ করে। তাই এই ধরনের মাছগুলো একসঙ্গে চাষ করলে খাবার ও থাকার জায়গা নিয়ে এদের মধ্যে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় না। ফলে মাছ তাড়াতাড়ি বাড়ে। এই পদ্ধতিতে অনেক সময় একই পুকুরে কেবল রুই, কাতলা আর মৃগেল মাছের চাষ করা হয়। আবার অনেক সময়ে দেশি আর বহিরাগত এই দু রকম মাছের চাষ একই পুকুরে করা

হয়। এই দুটো ক্ষেত্রেই দেখা যায় মাছের উৎপাদন অনেকটাই বেড়ে গেছে। তিন ধরনের দেশি মাছ একই পুকুরে চাষ করাটাই হলো মিশ্র মাছ চাষ। আর তিনধরনের দেশি কার্পের সঙ্গে তিনধরনের বহিরাগত কার্প একই পুকুরে চাষ করাটাই হলো নিবিড় মিশ্র চাষ বা পলিকালচার।

ময়লা জলে মাছ চাষ

আগে জানা দরকার ময়লা জল বলতে কী বোঝানো হচ্ছে। ঘরবাড়ি, পৌরসভা ও কলকারখানার বর্জ্যপদার্থ মেশানো সাধারণত কালো রঙের জল — একেই বলা হয় ময়লা জল। এই জলে মল-মূত্রও মিশে থাকে। আর থাকে কঠিন পদার্থরূপে বিভিন্ন জৈব ও অজৈব পদার্থ।

ময়লা জলে থাকা বিভিন্ন অজৈব পদার্থ, অজৈব সারের মতো কাজ করে। ফলে জলে নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তাই মাছের প্রাথমিক খাবার, ফাইটোপ্ল্যাংকটন প্রচুর পরিমাণে তৈরি হয়। আর এরই ফলে তৈরি হয় জুপ্ল্যাংকটন ও অন্যান্য পোকামাকড়ও। এরাও মাছের খাবার। তাই বাইরে থেকে কৃত্রিম খাবার দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

তবে এক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে মাছ চাষের পুকুরে সরাসরি অপরিশোধিত ময়লা জল ব্যবহার করলে মাছের ক্ষতি হয়। তাই মাছ চাষের পুকুরে সরাসরি ব্যবহারের আগে ময়লা জল পরিশোধন করে নেওয়া জরুরি।

পূর্ব কলকাতার ভেড়িগুলো এই ময়লা জলে মাছ চাষের অন্যতম কেন্দ্র। বিভিন্ন ক্যানাল বা নালার সাহায্যে কলকাতার ময়লা জল নিয়ে ওই অঞ্চলের ভেড়িগুলোতে সরবরাহ করা হয়। তারপর ওই জলে মাছ চাষ করা হয়।

মাছের পুষ্টিগুণ

প্রাণিজ প্রোটিন, অপরিহার্য অ্যামিনো অ্যাসিড ও ফ্যাটি অ্যাসিড সরবরাহে মাছের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তাছাড়াও বিভিন্ন খনিজ পদার্থ (Ca, P, Na, K, Mg, S) ও কিছু ভিটামিন (A, C, D ও B-কমপ্লেক্স) থাকে।

পোলট্রি

হাঁস আর মুরগীর মতো পাখিদের পালন করা হয় আর্থিক লাভের জন্য। কারণ এদের ডিম আর মাংসের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে এমন পাখিরাই হলো পোলট্রি পাখি। আমরা এখানে কেবল মুরগি পালন সম্বন্ধে জানব। অর্থনৈতিক উপযোগিতার ভিত্তিতে মুরগিদের তিনটে ভাগে ভাগ করা হয়।

মুরগি (অর্থনৈতিক উপযোগিতার ভিত্তিতে)

ডিম উৎপাদনকারী জাত (Laying breed)	মাংস উৎপাদনকারী জাত (Table breed)	উভগুণ সম্পন্ন জাত (Dual breed)
এরা বছরে 150-200 বা তারও বেশি ডিম পাড়ে। তাই ডিমের জন্যই এদের পালন করা হয়। উদাহরণ: লেগহর্ন, মিনরকা	এরা বছরে অধিক পরিমাণে মাংস উৎপন্ন করে। তাই শুধু মাংসের জন্য এদের পালন করা হয়। উদাহরণ: আসিল,চিটাগং, ব্রামা, কোচিন	এই ধরনের মুরগিদের থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ডিম আর মাংস পাওয়া যায়। ডিম আর মাংস দুটোই পাওয়ার জন্য এদের পালন করা হয়। উদাহরণ: রোড আইল্যান্ড রেড, প্লাইমাউথ রক, নিউ হ্যাম্পশায়ার

ওজন অনুসারেও মুরগিদের দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।

মুরগি (ওজন অনুসারে)

হালকা জাত (Light Breed)
যেসব মুরগির ওজন 2-3 কিলোগ্রামের মধ্যে থাকে। উদাহরণ: লেগহর্ন

ভারী জাত (Heavy Breed)
যেসব মুরগির ওজন 3 কিলোগ্রামের বেশি হয়। উদাহরণ: আসিল, ব্রামা, প্লাইমাউথ রক

ডিমে তা দেওয়ার প্রকৃতি অনুযায়ীও মুরগিদের দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।

মুরগি (ডিমে তা দেওয়ার প্রকৃতি অনুসারে)

সিটার (Sitter)
যেসব মুরগি ডিমে তা দেয়
উদাহরণ: ব্রামা, কোচিন

নন-সিটার (Non-Sitter)
যেসব মুরগি ডিমে তা দেয় না
উদাহরণ: লেগহর্ন

মুরগি পালন

আমরা এখানে মুরগি পালনের দুটো আধুনিক পদ্ধতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে জানব।

1. ব্যাটারি খাঁচায় মুরগি পালন পদ্ধতি

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মুরগি পালনের এটা একটা উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে প্রতিটা মুরগির জন্য আলাদা আলাদা খাঁচার ব্যবস্থা করা হয়। খাঁচাগুলো এমন হয় যে খাঁচার অল্প জায়গার মধ্যে একটা মুরগি স্বচ্ছন্দে বসতে বা দাঁড়াতে পারে। এরকম অনেকগুলো খাঁচা সারিবদ্ধভাবে থাকে। খাঁচার মেঝে পেছন থেকে সামনের দিকে ঢালু থাকে। খাঁচার মেঝে ঢালু থাকায় মুরগি ডিম পাড়লে তা সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়ে এসে খাঁচার বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকা খাঁজে জমা হয়। খাঁচার বাইরের দিকে খাবার আর জলের পাত্র লাগানো থাকে। আর খাঁচার নীচে মুরগিদের মল সংগ্রহের পাত্র থাকে।

ব্যাটারি খাঁচার মধ্যে মুরগিরা বেশি নড়াচড়া করতে পারে না। তাই শক্তি খরচ হয় কম। তাই এরা যা খায় তার বেশির ভাগটাই দেহগঠন আর ডিম তৈরিতে কাজে লাগে।

2. ডিপ-লিটার পদ্ধতি

লিটার তৈরির ঘর আলো বাতাস যুক্ত হওয়া দরকার। ঘরের মেঝেতে লিটার তৈরির আগে চুন আর ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে জীবাণুমুক্ত করা হয়। এরপর এই পরিষ্কার আর শুকনো মেঝেতে লিটার বিছানো হয়। এবার তাহলে জেনে নেওয়া যাক, লিটার কী? বিচালি (ছোটো ছোটো করে কাটা খড়), কাঠের গুঁড়ো, শুকনো পাতা, ধান, তুলোবীজ আর যবের তুষ, ভুট্টা, আমের খোসা ইত্যাদি

দিয়ে ঘরের মেঝেতে জীবের জন্য শয্যা তৈরি করা হয়। এটাই লিটার। প্রথমে কাঠের গুঁড়ো ছড়িয়ে তার ওপর খড় বিছানো হয়। এরপর অন্যান্য জিনিসগুলো বিছিয়ে 10-15 সেন্টিমিটার পুরু নতুন লিটার তৈরি করা হয়। মুরগিরা থাকতে আরম্ভ করলে ওই লিটারে মুরগির মল ভালোভাবে মিশে গেলে পুরোনো লিটারের ওপরে আবার নতুন করে 5 সেন্টিমিটার পুরু লিটার পাতা হয়। এর ফলে মোটামুটি 20 সেন্টিমিটার পুরু স্থায়ী লিটার তৈরি সম্পূর্ণ হয়।

ডিপ-লিটার ঘরের দেয়ালের বাইরে খাবার আর জলের পাত্র এমনভাবে রাখা হয়, যাতে মুরগি ঘরের ভেতর থেকে শিকের ফাঁক দিয়ে মাথা গলিয়ে খাবার আর জল খেতে পারে। এই ঘরের দেয়ালে আবার ডিম পাড়ার জন্য বাসা বসানো থাকে। মুরগিরা ওই বাসায় গিয়ে ডিম পাড়ে।

মুরগির মাংস ও ডিমের পুষ্টিগুণ

মুরগির মাংস আর ডিম প্রাণীজ প্রোটিনের এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস। মুরগির মাংসে ক্ষতিকারক ফ্যাটের পরিমাণ অন্যান্য মাংসের তুলনায় কম থাকায় এটি স্বাস্থ্যকর। মুরগির ডিম অপরিহার্য অ্যামিনো অ্যাসিডের জোগান দেয় । ডিম বিভিন্ন মৌলের ((Fe, Ca, P, K) ও ভিটামিনের (A, B-কমপ্লেক্স, D ও E) চাহিদা মেটায়।

ব্রয়লার

ব্রয়লার হলো একধরনের সংকর মুরগি। শুধুমাত্র মাংস পাওয়ার জন্য এদের সৃষ্টি করা হয়েছে। সংকর জাতের মুরগি তৈরি করার প্রথম চেষ্টা সম্ভবত হয় 1930 সালে। কর্নিশ জাতের একটা পুরুষ মুরগির সঙ্গে সাদা প্লাইমাউথ জাতের একটা স্ত্রী মুরগির মিলন ঘটিয়ে সংকর জাতের মুরগি তৈরি করা হয়। এটাই ব্রয়লার জাতের মুরগি।

ব্রয়লার জাতের মুরগি খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। কাজকর্ম বা নড়াচড়া খুব একটা করে না। যা খায়, তার বেশিরভাগটাই নিজের দেহগঠনে কাজে লাগায়। এরা মাত্র 5-7 সপ্তাহের মধ্যে বিক্রি করার মতো ওজনে পৌঁছে যায়। অন্যদিকে স্বাধীনভাবে পালিত মুরগিদের বিক্রি করার মতো ওজনে পৌঁছোতে লাগে 12-16 সপ্তাহ।

ধান, আম বা চায়ের চাষ সম্বন্ধে তোমার কোনো অভিজ্ঞতা থাকলে নীচে লেখো।

তোমার অভিজ্ঞতা

মৌমাছি পালন, মাছ চাষ বা পোলট্রি পাখি পালন সম্বন্ধে তোমার কোনো অভিজ্ঞতা থাকলে নীচে লেখো।

তোমার অভিজ্ঞতা

9 অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি ও বয়ঃসন্ধি

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি

নীচের গল্পগুলি পড়ো। প্রতিটি গল্পে ঘটনাগুলো তোমাদের প্রায় চেনা। এখন সেই চেনা ঘটনাগুলোর কারণ খোঁজার চেষ্টা করো —

গল্প-১

তাপসের আজকাল আয়নায় মুখ দেখা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। সকালে স্কুলে যাওয়ার আগে বেশ পরিপাটি করে চুল আঁচড়ায়। মা একটু বকাবকিই করেন। আয়নার সামনে বেশিক্ষণ দাঁড়ায় বলে। কিন্তু তা বলে তাপস ওর অভ্যাসটি ছাড়ে না। রোজ আয়নায় নিজেকে দেখে। ওর ইদানীং গোঁফের রেখা দেখা যাচ্ছে, গলার স্বরেরও খানিক বদল ঘটেছে। তাপস মাকে বলে, মা ওরকমভাবে বোকো না। দেখছ না, আমি বড়ো হয়ে গেছি।

গল্প-২

আজ ইস্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দিন । অসিত অন্যদের সঙ্গে দৌড়োবে। বাঁশি বাজতেই সব প্রতিযোগী মাঠের ধারে লাইন বরাবর দাঁড়িয়ে পড়ল। দ্বিতীয় বাঁশি বাজতেই দৌড় শুরু। প্রাণপণে দৌড়ে অসিত যখন দড়ি ছুঁল,দেখল ও প্রথম হয়েছে। অসিত কথা বলতেই পারছিল না। বুকের হৃৎপিণ্ডটা খুব জোরে জোরে ধুকপুক করছিল। ভীষণ হাঁপাচ্ছিল ও। দরদর করে ঘাম ঝরছিল। জিভটাও শুকিয়ে আসছিল। একটুখানি বসতেই আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে গেল।

গল্প-৩

সুজাতা বাবার সঙ্গে সার্কাস দেখতে গিয়েছিল। খুবই ভালো লেগেছিল ওর। তবে দুজন মানুষকে ওর সবচেয়ে ভালো লেগেছিল। একজন খাটো রণি, অন্যজন রণির বন্ধু বিশাল লম্বা টনি। মনে হয় টনি যেন পায়ে রণ-পা পরে আছে। সুজাতা অবাক হয়ে গিয়েছিল। এরকম খাটো আর এরকম লম্বা মানুষও হয়!

গল্প-৪

রাবেয়া মায়ের সঙ্গে মেলায় বেড়াতে গিয়েছিল। ঘুরতে ঘুরতে খুব জল তেষ্টা পেয়েছিল। মাকে বলল সেকথা। তখন তিনি রাবেয়াকে শরবত কিনে দিলেন। দোকানদারকে শরবতে চিনি মেশাতে বারণ করলেন। রাবেয়া মাকে শরবতে চিনি দিতে না বলার জন্য চাপ দিল না। রাবেয়া জানত যে ওর চিনি খাওয়া একদম বারণ। তাই ও একেবারেই মিষ্টি খায় না। আজকাল খুব অল্পেই হাঁপিয়ে যায়। কোথাও কেটে গেলে ঘা যেন শুকোতে চায় না।

গল্প-৫

আজকাল চায়নার খুব ঘুম পায়। সেদিন তো ক্লাসের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। তার জন্য দিদির কাছে খুব বকুনি খেয়েছিল । কী যে হয়েছে চায়নার। গলার সামনেটা উঁচু মতো কী একটা যেন ওঠানামা করছে। খুব ক্লান্তি বোধ করে। পড়াশোনা করতেই ইচ্ছে করে না। সবসময় কেবল ঘুমোতে ইচ্ছে করে।

ছোটোবেলা থেকে বড়ো হবার পথে একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর আমাদের শরীরে নানা পরিবর্তন ঘটে। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে লেখো।

তোমার ছোটোবেলার সঙ্গে তুলনা করে নীচের কাজটি করো —

শরীরের নানা পরিবর্তন	কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে
1. উচ্চতা	
2. ওজন	
3. কণ্ঠস্বর	
4. পেশির গঠন	

সুতরাং তোমরা দেখলে একটা বয়সের পর তোমার মতোই অনেকের উচ্চতা, ওজন, কণ্ঠস্বরের বেশ পরিবর্তন ঘটেছে। আচ্ছা এবার মনে তো প্রশ্ন উঠতেই পারে যে এই ধরনের নানা শারীরিক পরিবর্তনের কারণ কী? শুধুই কি শরীরের পরিবর্তন ঘটে। মনেরও তো ঘটে, তাই না?

তোমরা এবার নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে লেখো তো মনের কী কী পরিবর্তন ঘটে —

মনের পরিবর্তন	কখন হয়
1. রাগ হওয়া	
2. কান্না পাওয়া	
3. হিংসা করা	
4. ভালো লাগা	
5. অভিমান হওয়া	

জন্মের সময় থেকে শুরু করে মারা যাবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের শরীরে, মনে নানা পরিবর্তন ঘটে। আর এইসব পরিবর্তনের অন্যতম নিয়ন্ত্রক হলো হরমোন। শরীরের বৃদ্ধি, ওজন, হজম প্রক্রিয়া, রোগ প্রতিরোধ, রক্তচাপ, মূত্র উৎপাদন, ঘাম তৈরিতে এমনকি হৃদযন্ত্র ঠিক রাখতে সক্রিয় ভূমিকা নেয় হরমোন। তোমার ভালোলাগা, মন্দলাগা, কান্না, হাসি, সব আবেগকেই অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করে হরমোন।

আসলে হরমোন হলো আমাদের শরীরে রক্তবাহিত কয়েক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ। এরা প্রয়োজন অনুযায়ী এক সেকেন্ডের জন্যও আমাদের শরীরে তৈরি হতে পারে আবার কোনো কোনো হরমোন সারাজীবন ধরেই রক্তে পাওয়া যায়।

আমাদের শরীরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে দু-ধরনের সংযোগ স্থাপন হয়। পায়ে মশা বসলে মস্তিষ্ক ঠিক খবর পায়। মস্তিষ্ক তখন হাতকে নির্দেশ দেয় মশাকে তাড়ানোর জন্য। হাত তখন মস্তিষ্কের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে। এই ঘটনাটি স্নায়বিক সংযোগস্থাপনের একটি উদাহরণ। আর একটি সংযোগস্থাপন হলো রাসায়নিক। রাসায়নিক বার্তাবাহক হিসাবে রাসায়নিক সংযোগ স্থাপনের কাজটা অনেকটাই করে হরমোন। প্রয়োজনীয় নির্দেশ পেলেই সে নির্দিষ্ট জায়গা থেকে তৈরি হয়ে লক্ষ্যে চলে যায়। যে লক্ষ্যে যায় তার নাম গ্রাহক। হরমোন খুব ধীরে ধীরে কাজ শুরু করে। কিন্তু কাজের প্রভাব থাকে অনেকক্ষণ। কাজ হয়ে গেলে হরমোন নষ্ট হয়ে যায়। রক্তে হরমোনের মাত্রা কমে গেলে প্রয়োজন অনুযায়ী আবার নতুন করে তৈরি হয়। তবে ধারাবাহিকভাবে রক্তে হরমোনের মাত্রা স্বাভাবিকের থেকে বেশি বা কম থাকলে নানারকম সমস্যা দেখা যায়। কোনো কোনো হরমোন আমাদের শরীরে প্রোটিনের ব্যবহার কমিয়ে দেয়। ফ্যাটের ভাঙন বাড়িয়ে দেয়। অব্যবহৃত প্রোটিনকে দেহগঠন ও বৃদ্ধির কাজে লাগায়।

হরমোন কোথা থেকে তৈরি হয়

আমাদের শরীরে বিভিন্ন অঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে নানা কোশের গুচ্ছ বা গ্রন্থি। তাদের মধ্যে বেশ কিছু গ্রন্থির আবার পাইপের মতো নালিকা আছে।

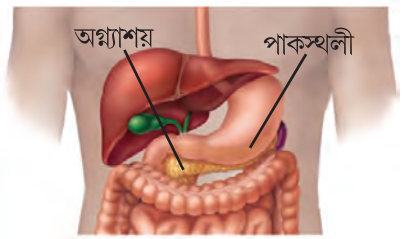

নালিকার মধ্যে দিয়ে গ্রন্থি থেকে বেরোনো রস এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যায়। এই ধরনের গ্রন্থিকে বলে বহিঃক্ষরা গ্রন্থি বা এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ড। যেমন, লালাগ্রন্থি থেকে বেরোনো লালারস, পাকস্থলীর গ্রন্থি থেকে বেরোনো পাকরস, অগ্ন্যাশয় থেকে বেরোনো অগ্ন্যাশয়রস ইত্যাদি। তবে এই রসে নানান এনজাইম বা উৎসেচক থাকে যা খাবারকে ভাঙতে সাহায্য করে।

আবার বেশ কিছু গ্রন্থি আছে যাদের কোনো নালিকা নেই। তাই এইসব গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত রস সরাসরি রক্তে মেশে। রক্তবাহিত হয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায়। এই গ্রন্থি থেকেই ক্ষরিত হয় হরমোন। রক্ত এই হরমোনগুলোকে নির্দিষ্ট ক্রিয়াস্থলে নিয়ে যায়। এইসব গ্রন্থিকে বলে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি বা এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড। যেমন থাইরয়েড গ্রন্থি । তবে আরও একধরনের গ্রন্থি আছে যাদের মধ্যে অন্তঃক্ষরা ও বহিঃক্ষরা দু-ধরনের গ্রন্থিকোশ থাকে। তারা হলো মিশ্র গ্রন্থি। নালিকাবিহীন কোশ থেকে হরমোন বেরোয় আর নালিকাযুক্ত কোশ থেকে বেরোয় উৎসেচক, যা খাবারকে ভাঙতে সাহায্য করে। যেমন অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি।

প্রধান প্রধান অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি ও তাদের কাজ

1. **পিট্যুইটারি গ্রন্থি** — মস্তিষ্কের মূলদেশে দুটি খণ্ড বিশিষ্ট পিট্যুইটারি গ্রন্থি থাকে। ওপরের খণ্ডকে বলে অগ্র পিট্যুইটারি, আর নীচের খণ্ডকে বলে পশ্চাৎ পিট্যুইটারি। পিট্যুইটারির এই দুটি খণ্ড থেকে নানারকম হরমোন ক্ষরণ হয়। যেমন সোমাটোট্রফিক হরমোন, থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন, গোনাডোট্রফিক হরমোন, ভ্যাসোপ্রেসিন ইত্যাদি। এরকম একটা ছোটো গ্রন্থি গোটা শরীরের নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে।

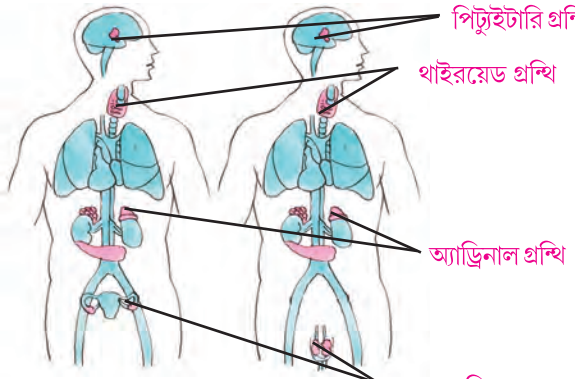

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি যেখানে যেখানে থাকে

● **সোমাটোট্রফিক হরমোন:** এই হরমোনকে বৃদ্ধিপোষক হরমোনও বলে। আমাদের শরীরের বিভিন্ন পেশি ও হাড়গুলির দৈর্ঘ্য বাড়ায়। প্রোটিনের উৎপাদন বাড়ায় আর প্রোটিনের ক্ষয় কমায়।

অল্পবয়সে এই হরমোনের বেশি ক্ষরণ হলে বিপদ আছে। হাড় বেড়ে যায়। উচ্চতা 7-8 ফুট হয়ে যায়। আর কম ক্ষরণ হলেও বিপদ! পরিণত মানুষের উচ্চতা মাত্র তিন ফুটের মতো হয়। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে শিশুদের মতো দেখায়।

এছাড়া আরও কিছু হরমোন ক্ষরণ করে পিট্যুইটারি গ্রন্থি। যা কিনা অন্য অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলিকে উত্তেজিত করে।

● থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন: পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হয়। থাইরয়েড গ্রন্থির বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে থাইরক্সিন হরমোন ক্ষরণে উদ্দীপনা যোগায়। তবে এই হরমোন ক্ষরণ বেশি হলে থাইরয়েড গ্রন্থি ফুলে যায়। ফলে গলা ফুলে ওঠে।

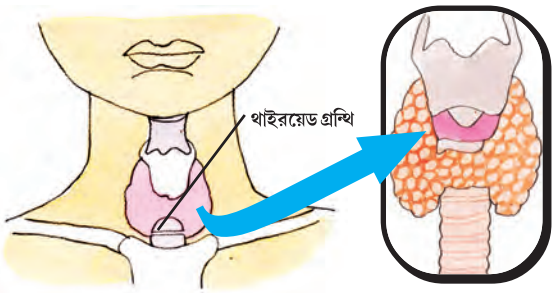

2. থাইরয়েড গ্রন্থি: আমাদের গলার সামনে স্বরযন্ত্র রয়েছে। তার ঠিক নীচে শ্বাসনালির দু-পাশে থাইরয়েড গ্রন্থি থাকে। কারো কারো ক্ষেত্রে ঢোঁক গেলার সময় এটি ওঠানামা করে। এই গ্রন্থির দুটি খণ্ড। এই গ্রন্থি থেকে থাইরক্সিন নামক হরমোন ক্ষরিত হয়।

● **থাইরক্সিন:** এই হরমোন হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হারকে বাড়াতে সাহায্য করে। এই হরমোন আমাদের শরীরে শক্তি উৎপাদনকে প্রভাবিত করে। আমাদের শরীরের কোশগুলিতে অক্সিজেনের ব্যবহারকে বাড়িয়ে দেয়। দেহের হাড় ও পেশিকে বাড়াতে সাহায্য করে।

এই হরমোন বেশি ক্ষরণে থাইরয়েড গ্রন্থি ফুলে ওঠে, কিছু ক্ষেত্রে মনে হয় যেন চোখ দুটো ঠেলে বাইরে চলে আসছে। রক্তচাপের তারতম্য হয়।
আবার কম ক্ষরণ হলে শিশুর বাড় কমে যায়, পেট ফোলা হয়, পেশি দুর্বল হয়। জিভ বেরিয়ে থাকে। মুখ থেকে লালা গড়ায়। বড়োদের শরীরে এই হরমোনের কম ক্ষরণে শরীরের চামড়া ফোলা ফোলা ও খসখসে হয়।

3. অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি: পাকস্থলীর নীচে ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডেনামের 'U' আকৃতির বাঁক থেকে প্লীহা পর্যন্ত রয়েছে অগ্ন্যাশয়। আমরা আগেই জেনেছি অগ্ন্যাশয় হলো মিশ্র গ্রন্থি। এই গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হয় ইনসুলিন ও গ্লুকাগন নামক হরমোন।

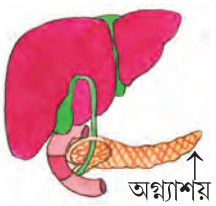

● **ইনসুলিন:** অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি ক্ষরিত এই হরমোন রক্তের সাহায্যে গ্লুকোজকে কোশে ঢুকতে সাহায্য করে। গ্লুকোজের ভাঙন ঘটিয়ে শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করে। আবার গ্লুকোজকে যকৃৎ ও পেশিতে গ্লাইকোজেনরূপে সঞ্চয় করে রাখতে সাহায্য করে। আবার কখনো -কখনো প্রোটিন, ফ্যাট থেকে গ্লুকোজ উৎপাদনে বাধা দেয়। ফলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা ঠিক থাকে, ডায়াবেটিস রোগের সম্ভাবনা কমে। তাই একে অ্যান্টিডায়াবেটিক হরমোন বলা হয়।

এই হরমোনের কম ক্ষরণে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়। ফলে মূত্রের সঙ্গে গ্লুকোজ দেহ থেকে বাইরে বেরিয়ে যায়। কোশে প্রয়োজনীয় গ্লুকোজ ঢুকতে পারে না। বারেবারে খিদে পায়। শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ে। রক্তে চিনির পরিমাণ বেড়ে থাকার জন্য রোগজীবাণুর সংক্রমণ বাড়ে। হৃৎপিণ্ড, বৃক্ক ও চোখের কার্যক্ষমতা কমে যায়।

4. অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি: আমাদের প্রতিটি বৃক্ক বা কিডনির উপর ত্রিভুজের মতো একজোড়া গ্রন্থি আছে। বামদিকের গ্রন্থিটি আকারে বড়ো। ডানদিকেরটা ছোটো। বৃক্কের ওপরে টুপির মতো বসানো। এই গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত অ্যাড্রিনালিন হরমোন দেহের নানা জরুরি অবস্থায় ক্ষরিত হয়। জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য দেহকে প্রস্তুত করে। তাই এই হরমোনকে আপৎকালীন হরমোন বলে।

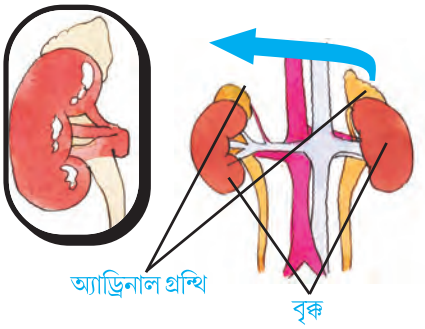

● **অ্যাড্রিনালিন হরমোন:** অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি থেকে অ্যাড্রিনালিন হরমোন ক্ষরিত হয়। এই হরমোন আমাদের শরীরে শ্বাসকার্যের হারকে বাড়ায়। আমাদের শরীরের তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে। হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণ ক্ষমতা বাড়ায়। মূত্র উৎপাদনকেও নিয়ন্ত্রণ করে। বিশেষ করে আমাদের বিভিন্ন মানসিক অবস্থা অর্থাৎ ভয়, দ্বন্দ্ব ও পালানোর মনোবৃত্তিকে অ্যাড্রিনালিন হরমোন জরুরি ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণ করে।

তবে এই হরমোনের অধিক ক্ষরণে মুখমণ্ডল গোলাকার হয় ও ফুলে যায়। এজন্য এই ধরনের মুখকে বলে মুন ফেস। মুখের ত্বক খসখসে আর ফ্যাকাশে হয়। মহিলাদের মুখমণ্ডলে লোমের আধিক্য দেখা যায়। ক্ষত সারতেও সময় লাগে। কম ক্ষরণে হজমের গণ্ডগোল, পেশির দুর্বলতা ইত্যাদি উপসর্গ তৈরি হয়।

দৌড়োনোর সময় আমাদের শরীরে কী কী পরিবর্তন ঘটে তা দলে মিলে আলোচনা করে লেখো ।

চোখ/মুখ	শরীরের ত্বক	মাংসপেশি	হৃৎপিণ্ড

অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত অ্যাড্রিনালিন হলো জরুরিকালীন হরমোন বা সংকটকালীন হরমোন। দৌড়োনোর সময় খুব শক্তি দরকার হয়। অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত অ্যাড্রিনালিন সেই বাড়তি শক্তি জোগাতে সাহায্য করে।

5. জনন গ্রন্থি: ছেলে এবং মেয়েদের শরীরে ভিন্ন ধরনের জনন গ্রন্থি থাকে। মেয়েদের শরীরে এই জনন গ্রন্থির নাম হলো ডিম্বাশয়। আর এখান থেকেই ক্ষরিত হয় ইস্ট্রোজেন, প্রজেস্টেরন। আর ছেলেদের শরীরে এই জনন গ্রন্থির নাম হলো শুক্রাশয়। এখান থেকে ক্ষরিত হয় টেস্টোস্টেরন নামক হরমোন। ইস্ট্রোজেন ও টেস্টোস্টেরন ছেলে ও মেয়েদের দেহে একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর সক্রিয় হয়। ফলে জননতন্ত্রে ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গের গঠনে নানা পরিবর্তন চোখে পড়ে।

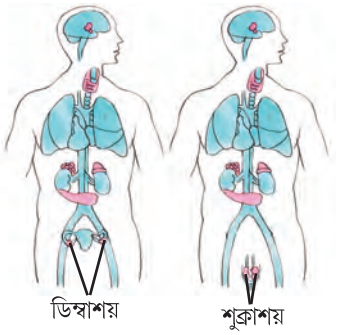

● **টেস্টোস্টেরন**: এই হরমোনের প্রভাবে বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেদের গোঁফ, দাড়ি বের হয়। ধীরে ধীরে হাড় ও পেশি শক্তিশালী হয়। পেশিবহুল চেহারা তৈরি হয়। গলার স্বরে ভাঙন ঘটে। গলার স্বর ভারী হয়।

● **ইস্ট্রোজেন**: স্ত্রীদেহে ক্ষরিত হয়। হাড় ও পেশির বৃদ্ধি ঘটিয়ে দেহের সম্পূর্ণ বৃদ্ধি ঘটায়। ত্বকের নীচে ফ্যাটজাতীয় পদার্থের সঞ্চয় ঘটিয়ে শরীরে বদল আনে। পুরুষের শরীরেও ইস্ট্রোজেন পাওয়া যায়। তবে স্ত্রীদেহের চেয়ে কম পরিমাণে। স্ত্রীদেহেও টেস্টোস্টেরন পাওয়া যায়। তবে পুরুষের চেয়ে কম পরিমাণে।

প্রথম পাতার গল্পগুলি আবার ভালো করে পড়ো। তারপর নীচের তালিকাটি পূরণ করো—

গল্প নম্বর	যে হরমোনের কম/ বেশি ক্ষরণের ফলে ঘটনাটি ঘটে

নীচের উপসর্গগুলি কোন কোন হরমোনের কারণে ঘটে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো—

উপসর্গ	দায়ী হরমোনের নাম
গ্রন্থি ফুলে ওঠে, চোখ দুটো যেন ঠেলে বাইরে চলে আসে। দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায়।	
দেহের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়। হাড় বেড়ে যায়।	
রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়। মূত্রের সঙ্গে গ্লুকোজ বেরোয়। বারেবারে খিদে পায়। শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ে।	
মুখমণ্ডল ফুলে গোলাকার হয়ে যায়। মুখের ত্বক খসখসে আর ফ্যাকাশে হয়। ক্ষত সারতেও সময় লাগে।	

বয়ঃসন্ধি

ফটিকের কথা -১

কলিকাতায় মামার বাড়ি পৌঁছাইয়া প্রথমত মামির সঙ্গে আলাপ হইল। মামি এই অনাবশ্যক পরিবার বৃদ্ধিতে মনে মনে যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার নিজের তিনটি ছেলে লইয়া তিনি নিজের নিয়মে ঘরকন্না পাতিয়া বসিয়া আছেন, ইহার মধ্যে সহসা একটি তেরো বৎসরের অপরিচিত অশিক্ষিত পাড়াগেঁয়ে ছেলে ছাড়িয়া দিলে কিরূপ একটা বিপ্লবের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। বিশ্বম্ভরের এত বয়েস হইল, তবু কিছুমাত্র যদি জ্ঞানকাণ্ড আছে।

বিশেষত, তেরো-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গসুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো-আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগলভতা। হঠাৎ কাপড়চোপড়ের পরিমাণ রক্ষা না করিয়া বেমানানরূপে বাড়িয়া উঠে; লোকে সেটা তাহার একটা কুশ্রী স্পর্ধাস্বরূপ জ্ঞান করে। তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা চলিয়া যায়, লোকে সেজন্য তাহাকে মনে মনে অপরাধ না দিয়া থাকিতে পারে না। শৈশব এবং যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়, কিন্তু এই সময়ের কোনো স্বাভাবিক অনিবার্য ত্রুটিও যেন অসহ্য বোধ হয়।

সেও সর্বদা মনে মনে বুঝিতে পারে, পৃথিবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না; এইজন্য আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বদা লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া থাকে। অথচ এই বয়সেই স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা মনে জন্মায়। এই সময়ে যদি সে কোনো সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে স্নেহ কিংবা সখ্য লাভ করিতে পারে, তবে তাহার নিকট আত্মবিক্রিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাকে স্নেহ করিতে কেহ সাহস করে না, কারণ সেটা সাধারণে প্রশ্রয় বলিয়া মনে করে। সুতরাং তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মতো হইয়া যায়।

অতএব, এমন অবস্থায় মাতৃভবন ছাড়া আর কোনো অপরিচিত স্থান বালকের পক্ষে নরক। চারিদিকের স্নেহশূন্য বিরাগ তাহাকে পদে পদে কাঁটার মতো বিঁধে। এই বয়সে সাধারণত নারীজাতিকে কোনো এক শ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকের দুর্লভ জীব বলিয়া মনে ধারণা হইতে আরম্ভ হয়, অতএব তাঁহাদের নিকট হইতে উপেক্ষা অত্যন্ত দুঃসহ বোধ হয়।

এটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছুটি' গল্পের একটি অংশ। গল্পে ফটিকের বয়স ছিল তেরো-চোদ্দ বছর । অর্থাৎ তোমাদেরই মতো। তারপর ছোটোবেলা থেকে বড়ো হবার পথে ফটিকের মতো তোমাদের কী কী পরিবর্তন হয়েছে তা দলে মিলে আলোচনা করে লেখো।

শরীরের পরিবর্তন	মনের পরিবর্তন

ফটিকের কথা -২

স্কুলে এতবড়ো নির্বোধ এবং অমনোযোগী বালক আর ছিল না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত। মাস্টার যখন মার আরম্ভ করিত তখন ভারাক্রান্ত গর্দভের মতো নীরবে সহ্য করিত। ছেলেদের যখন খেলিবার ছুটি হইত, তখন জানালার কাছে দাঁড়াইয়া দূরের বাড়িগুলোর ছাদ নিরীক্ষণ করিত; যখন সেই দ্বিপ্রহর রৌদ্রে কোনো একটা ছাদে দুটি-একটি ছেলেমেয়ে কিছু একটা খেলার ছলে ক্ষণেকের জন্য দেখা দিয়া যাইত, তখন তাহার চিত্ত অধীর হইয়া উঠিত।

একদিন অনেক প্রতিজ্ঞা করিয়া অনেক সাহসে মামাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, মামা, মার কাছে যাব। মামা বলিয়াছিলেন, স্কুলের ছুটি হোক। কার্তিক মাসে পূজার ছুটি, সে এখনও ঢের দেরি।

একদিন ফটিক তাহার স্কুলের বই হারাইয়া ফেলিল। একে তো সহজেই পড়া তৈরি হয় না, তাহার পর বই হারাইয়া একেবারে নাচার হইয়া পড়িল। মাস্টার প্রতিদিন তাহাকে অত্যন্ত মারধোর অপমান করিতে আরম্ভ করিলেন। স্কুলে তাহার এমন অবস্থা হইল যে, তাহার মামাতো ভাইরা তাহার সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করিত। ইহার কোনো অপমানে তাহারা অন্যান্য বালকের চেয়েও যেন বলপূর্বক বেশি করিয়া আমোদ প্রকাশ করিত।

অসহ্য বোধ হওয়াতে একদিন ফটিক তাহার মামির কাছে নিতান্ত অপরাধীর মতো গিয়া কহিল, বই হারিয়ে ফেলেছি।

মামি অধরের দুই প্রান্তে বিরক্তির রেখা অঙ্কিত করিয়া বলিলেন, বেশ করেছ, আমি তোমাকে মাসের মধ্যে পাঁচবার করে বই কিনে দিতে পারিনে।

ফটিক আর কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিল—সে যে পরের পয়সা নষ্ট করিতেছে, এই মনে করিয়া তাহার মায়ের উপর অত্যন্ত অভিমান উপস্থিত হইল; নিজের হীনতা এবং দৈন্য তাহাকে মাটির সহিত মিশাইয়া ফেলিল।

দেখছো তো ওই 'ছুটি' গল্পেই রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন ফটিক যা কিছু করুক না কেন সে মনে করত, সব ভুল করছে। নিজেকে ভীষণ হীন মনে করত। আচ্ছা, তোমাদের স্কুলে যদি ফটিকের মতো কোনো বন্ধুকে পেতে তাহলে তোমরা তাকে কীভাবে সাহায্য করতে?

ফটিকের যেমন খেলতে ভালো লাগত, ঘরের নানারকম কাজ করতে ভালো লাগত, সেরকম তোমাদেরও তো নানারকম কাজ করতে ভালো লাগে। তোমার কী কী কাজ করতে ভালো লাগে?

তোমার কোনো কাজের প্রশংসা পেলে কেমন লাগে?

কাজ করার পর কেউ নিন্দা করলে কী মনে হয়?

তোমার ছোটোবেলাতেও কী এরকম মনে হতো?

তোমার ছোটোবেলা থেকে এখন পর্যন্ত তোমার মধ্যে কী কী পরিবর্তন লক্ষ করেছ?

শরীরের দ্রুত পরিবর্তন

শৈশব থেকে যৌবনের সময়কালকে বলে কৈশোর। কৈশোরকে বয়ঃসন্ধিও বলে। WHO (World Health Organization) বয়ঃসন্ধিকাল হিসাবে 10 থেকে 19 বছর পর্যন্ত বয়সকে নির্ধারিত করেছে। এই সময় শরীর ও মনের দ্রুত পরিবর্তন হয়। তুমি নিশ্চয়ই সেটা লক্ষ করেছ তোমার মধ্যে। আমাদের শরীরে বেশ কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যেমন আমাদের উচ্চতা, ওজন, এমনকি শরীরের গঠনেরও পরিবর্তন ঘটে। মানুষের মধ্যেই এই পরিবর্তন ঘটে। তবে বিশেষ কিছু অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি এবং হরমোন এই পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে নীচের কাজটি করো।

1. কোন কোন হরমোন বয়ঃসন্ধিকালীন সময়ে শরীরে দ্রুত পরিবর্তনে সাহায্য করে?
2. কোন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে এই হরমোনগুলো ক্ষরিত হয়?

বয়ঃসন্ধিতে মনের পরিবর্তন

বয়ঃসন্ধি পর্বে ছেলেমেয়েদের শরীরে যেমন নানা পরিবর্তন দেখা যায়, তেমনই মনে এবং পারস্পরিক সম্পর্কেও পরিবর্তন দেখা যায়। শরীরের পরিবর্তন চোখে দেখা যায়। কিন্তু মনের?

রাজু আর শুভ দুজনেই ভালো বন্ধু। রাজুর বাবা অন্য জায়গায় বদলি হয়ে গিয়েছিলেন। তাই রাজুকেও যেতে হয়েছিল। অনেকদিন পর সেই রাজুর সঙ্গে দেখা। শুভ দেখল রাজু আগের মতো নেই। শুভ জিজ্ঞাসা করল— স্কুল কেমন চলছে। রাজু বলল- স্কুলের নাটকের দলে একটা গুরুত্বপূর্ণ রোল পেয়েছিলাম। মনে হয় আমি রোগা আর গলার স্বর ভেঙে গেছে বলে দু-দিন আগে আমাকে বাদ দিয়ে দিয়েছে।

শুভ নিজের অবস্থার কথাটা একবার ভাবল। ওর উচ্চতা নিয়ে দুশ্চিন্তাটা আবার ঘুরে ফিরে এল। শুভ জানে ওর ক্লাসে ওর চেয়ে সবাই বেশ লম্বা আর রোগা, তাহলে ও কি স্বাভাবিক? ওর কি ওজন বাড়ছে?

টুম্পা আর রুমা খুব ভালো বন্ধু। অনেকদিন পর দেখা। টুম্পাকে বেশ মনমরা দেখাচ্ছিল। রুমা জিজ্ঞাসা করল- কীরে, ভালো আছিস তো? টুম্পা বলল- নারে, মনটা ভালো নেই। মুখে খুব ব্রণ বেরিয়েছে। কি বিচ্ছিরি লাগছে না আর সবার থেকে?

রুমা বলল— টুম্পা একদম মন খারাপ করিস না। আমাদের বয়সে ব্রণ অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। একটা বয়সের পর থেকে আমাদের মুখমণ্ডলের ত্বকের লোমকূপগুলোতে বেশি পরিমাণ সিবাম জমে গেলে ব্রণ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই সময় আমরা যদি শরীরের ঠিকঠাক যত্ন নিই তাহলে ব্রণ হলেও তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবে। তাই, তুই মন খারাপ করিস না। আমরা সবাই তো আর একরকম নই। আমরা প্রত্যেকেই স্বাভাবিক ও সুন্দর।

একটা খরগোশের গল্প

এক খরগোশের একটা কান ঝোলা ছিল। তাই দেখে অন্য খরগোশেরা ওকে রাগাত। এতে সে রেগে গিয়ে কান খাড়া করার জন্য নানা কসরত করতে লাগল। পিছনের পা গাছের ডালে আটকে ঝুলতে লাগল। যাতে তার ঝোলা কান সোজা হয়ে যায়। এমন সময় একটা বিড়াল গাছের তলা দিয়ে যাচ্ছিল। খরগোশের ওই অবস্থা দেখে ব্যাপারটা সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করল। বিড়াল বলল - তাতে কী হয়েছে? তোমার কান ছোটো বলে তুমি অন্য খরগোশদের থেকে ছোটো হয়ে গেছ? ওরা যদি খাড়া কান নিয়ে স্বাভাবিক হয়, তুমি ঝোলা কান নিয়ে স্বাভাবিক। তোমার তো তাতে কোনো অসুবিধা নেই। খরগোশ নিজের ভুল বুঝতে পারল। সে দৌড়ে গিয়ে অন্য খরগোশদের একথা বলল। অন্যরাও তখন ওকে নিয়ে হাসিঠাট্টা বন্ধ করল।

আগের পাতার গল্পদুটো ভালো করে পড়ো। তারপর বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে নীচের কাজটা করো—

1. কোন কোন গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত কোন কোন হরমোন রাজু, শুভ ও টুম্পার এই অবস্থার জন্য দায়ী?
2. রাজু আর শুভ তাদের অবস্থার উন্নতি কীভাবে ঘটাতে পারবে বলে মনে করো?
3. টুম্পা তার অবস্থার উন্নতির জন্য কী করতে পারে?
4. তোমরা বন্ধুদের কোন গুণটাকে বড়ো করে দেখতে চাও? বন্ধুত্বে চেহারার গড়নের কি কোনো গুরুত্ব আছে?

বয়ঃসন্ধিতে আচরণের সমস্যা

রতন রোজ স্কুলে যাওয়ার নাম করে বেরোয়। কিন্তু স্কুলে আসে না, প্রায় দিনই কামাই। যদিও বা কোনোদিন আসে, সেদিন তো মহা বিপত্তি। বন্ধুদের সঙ্গে মারপিট, বন্ধুদের বই লুকিয়ে ফেলা, মুখে মুখে তর্ক করা এসব অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। কারণে অকারণে মিথ্যা বলাটাও কোনো ব্যাপার নয়। বাড়িতেও এক অবস্থা, বাবা- মার সঙ্গে তর্ক করে। রেগে গিয়ে একবার একটা কাচের গ্লাস ভেঙে দিয়েছিল।

মহুয়া যখনই হাত ধুতে যায় বারবার করে হাত ধোয়। ওর মনে হয় হাতটা বোধহয় ঠিকমতো পরিষ্কার হলো না। তাই সে আবার ধোয়। অঙ্ক ক্লাসে তো লাইন টানতে গিয়ে বারবার করে মুছতে থাকে। আর দেখে লাইনটা সোজা হলো কিনা। একদিন তো ঘরে তালা লাগাতে গিয়ে ঘেমে অস্থির। বারেবারে তালায় চাবি লাগিয়ে আবার খুলে ফেলছে। ভাবছে বোধহয় তালাটা লাগেনি।

সুমন পড়াশোনায় ভালোই। বেশ শান্ত প্রকৃতির ছেলে। কম কথা বলে। পাড়াতে অন্য বন্ধুদের সঙ্গে খুব একটা মিশত না। একা একা থাকতে বেশি ভালোবাসত। ইদানীং দেখা যাচ্ছে ও নিজের মনে কীসব যেন বিড়বিড় করে বকছে। একদিন তো ওর ক্লাসের এক সহপাঠীকে দুম করে মেরেই বসল ও। ভেবেছিল বন্ধুটি নাকি ওর ক্ষতি করবে। ও ভাবল ঠিকই করেছে মারপিট করে। ক্লাসের বন্ধুদের সন্দেহ করতে শুরু করল। খালি নিজের মনে বিড়বিড় করে। মনে হয় যেন কারোর সঙ্গে কথা বলছে। চুল উসকোখুসকো, স্নান-খাওয়াটাও ঠিকমতো করত না। শেষে স্কুলে আসাও বন্ধ করে দিল।

কারোর কারোর আচরণ অন্যদের চোখে সমস্যা হিসাবে ধরা পড়ে। কিছু আচরণ অন্যের ক্ষতিও ডেকে আনে। কিন্তু তার জন্যে তাদের মনে অনুতাপ হয় না। নিজেও কোনো কষ্ট অনুভব করে না। ক্ষতিকর পরিণতির কথা জানা থাকলেও একই আচরণ বারবার করতে থাকে।

এবিষয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করো। তারপর দলে মিলে নীচের কাজটা করো।

তেরো-চোদ্দ বছর বয়সে কী কী ধরনের আচরণের সমস্যা দেখা যায়?

1. একটুতেই রেগে যাওয়া
2. অকারণে কেঁদে ফেলা
3.
4.
5.
6.
7.

তোমার মতে, এই ধরনের সমস্যা থাকলে কী করা দরকার ?

ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ

আলি ফুটবল খেলার ফাইনালের আগে প্রচুর বাজি কিনেছে। তার মধ্যে শব্দবাজিও আছে। যদিও এগুলো ও লুকিয়ে কিনেছে। দল জিতে যাওয়ায় বাজিগুলো পকেটে পুরে খুব নাচছিল আলি। মাঝে মধ্যে একটা দুটো বের করে ফাটাচ্ছিল। কিছু বাজি ফাটছিল না। সেগুলো তুলে আবার ফাটাচ্ছিল। হয়তো ওই পোড়া বাজিগুলোর কোনোটাতে আগুন ছিল। একটা বাজি হাতের মধ্যেই গেল ফেটে। আলির ডান হাতটা বেশ খানিকটা পুড়ে গিয়েছিল।

একদিন বিকেলে খেলার সময় পাড়ার মন্টুদা এসে বলল -যা তো বাবলু এক বান্ডিল বিড়ি নিয়ে আয়। খেলা ছেড়ে বাবলু বিড়ি আনতে ছুটল, পাছে মন্টুদা রাগ করে। একদিন মন্টুদা ওকে একটা বিড়ি খেতে বলল। তারপর থেকে বাবলু আর বিড়ি ছাড়তে পারেনি। এখন বাবলু রাতে ঘুমোতে পারে না। খুব শ্বাসকষ্ট হয় ওর। ডাক্তার বলেছেন বাবলুর ফুসফুস অকেজো হয়ে গেছে।

1. ওপরের দুটো গল্প পড়ে তোমাদের কেমন লাগল?
2. আলির ডান হাতটা পুড়ে গিয়েছিল। এর জন্য দায়ী কে?
3. আলির কী করা উচিত ছিল?
4. বাবলুর এহেন অবস্থার জন্য দায়ী কে?
5. বাবলুর কী করা উচিত ছিল?

'না' বলা

স্কুলে বাৎসরিক অনুষ্ঠানের দিন। খাওয়াদাওয়া শেষ করে সাবিনা, মিতা আর রতন বাড়ি ফিরছিল। মিতার আর রতনের বাড়ি আগে পড়ে। সাবিনাকে বেশ খানিকটা পথ হেঁটে আসতে হচ্ছিল। এমন সময় ভজাদার সঙ্গে দেখা। ওদের বাড়ির পাশেই থাকে। ভজাদা বলল সাবিনা, শহরে কাজ করবি? তোদের পরিবারের যা অবস্থা। শহরে বড়ো ডাক্তারের বাড়ি। পরিবারটা খুব ভালো। অনেক টাকা দেবে। সাবিনা বলল— দেখো ভজাদা, এখন আমার কাজ করতে ইচ্ছে করছে না। একটু পড়াশোনা করতে চাই। তাছাড়া মা অসুস্থ। মা চায় আমি পড়াশোনা করি। তাছাড়া আমি চলে গেলে কে আর ওদের কথা ভাববে বলোতো? তাই এখন নয়। একটু না হয় কষ্ট করেই চালিয়ে নেব।

অনেকসময় অনিচ্ছা ও অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও অনেক অনুরোধ বা আদেশ মেনে নিতে হয়। বন্ধু বা কাউকে 'না' বললে সম্পর্ক নষ্ট হবার ভয় থাকে। কিংবা পরে বন্ধুর বা কারোর থেকে সাহায্য না পাবার আশঙ্কাও থাকে। তবে এটা জানবে ঠিকমতো 'না' বলতে পারলে নানারকম বিপদ থেকেও নিজেকে রক্ষা করা যায়।

ওপরের গল্পটি পড়ো। তারপর বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে নীচের কাজটি করো ।

1. সাবিনা যদি 'হ্যাঁ' বলতো তাহলে কী হতো বলে মনে করো?
2. সাবিনা ভজাদাকে যেভাবে বলল তাতে কি ওর প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেল বলে মনে করো?
3. তুমি তোমার জীবনে কখনও 'না' বলে ভালো করেছ বলে মনে করো?
4. কখন 'না' বলা দরকার বলে মনে করো?

আবেগ নিয়ন্ত্রণ

বাংলা ভাষায় আবেগ ও অনুভূতি শব্দ দুটি প্রায় একইভাবে ব্যবহার করা হয়। ইংরাজিতে আবেগ হলো Emotion আর Feeling হলো অনুভূতি।

ভালো গান শুনলে আনন্দ হয়। নিজের নিন্দা শুনলে রাগ হয়, দুঃখ হয়। কারোর দুঃসংবাদে চোখে জল আসে। এসবই স্বাভাবিক। কিন্তু বেশি রাগ, দুঃখ কিংবা আনন্দের অনিয়ন্ত্রিত বহিঃপ্রকাশে শরীরের ও মনের ক্ষতি হতে পারে। আবেগের ওপর নিয়ন্ত্রণ রেখে চলা খুবই জরুরি। অনুভূতিগুলোকে বুঝে নিয়ে আবেগের যথার্থ প্রকাশের জন্য দরকার জীবনকুশলতা চর্চা।

যেমন রাগ হলো একধারে আবেগ আবার অনুভূতিও। আমরা যখন রেগে যাই তখন আমাদের শরীরে বিশেষ বিশেষ জৈব-রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে শরীরে তার ছাপ পড়ে।
আবার এই সময় আমাদের আচরণেরও পরিবর্তন ঘটে।
আচ্ছা বলো তো আমরা কি আমাদের আবেগ অনুভূতিগুলো চিনি? তাহলে আমরা রেগে যাই কেন? আবার অনেক সময় আবেগ অনুভূতিগুলো মনের ভিতর চেপে রাখি। প্রেসার কুকারে রান্নার সময় কুকারের মধ্যে বাষ্পের চাপ বাড়লে জোরে হুইসল বাজে আর সেই বাষ্প বেরিয়ে যায়। আমরা যদি সব অনুভূতিগুলোকে মনের ভেতর জমিয়ে রাখি, তাহলে তো ঘোর বিপদ। তাই না?

তাই আমাদের আবেগ অনুভূতিগুলোকে চেনা খুব জরুরি। প্রকাশ করতে শেখাও জরুরি। না হলে আমাদের অবস্থা হবে ঠিক প্রেসার কুকারের মতো।

বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে তোমাদের আবেগ/ অনুভূতির তালিকা তৈরি করো। তারপর সেগুলোকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে সে বিষয়ে দু-চার কথা লেখো :

আবেগ/ অনুভূতি			
1. রাগ	4. হতাশা	7. তৃপ্তি	10.
2. ভয়	5. ক্ষোভ	8. অভিমান	11.
3. কান্না	6. আনন্দ	9. দুঃখ	12.

অন্ধকারে একা থাকলে রমার বুক ধড়ফড় করে। হাত পায়ের পাতা ঘেমে যায়। হাত পা কাঁপে। পেশিতে টান ধরে, মাথা ব্যথা করে, পিঠে যন্ত্রণা হয়। গা গুলিয়ে ওঠে ।

গল্পটা পড়ো। বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে নীচের কাজটা করো।

1. এখানে রমার কোন কোন অনুভূতির প্রকাশ পেয়েছে?
2. এরকম পরিস্থিতিতে কী করা দরকার বলে মনে করো ?
3. গত একমাসে বিভিন্ন ঘটনায় তোমার কী কী অনুভূতি হয়েছিল তা লেখো।
4. তার মধ্যে কোন কোন অনুভূতিগুলো তুমি সহজে চিনতে পেরেছ বলে মনে করো?
5. তোমার কাছে কোন অনুভূতিগুলো বেশ কষ্টকর ?
6. তুমি অঙ্গভঙ্গি করে কোন কোন অনুভূতির প্রকাশ করতে পারো?

শারীরিক সমস্যা	অনুভূতি
1. বুক ধড়ফড়	ভয়
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

আত্ম-উপলব্ধি

নীচের লেখাটা মন দিয়ে পড়ো। তোমার কাছে কোন লাইনটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ তার তলায় দাগ দাও।

আমি একজন ভালো মানুষ হবার জন্যই জন্ম নিয়েছি। আমি সবার থেকে আলাদা। আমি নিজেকে খুব ভালোবাসি। আমি তোমাদের সবাইকেও ভালোবাসি। আমার মধ্যে দক্ষতা আছে। বিশেষ গুণও আছে জীবনে কিছু করার। অন্যদের মতো আমিও জীবনে দারুণ কিছু করে উঠতে পারি।

আত্মসচেতনতার জন্য নীচের কাজটি করো। তবে কাজটি করার সময় নিজের প্রতি অবশ্যই যত্নবান হবে।

1. আমি আমার বাবা-মায়ের ভালো সন্তান কারণ_____
2. আমি একজন ভালো বন্ধু কারণ_____
3. আমি আমার ক্লাসে একজন ভালো ছাত্র/ছাত্রী কারণ_____
4. আমার বিশেষ গুণ হলো_____
5. আমার যে গুণটা সবাই পছন্দ করে সেটি হলো_____
6. যে গুণটা আমার পছন্দ সেটি হলো _____

বয়ঃসন্ধি ও জীবনকুশলতা শিক্ষা

শৈশব থেকে শুরু করে শেষ বয়স পর্যন্ত মানুষের বিকাশপর্বে বয়ঃসন্ধিকাল এক গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। এই পর্বের বিশেষত্বই হলো শরীর ও মনের দ্রুত পরিবর্তনশীলতা। দ্রুত বদলে যাওয়া পরিবেশের সঙ্গে তৈরি বয়ঃসন্ধিকালের টানাপোড়েনের মুখোমুখি হতে হয় সকলকেই। কোনো কোনো সময় আমরা দিশেহারা হয়ে যাই। তাই নিজের এবং বাইরের পরিবেশের নানা অনিশ্চয়তার ও চাপের মুখোমুখি হবার কুশলতা অর্জন করতে হবে নিজেকেই। তাই নিজেকে চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে যথার্থ ভালো মানুষ হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য দরকার জীবনকুশলতা শিক্ষা। জীবনকুশলতা অনেকরকমের হয়। তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পরিকল্পিত দশটি কেন্দ্রীয় (Generic) জীবনকুশলতা (Life skills) শিক্ষার নিয়মিত চর্চা জীবনের নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবার সাহস জোগায়। জীবনকুশলতা চর্চার বিভিন্ন দিকগুলি হলো —

> জীবনকুশলতা হলো এক বিশেষ আচরণ যা প্রতিটি মানুষকে তার নানা চাহিদা ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করে মোকাবিলা করার সাহস যোগায়।

1. আত্মসচেতনতা — নিজের ভালোলাগা, খারাপলাগা থেকে শুরু করে, আবেগ অনুভূতিগুলিকে চিনে তার নিয়ন্ত্রণে পারদর্শী হয়ে ওঠা।

2. বিশ্লেষণধর্মী চিন্তা — জীবনের নানা সমস্যার মুখোমুখি হয়ে চিন্তাভাবনা করে সমস্যার মোকাবিলা করা।

3. সিদ্ধান্ত নেওয়া — এলোমেলো চিন্তাগুলোকে সুবিন্যস্ত করে ঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো।

4. সমস্যা দূর করা — সমস্যাটাকে চেনা। তার সমাধানের নানা উপায়গুলোকে বিচার করা। তারপর কার্যকরী সমাধান বেছে নিয়ে প্রয়োগ করা।

5. সৃজনশীল চিন্তা — গান, নাচ, সাঁতার, ছবি আঁকা, খেলাধূলা সহ নানা সৃজনশীল কাজে অংশগ্রহণ করা।

6. পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন — অন্যের কথা ধৈর্য ধরে শোনার অভ্যাস তৈরি করা। কী বলব যেমন গুরুত্বপূর্ণ, কীভাবে বলব সেটাও অনুশীলন করা।

7. পারস্পরিক সম্পর্ক — পরিবারের, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু ও অন্যান্য মানুষজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করা।

8. সমানুভূতি — অন্যের সমস্যার সঙ্গে নিজেকে শামিল করে তার অনুভূতিগুলোকে বোঝা ও প্রকাশ করা।

9. মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ — মনের ওপর তৈরি হওয়া চাপগুলোকে চিনে কীভাবে সেগুলোকে কমানো যায় তার অনুশীলন করা।

10. আবেগ নিয়ন্ত্রণ — নিজের বিভিন্ন অনুভূতিগুলো সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা এবং যথাযথভাবে তা প্রকাশ করা ।

বন

নীচের কোন শব্দটি উদ্ভিদসমষ্টিকে বোঝায়?

- সমুদ্র
- পাহাড়
- বন

বন হলো অনেকটা অঞ্চল জুড়ে জন্মানো উদ্ভিদসমষ্টি। পৃথিবীর স্থলভাগের এক-তৃতীয়াংশই বনে ঢাকা। ভারতের স্থলভাগের 21 শতাংশ স্থান হলো বন। কিন্তু পৃথিবীর বনভূমির পরিমাণ উদ্‌বেগজনক হারে কমতে শুরু করেছে। বন বাঁচানোর সচেতনতা বাড়ানোর জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ 2011 সালকে 'আন্তর্জাতিক বনবর্ষ' বলে ঘোষণা করেছিলেন।

এবার বন বিষয়ে নীচের সারণিটি পূরণ করো। প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

বন থেকে মানুষ কী কী উপকার পায়	কীভাবে বন ওই ভূমিকা পালন করে	আবহাওয়ার কোন কোন ভৌত উপাদানের ওপর বনের গঠন নির্ভর করে
1. আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ		• সূর্যালোক
2. পৃথিবীপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ও জলচক্র নিয়ন্ত্রণ		• তাপমাত্রা
3. বন্য জীবজন্তুর আশ্রয়স্থল		• বায়ুপ্রবাহ
4. মাটির ক্ষয় ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ		• বৃষ্টিপাত
5. আসবাবপত্র, বিভিন্ন শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠ উৎপাদন		• বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ
6. মাটির নীচের জলের স্তর নিয়ন্ত্রণ		
7. জ্বালানির উৎস		
8. বিভিন্ন মারণরোগের ওষুধের উৎস		
9.		

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে বনের বিভিন্ন গাছ থেকে ব্যবহৃত 5000 -এর বেশি জিনিস পাওয়া যায়। কোনো

বৃক্ষজাতীয় গাছ যদি প্রায় 50 বছর বেঁচে থাকে তবে সে তার জীবদ্দশায় 2700 কেজি অক্সিজেন বাতাসে ছাড়ে।

তুমি বিদ্যালয়ে, বাড়িতে বা খেলার মাঠে বা যাতায়াতের পথে যেসব জিনিস ব্যবহার করো বা করতে দেখো তার একটা তালিকা দেওয়া হলো। এদের নিয়ে নীচের সারণিটি পূরণ করো:

ব্যবহৃত জিনিসের নাম	ওই জিনিস তৈরিতে ব্যবহৃত বনের উপাদানের নাম	উৎস
1. পেনসিল 2. খেলার ব্যাট 3. ওষুধ 4. পোশাক 5. যানবাহন 6. মাদুর 7. ছাউনি 8. জ্বালানি		

আবহাওয়ার বিভিন্ন শর্তের পার্থক্যভেদে নানা জায়গায় নানা ধরনের বনের অস্তিত্ব দেখা যায়। এই ধরনের বনে কী কী উদ্ভিদ ও প্রাণী থাকে বা থাকতে পারে তার নাম নীচের খোপে লেখো।

- সুচের মতো পাতাযুক্ত গাছের বন (পাইন, ওক, কালো ভালুক, চিতাবাঘ .....)
- পাতা ঝরা গাছের বন (সেগুন, অর্জুন, আমলকী, বাঘ, হাতি, বাইসন.....)
- চিরসবুজ গাছের বন (জাম, বট, আম, বাঘ, হরিণ, ময়ূর.....)
- কাঁটাওয়ালা ঝোপঝাড় (বাবুল, ক্যাকটাস, কৃষ্ণসার হরিণ, চিংকারা, শেয়াল.....)
- ঘাসের বন (ঘাস, হোগলা, শন, পুরুণ্ডি, গন্ডার , হরিণ, জেব্রা.....)
- শ্বাসমূলযুক্ত গাছের বাদাবন (গরান, গেঁওয়া, বাইন, বাঘ, খাঁড়ির কুমির, ভোঁদড়.....)

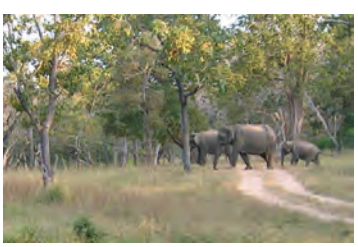
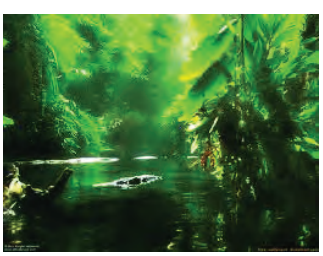

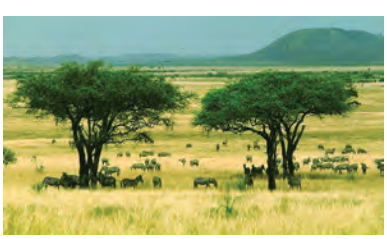

বনে যে সব প্রাণী বা উদ্ভিদ থাকে তাদের কয়েকটি ছবি ও নামের একটি তালিকা নীচে দেওয়া হলো।

গিরগিটি	শিরীষ	সাপ	আম	হনুমান	হরিণ
শেয়াল	কুসুম	পেঁচা	জাম	হাতি	মাছ
ময়ূর	মেহগনি	ভালুক	বট	বাঁশ	কাঁকড়া
ঈগল	ওক	কাঠবিড়ালি	আমলকী	চালতা	কচ্ছপ
পোকা	দেবদারু	চিতাবাঘ	গরান	গম্ভার	বাঘ
কেঁচো	পাইন	কাঠঠোকরা	ঘাস	পিঁপড়ে	বেজি
বাদুড়	মৌমাছি	উইপোকা	প্যাংগোলিন	সিংহ	ভোঁদড়

ওপরের জীবদের তালিকা থেকে ন্যূনতম তিনটি জীব নিয়ে একটি করে খাদ্যশৃঙ্খল তৈরি করো। খাদ্যশৃঙ্খলে কারা উৎপাদক, তৃণভোজী বা মাংসাশী তা উল্লেখ করো।

একটা আদর্শ বনের গঠন কেমন হতে পারে?

বড়ো বৃক্ষ জাতীয় গাছের বনে গেলে দেখা যায় যেসব ধরনের গাছের বৃদ্ধি একরকম নয় বা সব গাছের দৈর্ঘ্য সমান নয়। ফলে বনে নানা স্তরের সৃষ্টি হয় —

i) একদম ওপরের স্তরকে বলা হয় ছাদ (canopy)। গাছের মাথারা এক হয়ে এই স্তর গঠন করে। গাছের চূড়াগুলো এক হয়ে যে ছাদ গঠন করে তা সূর্যের আলোকে বনের গভীরে ঢুকতে বাধা দেয়। বর্ষাবনে এটি সাধারণত 30 মিটার-এর বেশি উচ্চতায় তৈরি হয়। কখনো-কখনো 90 মিটার উচ্চতায় পৌঁছোয়। এবার বলার চেষ্টা করো বনের এই স্তর কেন সবচেয়ে বেশি খাদ্য তৈরি করে।

ii) ছাদের নীচের স্তরে দেখা যায় এমন গাছ যারা ক্রমশ লম্বা হয়ে ক্যানোপি স্পর্শ করার চেষ্টা করে। তাই এই স্তরের গাছগুলো লম্বায় অপেক্ষাকৃত ছোটো হয়। এই স্তরে বাতাসের বেগ তুলনামূলকভাবে কম এবং আলো কম ; এখানে কম উচ্চতার বৃক্ষ, গুল্ম এবং নরম কাণ্ডের বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ বেশি দেখা যায়। বেশি বয়স্ক গাছ বা চারাগাছের গুল্ম আধিক্য চোখে পড়ে।

iii) তৃতীয় স্তরে নতুন জন্মানো গাছ, পরিণত গুল্ম এবং নানাধরনের ঝোপওয়ালা গাছ দেখা যায়। বনের ছোটো ছোটো প্রাণীদের খাদ্য, বাসস্থান ও আত্মরক্ষার জন্য এই স্তর ব্যবহৃত হয়।

iv) বনের মেঝের ঠিক ওপরে অল্প উচ্চতার যে ধরনের গাছ থাকে তারা মূলত বীরুৎজাতীয়, এখানে বীজ থেকে বেরোনো সদ্যোজাত গাছের চারা, ফার্ন, ঘাস এবং নানা আগাছা দেখা যায়। এরা বনের মেঝেকে ঢেকে রাখে। ইঁদুর, পোকামাকড়, সাপ, কচ্ছপ, ব্যাং ও নানা পাখি এই স্তরে বাস করে। হরিণরা তাদের বাচ্চাদের আর শিকারি প্রাণীরা শিকার ধরার জন্য নিজেদের এই স্তরে লুকিয়ে রাখে। বনের এই স্তরে সবসময়ই কোনো না কোনো ঘটনা ঘটে চলে।

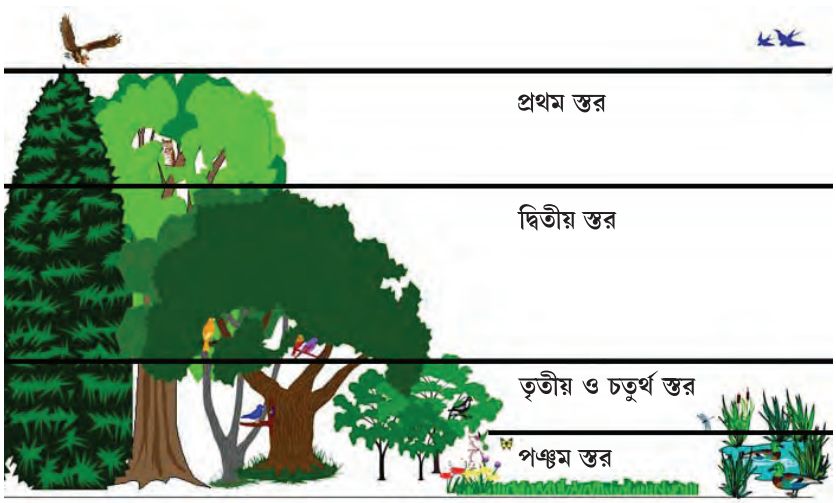

v) বনের গঠনের শেষস্তর হলো বনের মেঝে। এটি সাধারণত মরা পাতা, পড়ে থাকা ফুলের পাপড়ি, পচা ফল, গাছের ছোটো ডাল, পাখির পালক, প্রাণীর লোম ও মল, পচাগলা বা মরে যাওয়া জীব দেহের নানা পদার্থ দিয়ে তৈরি হয়। মাটির সাথে মিশে এই সব পদার্থ হিউমাস তৈরি করে। এই ধরনের পদার্থ থেকে বনের গাছের বৃদ্ধি সহায়ক নানা উপাদান খনিজ মৌল, অ্যামিনো অ্যাসিড বের হয়। কেঁচো, আরশোলা, কাঁকড়াবিছে, তেঁতুলবিছে, শামুকসহ নানা আণুবীক্ষণিক জীব এখানে বাস করে।

পৃথিবীতে কোথায় কেমন ধরনের বন দেখা যায়?

সারা পৃথিবীর সব জায়গায় বনের পরিমাণ কিন্তু সমান নয়। সারা পৃথিবীর স্থলভাগের এক-তৃতীয়াংশ বনে ঢাকা। এর 95% প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠা। আর বাকি 5% মানুষের তৈরি। এর মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকায় বনের পরিমাণ প্রায় 23% আর ওশিয়ানিয়ায় মাত্র 5%। তোমরা শুনলে হয়তো অবাক হবে যে পৃথিবীর দশটা দেশে কোনো বন নেই। আর অন্যান্য 64টি দেশে বনের পরিমাণ সে দেশগুলোর স্থলভাগের দশ শতাংশেরও কম।

টুকরো কথা

তোমরা তো আমাজনের বর্ষাবনের কথা জেনেছ। লম্বা লম্বা গাছ, উষ্ণ আবহাওয়া আর প্রচুর বৃষ্টি এ ধরনের বনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। নিরক্ষরেখা বরাবর (ওপরে ও নীচে 10^0-এর মধ্যে) এধরনের বন দেখা যায়। এই বনে গাছগুলো এত ঘন হয়ে জন্মায় যে বনের মাথায় আসা বৃষ্টির প্রথম ফোঁটা মাটিতে আসতে প্রায় 10 মিনিট সময় লাগে। এক হেক্টর এরকম বর্ষাবনে প্রায় 40-এর বেশি প্রজাতির গাছ থাকে। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত জানা 2,50,000 উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে প্রায় 1,70,000 প্রজাতির গাছ এই বর্ষাবনগুলিতে পাওয়া যায়। এই বর্ষাবনে আফ্রিকান হাতির মতো বড়ো স্তন্যপায়ী থেকে মাউস-লেমুরের মতো ছোটো স্তন্যপায়ীর দেখা মেলে। অ্যাকোয়ারিয়ামে যে রঙিন মাছদের তুমি দেখো তাদের অধিকাংশই দক্ষিণ আমেরিকা বা এশিয়ার বর্ষাবনের জলে জন্মায়। পেরুর বর্ষাবনের একটা গাছেই 50 টা প্রজাতির পিঁপড়ের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই বর্ষাবন থেকেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের অধিকাংশ অক্সিজেনের উৎপত্তি। বাতাসে যে জলীয় বাষ্প মুক্ত করে তাই আবার বৃষ্টি হয়ে ফিরে আসে। আবহাওয়া ঠিক রাখতে এর জুড়ি মেলা ভার। বর্ষাবন হলো স্পঞ্জের মতো। জলীয় বাষ্প শুষে নিয়ে ধীরে ধীরে ছাড়তে থাকে। ফলে নদীতে জলপ্রবাহ কখনই এমন হয় না যাতে বন্যার সম্ভাবনা দেখা দেয়। আর এই বর্ষাবনেই সন্ধান মেলে জীবন বাঁচানো নানা ওষুধের। তাপির, গরিলা, শিম্পাঞ্জি, ওকাপি, ওরাংওটাং, সুমাত্রার গন্ডার বা বাঘের মতো বিলুপ্তপ্রায় জীবজন্তুরা এই বর্ষাবনেই বেঁচে আছে। কিন্তু একেই আমরা ক্রমাগত ধ্বংস করে চলেছি। প্রতি সেকেন্ডে প্রায় দেড় একর বর্ষাবন কাটা পড়ে। এরকম হারে বনধ্বংস চলতে থাকলে আগামী 100 বছরের মধ্যে পৃথিবী থেকে প্রায় সব বর্ষাবন হারিয়ে যাবে।

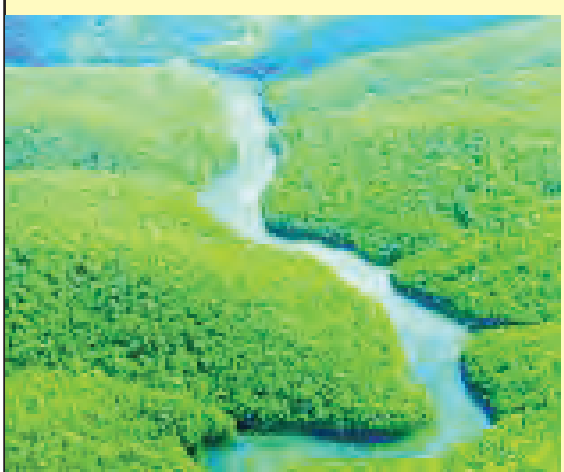

বনের আগুন ও পরিবেশের ক্ষতি

বনে আগুন লাগার ঘটনা ঘটলে তা সাধারণত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। অধিকাংশ সময় প্রথমে আগুন লাগলে তা মানুষের নজরে আসে না। নানা কারণে বনে আগুন লাগে—

1.অগ্ন্যুৎপাতের সময় বনের গাছের কোনো শুকনো গাছের জ্বলন্ত লাভার সংস্পর্শে আসা।

2. বজ্রপাত।

3. বায়ুপ্রবাহ তীব্র হলে পাশাপাশি দুলতে থাকা বাঁশগাছে ঘষা লাগা ।

4.গড়িয়ে পড়া পাথরের ধাক্কায় তৈরি হওয়া আগুনের শিখার সংস্পর্শে বনের মেঝেতে পড়ে থাকা শুকনো পাতা এলে।

5. মানুষের নানাবিধ কাজ — বনের ভিতর ধূমপান, রান্না করা ইত্যাদি ।

বনে আগুন লাগলে কী কী ক্ষতি হয়

1. বন ছাড়া মানুষের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আগুন লেগে বন নষ্ট হলে বাতাসে CO_2-এর ঘনত্ব বাড়তে থাকে আর O_2-এর ঘনত্ব কমতে থাকে। ফলে পরিবেশের তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়তে থাকে।
2. বনের মাটি আর গাছের পাতা বৃষ্টিপাতের প্রায় 50% শুষে নেয়। বনে আগুন লাগার পর মাটি ও গাছের পাতার সেই ক্ষমতা আর থাকে না। ফলে বন্যার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।
3. বড়ো গাছগুলো পুড়ে যাওয়ার ফলে প্রবল বৃষ্টিপাতের সময় মাটির ক্ষয় বেড়ে যায়। দাবানলের পর প্রথম বৃষ্টিপাতের সময় জলে ছাই মিলে যাওয়ায় জলদূষণ হতে পাড়ে।
4. বনে আগুন লাগলে বহু প্রাণীর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। আর বাকিরা আশ্রয় হারিয়ে ফেলে। কোন ধরনের প্রাণীদের ক্ষেত্রে এধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি থাকে?

টুকরো কথা

1910 সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এক বিধ্বংসী দাবানলের ফলে প্রায় তিন মিলিয়ন একর বন নষ্ট হয়। দাবানলটি প্রায় দু-দিন স্থায়ী হয়েছিল। এই দাবানল নেভানোর কাজে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তার মধ্যে 87 জন এই দাবানলে মারা যান। অতি সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়াতেও এরকম দাবানলের ঘটনায় প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। পৃথিবীজুড়ে ঘটে চলা এরকম বনধ্বংসের ঘটনাগুলি জানার চেষ্টা করো এবং পরিবেশের ওপর তার কী প্রভাব পড়ছে তা নিয়ে নিজেরা আলোচনা করে একটি রিপোর্ট তৈরি করো।

বন কেটে ফেলা ও পরিবেশের ক্ষতি

মানুষ তার নানা প্রয়োজনে, (জমির অত্যধিক চাহিদা, গৃহনির্মাণ ইত্যাদি) কোনো জমিতে দীর্ঘদিন ধরে বেড়ে ওঠা গাছপালার অপসারণ বা কেটেই চলেছে। সারা পৃথিবীতে প্রতি সেকেন্ডে মানুষ প্রায় $1\frac{1}{2}$ একর বন কেটে

ধ্বংস করে। এবার দেখা যাক এর ফলে কী কী সমস্যা হতে পারে —

1. মাটির খুব গভীরে বা কম গভীরে যাওয়া গাছ যদি হঠাৎ উপড়ে ফেলা হয়, তবে যে মাটির কণাগুলোকে গাছের মূল আঁকড়ে ধরে থাকে, তারা আলাদা হয়ে যায়। তারপর জল শুকিয়ে গেলে ওই মাটি ঝুরঝুরে হয়। বৃষ্টির ধারায় সেই মাটি সহজে ধুয়ে চলে যায় এবং নিচের পাথর বেরিয়ে যায়। ফলে সেখানে তখন আর কোনো উদ্ভিদ জন্মাতে পারে না। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এই ধরনের ঘটনা দীর্ঘদিন ধরে ঘটতে থাকলে মরুভূমি পর্যন্ত সৃষ্টি হতে পারে (Desertification)।
2. বন কেটে ফেললে ওই অঞ্চলের মাটি আর বৃষ্টির জল ধরে রাখতে পারে না। ফলে মাটির নীচের জলের স্তর কমতে থাকে।
3. বন ক্রমাগত কাটতে থাকলে CO_2 শোষণে বেশি সক্ষম গাছের সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে। বাতাসে CO_2-এর পরিমাণ বেড়ে গেলে পরিবেশ গরম হয়ে যায় (Global warming)। অতিরিক্ত গরমে জলচক্র (জল → মেঘ → বৃষ্টি → বরফ) ব্যাহত হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমতে থাকে বা বৃষ্টিপাতের ধরনের পরিবর্তন ঘটে। ফলে খরার (Drought) ও বন্যার (Flood) সম্ভাবনা বাড়ে।
4. বিভিন্ন প্রাণী বিশেষ ধরনের গাছ বা বনাঞ্চলকে তার বাসস্থানের জন্য ব্যবহার করে। এধরনের বনাঞ্চল ধ্বংস হলে ওই প্রজাতির বিলুপ্তির (Extinction) সম্ভাবনা বাড়ে এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস পায়।

বন কেটে ফেলা ও পরিবেশের ক্ষতিসংক্রান্ত নীচের ছবিগুলো বিশ্লেষণ করো।

কী করে বন বাঁচানো সম্ভব

1. বনাঞ্চলে গাছকাটা বন্ধ করা।
2. গাছ পোঁতা ও নতুন নতুন বনাঞ্চল তৈরি করা।
3. বনে আগুন লাগার সম্ভাবনা কমানো ও বনাঞ্চলে পশুচারণ নিয়ন্ত্রণ করা।

4.বনের পরিণত গাছ কাটা এবং সেই জায়গায় ওই একই প্রজাতির নতুন গাছের চারা লাগানো।

5.বনের গাছে কোনো রোগের আক্রমণ ঘটলে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

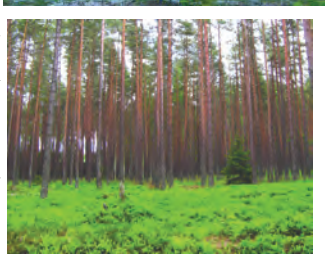

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান দুটি বনভূমি হলো উত্তরবঙ্গের বনভূমি এবং সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভস উদ্ভিদের বনভূমি। উত্তরবঙ্গে উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলের (8,000 ফুটের ওপরে) ও ডুয়ার্স এবং তেরাই-র বন দেখা যায়। বর্তমানে পরিবেশের নানান পরিবর্তন ও মানুষের নানাবিধ কার্যাবলির ফলে ওই বনগুলিতে কিছু সংকট তৈরি হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের বনভূমির সংকট

উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স এবং তরাই-এ বনভূমিতে শাল, গামার, ওদাল, খয়ের, শিশু, আমলকী এবং উঁচু পাহাড়ের ঢালে রোডোডেনড্রন, পাইন প্রভৃতি নানা গাছ চোখে পড়ে। আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে বিদেশ থেকে ধূপী গাছের চারা এনে উঁচু পাহাড়ের ঢালে ধূপীর বন তৈরি করা হয়েছে। ডুয়ার্স এবং তরাইতেও এরকম অনেক জায়গাতে মানুষের তৈরি শাল বা সেগুনের বন আছে। মানুষের তৈরি এইসব বন প্রাকৃতিক বনাঞ্চল কেটেই তৈরি হয়েছে। চা-বাগানের জন্যও প্রাকৃতিক বনাঞ্চলের অনেকটাই সংকুচিত।

উত্তরবঙ্গের বনভূমি সংলগ্ন চা-বাগানে কিংবা অনেক সময় বনভূমির পার্শ্ববর্তী জনবসতি এলাকায় ঘুরলে প্রায়ই চিতাবাঘ হানার কথা শোনা যায়। প্রাকৃতিক খাদ্যের অভাবে চিতাবাঘের খাদ্যাভ্যাস অনেকটাই বদলে গেছে। এদের প্রাকৃতিক খাদ্য হলো নানা ধরনের তৃণভোজী প্রাণী — ছোটো হরিণ, বুনো ছাগল, খরগোশ, বুনো মোরগ, ময়ূর। আর খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনের পর এরা জঙ্গলের ধারে গ্রামের সীমানা থেকে প্রায়ই ছাগল, গোরু-মোষের বাচ্চা, হাঁস-মুরগি, কুকুর ধরতেই বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এর সামগ্রিক পরিণতি হলো চিতাবাঘ-মানুষের সংঘাত। চা পাতা তুলতে গিয়ে ঝোপেঝাড়ে থাকা চিতাবাঘের আক্রমণের মুখোমুখি হচ্ছে চা শ্রমিকরা। অনেক সময় বিষ প্রয়োগে বা মরণফাঁদ তৈরি করে চিতাবাঘদের মেরে ফেলা হচ্ছে।

গন্ডারের বসবাস উপযোগী জঙ্গল ও জলার তৃণভূমি আয়তনে ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসতে থাকায় ও মানুষের বসতি বেড়ে উঠতে থাকায় উত্তরবঙ্গের বনভূমিতে থাকা একশৃঙ্গ গন্ডারের অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে উঠেছে।

বন কেটে হাতির যাতায়াতের পথে রেললাইন বসানোয় ও জনবসতি গড়ে ওঠায় উত্তরবঙ্গের বনভূমির আরেক সংকট হলো মানুষ-হাতি সংঘাত। উত্তরবঙ্গে ইদানীং ট্রেনে কাটা পড়ে অনেক হাতি মারা যাচ্ছে। বর্ষার শুরুতে ভুট্টা ফলার সময় আর শীতের শুরুতে ধান পাকতে শুরু করলে হাতির চলাচল অনেকটা বেড়ে যায়। হাতির দল তখন নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে মানুষের সঙ্গে হাতির সংঘাত শুরু হয়ে যায়।

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম দিকে যে শাল, সেগুনের অরণ্য দেখা যায় সেখানেও প্রায়ই দলমা পাহাড় থেকে হাতিরা নেমে আসে। তার জঙ্গলে ফিরে না গিয়ে জনবসতি এলাকায় দীর্ঘ সময় থাকার ফলে একই সমস্যা দেখা যাচ্ছে।

ম্যানগ্রোভস বনভূমি ও বর্তমান সংকট

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণদিকে জোয়ার-ভাটা প্লাবিত অঞ্চলে শ্বাসমূলযুক্ত যে বিশেষ উদ্ভিদ সমষ্টি চোখে পড়ে তারা মিলেমিশে ম্যানগ্রোভস অরণ্য বা বাদাবন তৈরি করেছে।

এই বনের উদ্ভিদেরা বেঁচে থাকার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করে। এই বনের বাইন, পশুর, কেওড়া, গরান প্রভৃতি উদ্ভিদের নীচের অংশ জোয়ারের সময় দিনে দু-বার জলে ঢেকে যায়। মাটির সূক্ষ্ম ছিদ্রগুলো কাদায় ঢাকা পড়ায় শ্বাসকার্য চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই এইসব উদ্ভিদের মূল থেকে মাটির ওপরে মুলোর মতো অসংখ্য শ্বাসমূল বেরোয়।

আবার কোনো ম্যানগ্রোভ যাতে জোয়ার-ভাটার স্রোতের টানে উপড়ে না যায় তার জন্য ঠেসমূল বের করে। গর্জন গাছে এটি ভালোভাবে চোখে পড়ে। আবার গর্জন, গরান, কাঁকড়া প্রভৃতি উদ্ভিদে বংশরক্ষার তাগিদে পাকা ফল মাটিতে পড়ার আগেই তার মধ্যে অঙ্কুরোদ্‌গম হয়ে যায়। শিশু উদ্ভিদটি যাতে মাটিতে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকতে পারে তার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা দেখা যায়।

ম্যানগ্রোভস অরণ্যের উদ্ভিদরা অনবরত আরেকটি সমস্যার মুখোমুখি হয়। জোয়ারের সময় সমুদ্রের নোনাজল

সরাসরি খাঁড়ির মধ্যে প্রবেশ করে। এক হাজার গ্রাম সমুদ্রের জলে প্রায় 33-38 গ্রাম লবণ থাকে যা স্থলভাগের উদ্ভিদরা সহ্য করতে পারে না। কারণ অতিরিক্ত লবণ উদ্ভিদের দেহকলায় বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। বাদাবনের উদ্ভিদেরা আংশিকভাবে মূল বা পাতার লবণ গ্রন্থির সাহায্যে এই লবণ বের করে দেওয়ার চেষ্টা করে। এছাড়াও পাতা ঝরে যাওয়ার মাধ্যমেও লবণ বার করে দেয়।

তবে বর্তমানে পরিবেশের তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়তে থাকায় জলের উচ্চতা ক্রমাগত বাড়ছে। আর জলে বাড়ছে নুনের পরিমাণ। এতে বহু গাছের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমতে শুরু করেছে। ফলে বিপন্ন হয়ে পড়ছে বাঘ, খাঁড়ির কুমীর, রিভার টেরাপিন(নদীর কচ্ছপ) -এর মতো প্রাণীরা।

তোমার বাড়ির আশেপাশে বন থাকলে বা যদি কোনোদিন কোনো বনে যাও তবে বনের নিম্নলিখিত বিষয়ে খেয়াল করো বা তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করো এবং তোমার ডায়েরিতে তথ্যগুলো লিপিবদ্ধ করো।

1. বনে কী কী ধরনের গাছ দেখা যায়? 2. বনের জলের উৎস কী কী? 3. বনাঞ্চলে কী কী প্রাণী বেশি করে চোখে পড়ে? 4. বনে যেসব উদ্ভিদ ও প্রাণী তুমি দেখতে পেলে তাদের নির্দিষ্ট শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করো। 5. ওই বনের ওপর আশেপাশের মানুষ কীভাবে নির্ভরশীল? 6. বনের গাছের পরাগমিলনে সাহায্যকারী কোন কোন প্রাণী তোমার চোখে পড়েছে? 7. বনের যেসব তৃণভোজী ও মাংসাশী যেসকল প্রাণী তোমার চোখে পড়েছে বা যাদের কথা তুমি জেনেছ তাদের নাম লেখো। 8. বনের কী কোনো সমস্যা তোমার চোখে পড়েছে? 9. কী করে ওই সমস্যার সমাধান করা যায়?

সমুদ্রের নীচের জীবন

সমুদ্র তোমরা অনেকেই দেখেছ। আর সমুদ্রের ধার থেকে ঝিনুকও নিশ্চয়ই কুড়িয়েছো। ওই ঝিনুকগুলো আসলে একধরনের সামুদ্রিক প্রাণীর খোলক। শক্ত খোলকটা প্রাণীটার নরম দেহকে রক্ষা করত। আমাদের চারপাশে যেমন নানাধরনের জীবেরা বাস করে, সমুদ্রেও তেমনি বাস করে অনেক ধরনের উদ্ভিদ আর প্রাণী।

এসো এবারে সমুদ্র আর সমুদ্রের জীবদের চেনা আর জানার চেষ্টা করি। সমুদ্র আর সমুদ্রের জীবদের সম্বন্ধে জানার প্রথম ধাপটাই হলো সমুদ্রকে চেনা।

মনে করো, তোমাকে কোনো একটা যানে (যার জানালাগুলো কাঁচের মতো স্বচ্ছ জিনিস দিয়ে তৈরি) করে আস্তে আস্তে সমুদ্রের গভীরে নামিয়ে দেওয়া হতে লাগল। সমুদ্রের যত গভীরে নামবে জলের গভীরতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জলের চাপও বেড়ে যাবে। তাই যান আর যানের জানালাগুলো এমন জিনিস দিয়ে তৈরি যা জলের এই প্রচণ্ড চাপ সহ্য করতে পারে। দিনের বেলায় যদি নামো, দেখবে সমুদ্রের জলতলের ঠিক নীচের অংশে কত আলো! কত বিচিত্র প্রাণী সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শ্যাওলা জাতীয় নানারকমের উদ্ভিদও তোমার চোখে পড়বে। সমুদ্রের গভীরে যত নামবে দেখবে সূর্যের আলো ক্রমশ কমে আসছে। আর তোমার চারপাশ ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসছে। প্রাণীদের সংখ্যাও ক্রমশ কমছে। আরও নীচে গেলে দেখতে পাবে নিকষ কালো অন্ধকার। কেবল তোমার যানের তীব্র আলোয় চারপাশের অন্ধকার অল্প অল্প করে কেটে যাচ্ছে। সেই আলোয় কখনো কখনো চোখে পড়ছে বিচিত্রদর্শন সব প্রাণী। সমুদ্রের গভীরে যেসব জীবেরা বাস করে তারা এই প্রচণ্ড চাপ আর অন্ধকারের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে। সমুদ্রের সব অঞ্চলে জীবের দেখা পাওয়া যায় না। আবার সমুদ্রের এমন কিছু কিছু অঞ্চল আছে যেখানে অধিকাংশ জীবের বাস।

অ্যাঙ্গলার মাছ

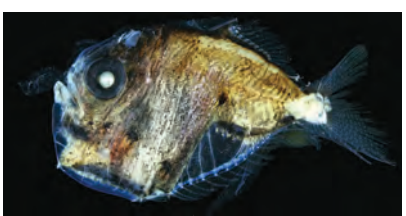

হ্যাচেট মাছ

যেসব সমুদ্রে প্রবাল প্রাচীর থাকে সেখানে মাছ ও অন্যান্য সামুদ্রিক জীবের বৈচিত্র্য খুব বেশি।

সমুদ্রের বিভিন্ন অঞ্চলে জীবনের বৈচিত্র্য

জোয়ারের সময় জল যতদূর পর্যন্ত বেড়ে যায় আর ভাটার সময় যতদূর অবধি জল নেমে যায়– তার মাঝের যে অঞ্চল, সেখানে দেখা মেলে নানা জীবের। যেমন লাইকেন, শ্যাওলা, শামুক, ঝিনুক, তারা মাছ, সাগরকুসুম, কাঁকড়া ইত্যাদি। মহীসোপানের (সমুদ্রে ডুবে থাকা মহাদেশের অংশ) ওপরে জলময় যে অঞ্চল, সেখানেও বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক জীবের দেখা পাওয়া যায়। এখানে জলের তলায় কেল্পের অরণ্য আর সামুদ্রিক ঘাসের তৃণভূমিতে দেখা পাওয়া যায় স্পঞ্জ আর অন্যান্য অমেরুদণ্ডী প্রাণী, ছোটো মাছ, সামুদ্রিক কচ্ছপ, সী-কাউ, সী হর্স আর ছোটো ছোটো সামুদ্রিক চিংড়ির। কেল্প হলো আসলে একধরনের সামুদ্রিক শ্যাওলা। খালি চোখে দেখা যায় না এমন আণুবীক্ষণিক জীবেরাও বাস করে এই অঞ্চলে।

এরপর খোলা সমুদ্রের যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল, সেখানে জলের বিভিন্ন গভীরতায় বিভিন্ন রকমের মেরুদণ্ডী (হাঙর, হ্যাচেট মাছ ও অন্যান্য সামুদ্রিক মাছ, তিমি) আর অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের (জেলি ফিস, সাগরকুসুম, চিংড়ি,

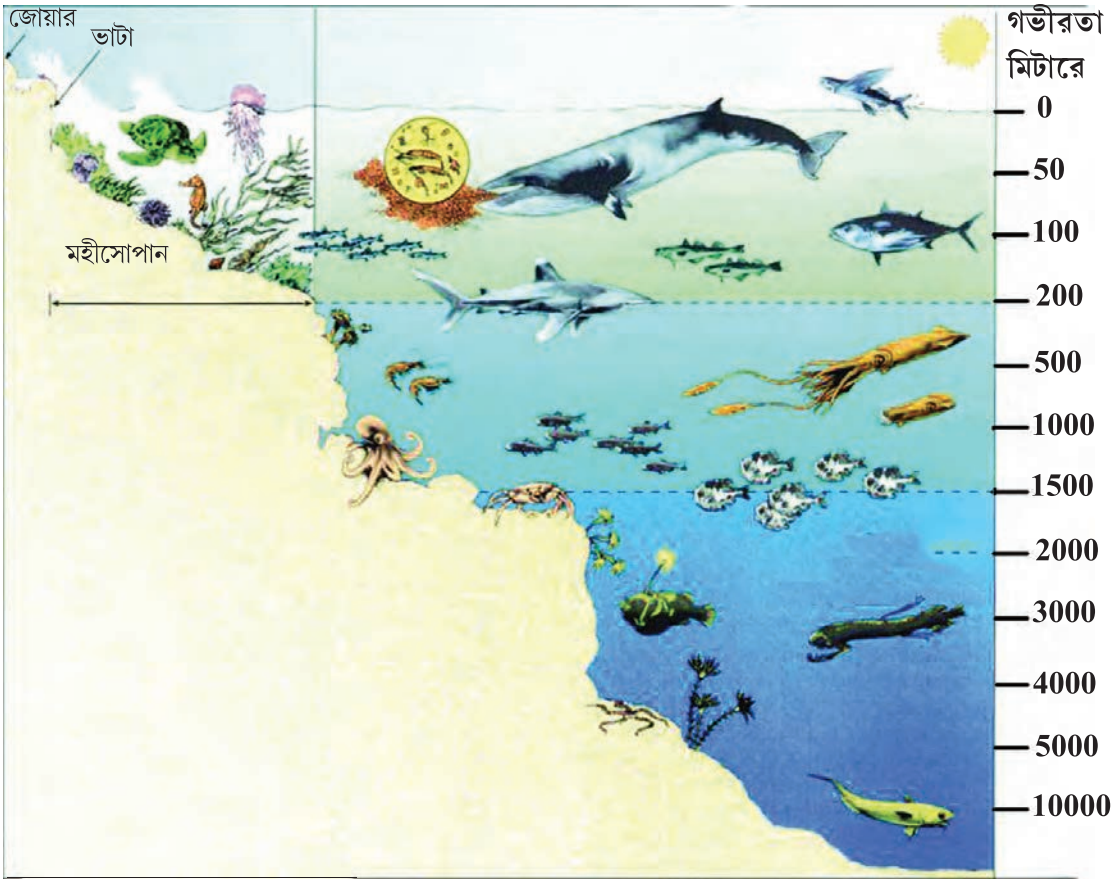

কাঁকড়া, স্কুইড, অক্টোপাস, তারামাছ, সমুদ্র শশা) দেখা মেলে। সমুদ্রের যে গভীরতা অবধি সূর্যের আলো প্রবেশ করে সেখানে নানাধরনের উদ্ভিদের দেখা পাওয়া যায়। জলতলের ঠিক নীচে যতদূর অবধি সূর্যের আলো আর তাপ প্রবেশ করতে পারে, সেখানেই জীবনের বৈচিত্র্য বেশি। কারণ এই অঞ্চলে থাকা সবুজ উদ্ভিদেরা সূর্যের আলোর সাহায্যে খাবার তৈরি করতে পারে। সবুজ উদ্ভিদের সূর্যের আলোর সাহায্যে খাবার তৈরি করার এই প্রক্রিয়াটাই হলো সালোকসংশ্লেষ। এই খাবারের ওপর নির্ভর করে এই অঞ্চলের অন্য সব জীবেরা। আর সমুদ্রের গভীরে বসবাসকারী জীবেরা খাবারের জন্য নির্ভর করে সূর্যের আলোয় আলোকিত ওপরের অঞ্চল থেকে ভেসে নেমে আসা খাবারের টুকরো বা উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষের ওপর। অনেকসময় এরা অন্য জীবদের শিকার করেও খাবার জোগাড় করে। সমুদ্রের যত গভীরে যাওয়া যায় সূর্যের আলো ততই কম প্রবেশ করে। আর তাই সমুদ্রের গভীরে জলের তাপমাত্রাও কমতে থাকে। গভীর সমুদ্রে বসবাসকারী জীবদের তাই কম তাপমাত্রা আর প্রচণ্ড চাপের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে হয়।

ওপরের ছবিতে তোমরা বিভিন্ন গভীরতায় বিভিন্ন জীবদের দেখতে পাচ্ছ। বিভিন্ন জীবদের যে গভীরতায় দেখতে পাচ্ছ তাদের সবসময় যে ওই গভীরতাতেই দেখা যাবে তার কিন্তু কোনো ঠিক নেই। কারণ ওদের মধ্যে অনেকেই কখনও খাবারের খোঁজে আবার কখনও বা অন্য প্রাণীর আক্রমণ থেকে বাঁচতে জলের বিভিন্ন গভীরতায় ওঠানামা করে।

বায়োলুমিনিসেন্স (Bioluminescence)

সমুদ্রের গভীরে সূর্যের আলো প্রবেশ না করলেও অন্য এক ধরনের আলোর দেখা পাওয়া যায়, যার কোনো উত্তাপ নেই। একে বলে বায়োলুমিনিসেন্স (Bioluminescence)। সমুদ্রের গভীরে কিছু জীবের দেখা মেলে যারা রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেদের দেহে আলো তৈরি করতে পারে। এরা হলো বায়োলুমিনিসেন্ট (Bioluminescent) জীব।

বায়োলুমিনিসেন্স কথাটার উৎপত্তি কোথা থেকে সেটা আগে দেখা যাক। গ্রিক শব্দ Bios = জীবিত (living) আর ল্যাটিন শব্দ lumen = আলো (light)। অর্থাৎ জীবের থেকে আসা আলো। বায়োলুমিনিসেন্ট জীবদের দেহে একধরনের প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত রঞ্জক পদার্থ থাকে — লুসিফেরিন (Luciferin)। আর থাকে একধরনের উৎসেচক — লুসিফারেজ (Luciferase)। অক্সিজেনের উপস্থিতিতে এই দুইয়ের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় রাসায়নিক শক্তি পরিবর্তিত হয় আলোকশক্তিতে। তৈরি হয় 'ঠান্ডা আলো' বা বায়োলুমিনিসেন্স। অবশ্য সব বায়োলুমিনিসেন্ট প্রাণীদের দেহেই যে এই দুটো পদার্থ থাকে এমন নয়। কোনো কোনো প্রাণীরা এই আলো তৈরির অন্য কিছু আলো-উৎপাদনকারী ব্যাকটেরিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতায় অর্থাৎ তাদের সঙ্গে মিথোজীবী সম্পর্ক গড়ে তোলে। বেশিরভাগ বায়োলুমিনিসেন্ট জীবদের দেখা মেলে সমুদ্রের 200-1000 মিটার গভীরতায়। বায়োলুমিনিসেন্স এই জীবদের নানাভাবে সাহায্য করে। যেমন - খাবার খোঁজা, খাদ্যকে আকর্ষণ করা, ছদ্মবেশ ধারণ, আত্মরক্ষা ইত্যাদি।

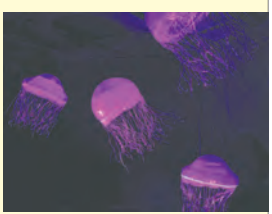

সমুদ্রের জীব

প্ল্যাংকটন: (গ্রিক শব্দ Planktos = ভেসে বেড়ায়)

এরা একধরনের জলজ জীব, যারা স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটতে পারে না। এরা বড়ো বড়ো জলজ প্রাণীদের (মাছ, তিমি) খুব গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য। এরা প্রধানত দু-ধরনের ।

i) ফাইটোপ্ল্যাংকটন (গ্রিক শব্দ Phytos = উদ্ভিদ): এরা সূর্যের আলোর সাহায্যে খাবার তৈরি করতে পারে।

ii) জুপ্ল্যাংকটন (গ্রিক শব্দ Zoon = প্রাণী): এরা নিজেরা খাবার তৈরি করতে পারে না; অন্য প্ল্যাংকটনদের খায়।

উদ্ভিদ

1. ফাইটোপ্ল্যাংকটন

ডায়াটম

এই এককোশী আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদেরা সাধারণত জলের ওপরের দিকটায় বাস করে। সূর্যের আলোর সাহায্যে এরা খাবার তৈরি করে। বিভিন্ন সামুদ্রিক জীবের খাদ্য এরা। তাছাড়াও পরিবেশে কার্বনের ভারসাম্য বজায় রাখায় এদের ভূমিকা আছে।

a) **ডায়াটম :** এরা এককোশী। এরা এককভাবে বা শৃঙ্খলাকারে কলোনি তৈরি করে। এদের কোশপ্রাচীর সিলিকা দিয়ে তৈরি।

b) **ডিনোফ্ল্যাজেলেট :** এরা এককোশী। ডায়াটমদের মতো এদের সিলিকা দিয়ে তৈরি কোশপ্রাচীর থাকে না। এরা এককভাবে থাকে, কলোনি তৈরি করে না। ফ্ল্যাজেলার সাহায্যে এরা চলাফেরা করে।

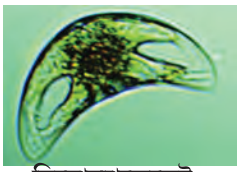
ডিনোফ্ল্যাজেলেট

কেল্প

2. কেল্প (Kelp)

এরা খুব বড়ো সামুদ্রিক শ্যাওলা। সমুদ্রের অগভীর অংশে এরা জন্মায়। এমনভাবে এরা বাড়ে যে সমুদ্রের নীচে প্রায় একটা অরণ্য তৈরি করে ফেলে। বেশিরভাগ প্রজাতির দেহ চ্যাপটা, অনেকটা পাতার মতো দেখতে। মূলের মতো একটা অংশের সাহায্যে এরা জলের নীচে কোনো কিছুর সঙ্গে আটকে থাকে। এরা খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে।।

প্রাণী

1. জুপ্ল্যাংকটন (Zooplankton)

ক্রিল

এরা মূলত আণুবীক্ষণিক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণী। অবশ্য সবাই আণুবীক্ষণিক নয়। এরা সমুদ্রের ওপরের তলে ভেসে বেড়ায়। ফাইটোপ্ল্যাংকটনের মতোই এরা ভালো সাঁতার কাটতে পারে না, তাই ভেসে বেড়ায়। অবশ্য কেউ কেউ ভালো সাঁতার কাটতে পারে। কিন্তু শত্রুর চোখ এড়াতে বা সহজে খাবার সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভেসে বেড়ায়।

2. সাগরকুসুম (Sea anemone)

সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেড়াতে অনেকসময় চোখে পড়ে বহু পাপড়িযুক্ত ফুলের মতো একটা জিনিস। হাতে করে তুললে দেখা যায় একটা নরম আর লম্বা বৃন্তের ওপরে ফুলের পাপড়িগুলো যেন ছড়িয়ে আছে। ধৈর্য ধরে কিছুক্ষণ লক্ষ করলে দেখা যাবে যে পাপড়িগুলো সামনে আর পেছনে আন্দোলিত হচ্ছে। এটাই সাগরকুসুম। এই সামুদ্রিক প্রাণীটার দেহটা ফাঁপা। পাপড়ির মতো উপাঙ্গগুলোর ঠিক মাঝখানে হলো তার মুখ। এই পাপড়িগুলো আসলে কর্ষিকা। এই কর্ষিকাগুলোতে থাকে অসংখ্য দংশক কোশ। ছোট মাছ বা অন্য কোনো প্রাণী শিকার করতে কাজে লাগে।

সাগরকুসুম

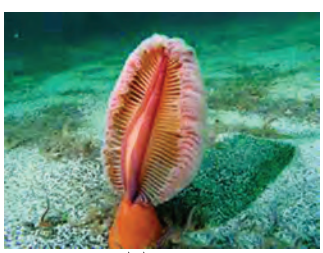
সাগরকলম

3. সাগরকলম (Sea-pen)

এই প্রাণীটির শরীরের দুই দিকেই সরু অংশ থাকে। অনেকটা হাঁসের পালকের তৈরি কলমের মতো। সী পেনের সারা শরীর জুড়ে অসংখ্য শাখা। প্রতিটা শাখাই মূল দেহ থেকে বেরিয়েছে। সী পেনকে পাথরে আটকে রাখতে সাহায্য করে এই শাখাগুলো।

4. অক্টোপাস (Octopus)

এদের বাহুর সংখ্যা আট। তাই নাম অক্টোপাস। শরীর গোলাকার। এদের দেহের বাইরে কোনো খোলক নেই। এদের বাহুগুলো লম্বা লম্বা শুঁড়ের মতো — ওপরের দিকটা মোটা আর নীচের দিকে ক্রমশ সরু। বাহুগুলোতে অনেকগুলো করে শোষক যন্ত্র থাকে। এই বাহুগুলোর কেন্দ্রে থাকে মুখ। অক্টোপাসের দুটো বড়ো বড়ো চোখ

অক্টোপাস

থাকে। অক্টোপাসের মস্তিষ্ক আর চোখ অমেরুদন্ডী প্রাণীদের মধ্যে সবথেকে উন্নত বলে মনে করা হয়। অধিকাংশ অক্টোপাসই খুব ছোটো আকারের হয়। সবচেয়ে বড়ো অক্টোপাস হলো প্রশান্ত মহাসাগরের দৈত্যাকার অক্টোপাস। সব অক্টোপাসেরই বিষ আছে। তবে সাধারণত এই বিষ ক্রিয়া করে কাঁকড়া, চিংড়ি, এইসব প্রাণীদের ওপর। কেবল ব্লু-রিংড অক্টোপাস (blue-ringed octopus) মানুষের পক্ষে প্রাণঘাতী হতে পারে। দেখতে যতই বীভৎস হোক না কেন, অক্টোপাসেরা কিন্তু নিরীহ আর ভীরু। আক্রান্ত হলে এরা এদের দেহের একটি গ্রন্থি থেকে কালি ছিটিয়ে জল ঘোলা করে দিয়ে পালিয়ে যায়।

মা অক্টোপাস আঙুরের মতো আকারের ছোটো গোল গোল ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে বাচ্চা বের না হওয়া পর্যন্ত মা অক্টোপাস পাহারা দেয়। এমনকি খেতেও যায় না যাতে কাঁকড়া বা অন্য প্রাণীরা ডিমের কোনো ক্ষতি না করে। মা অক্টোপাস তিলে তিলে অনাহারে মৃত্যুবরণ করার আগের মুহূর্ত অবধি সন্তানের যত্ন নেয়। তারপর ডিম ফুটে ছড়িয়ে যায় শিশু অক্টোপাসেরা। আর ধীরে ধীরে মা অক্টোপাসের মৃতদেহ নেতিয়ে পড়ে জলের তলায়।

5. স্কুইড আর কাটল ফিশ

স্কুইড

স্কুইডের বাহু দশটা। মাথার কাছে থাকে আটটি ছোটো আর দুটো বড়ো লম্বা মাংসল প্রত্যঙ্গ। এই হলো মোট দশটা বাহু। প্রতিটি বাহুতে থাকে একাধিক শোষক যন্ত্র। এদের দেহ লম্বাটে, টর্পেডোর মতো। আর লেজের দিকে রয়েছে পাখনা। শোষক যন্ত্রের সাহায্যে স্কুইড শিকার ধরে। আক্রান্ত হলে বাদামি কালির মতো তরল জিনিস ছিটিয়ে জলের রং ঘোলাটে করে শত্রুকে বোকা বানিয়ে পালিয়ে যায়।

কাটল ফিশ

দৈত্যাকার স্কুইড বাস করে আটলান্টিক সমুদ্রের গভীরে। এরা সাধারণত 50-60 ফুট লম্বা হয়। এদের বাহুর দৈর্ঘ্যই 30 ফুট। দেহের মধ্যে আছে অনেকটা বর্শার ফলার মতো দেখতে ক্যালশিয়ামঘটিত একটা শক্ত জিনিস। স্কুইডের আত্মীয় কাটল ফিশ সমুদ্রের ধারে পচে গেলে এই ক্যালশিয়ামঘটিত শক্ত জিনিসটা সহজেই সংগ্রহ করা যায়। এই জিনিস সমুদ্র ফেনা নামে বিক্রি হয়।

6. হাঙর (Shark)

হাঙর শক্ত হাড়ের মাছ নয়। এদের কঙ্কাল তৈরি হয় হাড়ের চেয়ে নরম কার্টিলেজ দিয়ে। এই ধরনের পদার্থ দিয়েই আমাদের নাকের ডগা বা বহিঃকর্ণের শক্ত অংশ তৈরি হয়েছে। খুব অল্প জাতের হাঙরই মানুষখেকো - যেমন গ্রেট হোয়াইট শার্ক, লম্বায় প্রায় 6 মিটারের মতো। হাঙরদের একটা দাঁত ভেঙে গেলে পেছনের সারির সেই অংশের দাঁত সামনে এগিয়ে এসে হারানো দাঁতের জায়গা দখল করে নেয়।

হোয়েল শার্ক

এদের কানকোর চেহারা কাটা দাগ বা ফাটলের মতো (slit)। এরকম পাঁচটা ফাটল বা স্লিট থাকে। হাঙরের

চামড়ায় ছোটো ছোটো আঁশ থাকে। এগুলো পেছনের দিকে ঢালু। তাই হাঙরের মুখ থেকে লেজের দিকে হাত বোলালে নরম লাগে। কিন্তু লেজের দিক থেকে মুখের দিকে হাত বোলালে শিরীষ কাগজের মতো অমসৃণ বা খসখসে মনে হয়। একসময় কাঠ পালিশ করার কাজে হাঙরের চামড়া বা শ্যাগ্রীন ব্যবহার করা হতো।

হ্যামার হেডেড শার্ক

বাস্কিং শার্ক আর হোয়েল শার্কের মতো বড়ো আকারের হাঙর মানুষের ক্ষতি করে না। এদের গলা এত ছোটো যে এরা শুধু খুব ছোটো মাছ আর প্ল্যাংকটন খেয়েই বেঁচে থাকে। হোয়েল শার্ক মুখ খুলে সাঁতার কাটে। আর জলের সঙ্গে ভেসে আসা ছোটো ছোটো জলচর প্রাণীদের খেয়ে ফেলে। এদের কানকো ছাঁকনির কাজ করে। কানকো দিয়ে জল বেরিয়ে যায়। আটকা পড়ে যায় প্রাণীরা। হোয়েল শার্ক তখন এদের খায়। অধিকাংশ হাঙর বাচ্চা প্রসব করে। তবে কোনো কোনো জাতের হাঙর আবার ডিমও পাড়ে। হ্যামার হেডেড শার্ক দেখতে খুব ভয়ংকর। এর মাথাটা একটা বিরাট হাতুড়ির মতো, যার দু-প্রান্তে দুটো চোখ থাকে। এই হাঙরও মানুষখেকো হতে পারে।

7. তারামাছ

তারামাছের বাহুর সংখ্যা সাধারণত পাঁচটি। বাহুগুলো চ্যাপটা মোটা পাতের মতো দেহ থেকে বেরিয়ে এসেছে। কখনো কখনো এদের চারটে বা দুটো বাহুও দেখা যায়। একটা বাহু ভেঙে গেলে সেখানে আবার নতুন বাহু তৈরি হয়ে যায়। তারামাছের বাহুর ভেতরের দিকে নরম আঙুলের মতো উপাঙ্গ আছে, যার নাম টিউব ফিট বা নালিপদ। এই নালিপদগুলো ফাঁপা আর এদের শেষপ্রান্তে আছে চোষক বা সাকার। নালিপদগুলোর সাহায্যে জল টেনে নিয়ে আর বের করে দিয়ে তারামাছ শিকার ধরে। জল টানায় সাময়িক শূন্যতা (vacuum) তৈরি হয়, ফলে শিকার নালিপদে আটকে যায়। এই নালিপদের সাহায্যেই তারামাছ চলাফেরা করে।

তারামাছ

ঝিনুক এদের প্রিয় খাবার। কোনো ঝিনুকের সন্ধান পেলে নালিপদের সাহায্যে এরা ঝিনুকটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে। ফলে ক্রমাগত টান পড়ার ফলে ঝিনুকটা বাধ্য হয় খোলের ভেতরে থেকে বেরিয়ে আসতে।

এসো এবারে আরও কয়েকটা সামুদ্রিক উদ্ভিদ আর প্রাণীদের চিনে নিই।

সামুদ্রিক ঘাস

মাকড়সা কাঁকড়া

লবস্টার

ব্লু-রিংড অক্টোপাস

ললিগো

সোর্ডফিশ

গ্রিন সী টার্টল

স্পার্ম তিমি

সমুদ্রে দূষণ ও সমুদ্রের জীবের সমস্যা

সমুদ্রে দূষণের মূলে কী কী আছে, তাদের একবার চিনে নিই। এরা হলো কীটনাশক, আগাছানাশক, রাসায়নিক সার, ডিটারজেন্ট, তেল, জৈব বর্জ্যযুক্ত ময়লা জল বা সিউয়েজ, প্লাস্টিক আর নানা কঠিন বস্তু।

1. রাসায়নিক সার ও জৈব বর্জ্য যুক্ত ময়লা জল

রাসায়নিক সার আর জৈব বর্জ্যযুক্ত ময়লা জলে থাকা নানা পুষ্টি উপাদান সমুদ্রের জলে মেশার ফলে ফাইটোপ্ল্যাংকটনরা সংখ্যায় খুব বেড়ে যায়। সমুদ্রের জল ঢেকে দেয় এরা। একে বলা হয় অ্যালগাল ব্লুম (Algal bloom)। ডিনোফ্ল্যাজেলেটেরা সংখ্যায় বেড়ে গিয়ে জলের রঙ লাল হয়ে যায়। এটাও একধরনের অ্যালগাল ব্লুম। এদের দেহ থেকে বেরোনো অধিবিষ (Toxin) অন্যান্য সামুদ্রিক জীবদের মৃত্যুও ঘটাতে পারে। জলের স্বচ্ছতা কমে গিয়ে সূর্যের আলো প্রবেশে বাধা সৃষ্টি হওয়ার ফলে সালোকসংশ্লেষ বাধা পায়। আর এই বিপুল পরিমাণ শৈবালরা শ্বাসকার্য চালানোর ফলে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে গিয়ে সামুদ্রিক প্রাণীদের অক্সিজেনের অভাব ঘটে। যার ফলে ওইসব প্রাণীদের মৃত্যু ঘটতে পারে।

2. তেল

তেল বহন করে নিয়ে যাচ্ছে এমন জাহাজে দুর্ঘটনা ঘটলে বা ডুবে গেলে বা সমুদ্রে তেল তোলার জায়গায় দুর্ঘটনা ঘটলে সমুদ্রে তেল মেশে। সামুদ্রিক জীবদের পক্ষে এই তেল বিষের মতোই। কারণ অপরিশোধিত তেলে থাকে নানা বিষাক্ত পদার্থ। সমুদ্রের জলের ওপরে তেলের স্তর থাকলে জলে অক্সিজেন ঢুকতে বাধা পায়। ফলে জলের জীবেরা অক্সিজেনের অভাবে মারা যেতে পারে। এছাড়াও সামুদ্রিক প্রাণীদের চামড়ায় ঘা আর চোখ, মুখ, নাক ইত্যাদি অঙ্গে অস্বস্তি বা প্রদাহ হতে পারে। সমুদ্রের জলে তেল মিশলে সামুদ্রিক প্রাণীদের তাপ-নিরোধক আর জল-নিরোধক ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে সমুদ্রের ঠাণ্ডা জলের সংস্পর্শে এসে তারা অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। এছাড়াও তেলে ভিজে যাওয়া পাখিরা ঠোঁট দিয়ে নিজেদের তেলে ভেজা পালকে বোলালে, ওই তেল তাদের শরীরে ঢুকে অভ্যন্তরীণ অঙ্গেরও ক্ষতি করতে পারে।

3. প্লাস্টিক

সমুদ্রে প্লাস্টিকজাত জিনিস ফেলা হলে সেগুলো ভাসতে থাকে। অনেকসময় সামুদ্রিক প্রাণীরা খাবার ভেবে এইসব প্লাস্টিকজাত জিনিস খেয়ে ফেলে। প্লাস্টিক বর্জ্য বড়ো আকারের হলে খাদ্যনালীতে আটকে গিয়ে খাবার যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে। অনাহার বা সংক্রমণে প্রাণীটার মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

4. সমুদ্রের জলের অম্লতা বেড়ে যাওয়া

মানুষের বিভিন্ন কাজের ফলে পরিবেশে CO_2 নির্গমন বাড়ছে। সমুদ্র এই CO_2-এর একটা বিরাট অংশ শোষণ করে। ফলে পরিবেশে CO_2-র পরিমাণ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের জলের অম্লত্ব বাড়ছে। আর এর প্রভাব পড়ছে মাছ, স্কুইড আর অন্যান্য ফুলকাযুক্ত সামুদ্রিক প্রাণীদের ওপর। কারণ আম্লিক সমুদ্রের জল থেকে শ্বাসকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রবীভূত অক্সিজেন পাওয়া এদের পক্ষে ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে। তাছাড়াও জলের অম্লতা বেড়ে গেলে কাঁকড়া, লবস্টার আর কোরালদেরও ক্যালশিয়াম কার্বনেটের খোলক তৈরি করা কঠিন হয়ে পড়বে। অতিমাত্রায় আম্লিক সমুদ্রের জলে এইসব প্রাণীদের ক্যালশিয়াম কার্বনেটের খোলক নষ্টও হয়ে যেতে পারে।

মরুঅঞ্চলের জীবজগৎ

ছবিটি দেখে মরুভূমি অঞ্চলের বৈচিত্র্যগুলো সম্পর্কে তোমার ধারণা লেখো —

মরুভূমি			
ভূ-প্রকৃতি	জলবায়ু	গাছপালা	জীবজন্তু

মরুভূমিতে শুধু বালি আর বালি। পৃথিবীর প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ জায়গা জুড়ে রয়েছে মরুভূমি। যতদূরে চোখ যাবে শুধু বালি। তাই বলে তার সীমানা নেই তা কিন্তু নয়। আমাদের দেশের থর মরুভূমির দিকে তাকাও। সাতলেজ নদীর পাড় থেকে পূর্বদিকে আরাবল্লী পর্বতকে ঘিরে রয়েছে থর। দক্ষিণে কচ্ছের রণ, পশ্চিমে সিন্ধু নদ। রাজস্থানের সীমানা জুড়ে রয়েছে মরুভূমি।

কোথাও জল নেই। বৃষ্টির ভীষণ অভাব। দিনের বেলায় রোদের তাপ খুব বেশি। বছরে 20 সেন্টিমিটারেরও কম বৃষ্টি হয়। শুধু বালি আর বালি থাকায় জল মাটিতে শোষিত হয় না। ফলে সূর্যের আলো প্রায় 90 শতাংশ বিকিরিত হয়। রাতের বেলা খুব ঠান্ডা। কিছু মরুভূমিতে আবার ভীষণ ঠান্ডা, যেমন এশিয়া মহাদেশের গোবি, কিংবা আন্টার্কটিকা মহাদেশের মরুভূমি। আশঙ্কার কথা হলো মরুভূমির আয়তন ক্রমশ বাড়ছে।

বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে নীচের কাজটা করো—

1। মেরুপ্রদেশের মরুভূমিগুলো ঠান্ডা হওয়ার কারণ কী ?

পৃথিবীর মাঝখান দিয়ে গেছে নিরক্ষরেখা। উত্তরে রয়েছে কর্কটক্রান্তি আর দক্ষিণে মকরক্রান্তি। মজার বিষয় হলো, নিরক্ষরেখা বরাবর কোনো মরুভূমি নেই। কিন্তু কর্কটক্রান্তি আর মকরক্রান্তি রেখা বরাবর মরুভূমি রয়েছে । এর কারণগুলো শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্যে লেখার চেষ্টা করো।

মরুভূমির বালির ভেতর লুকিয়ে রয়েছে অপার বিস্ময়। যেখানে বৃষ্টি নেই, জল নেই, আছে শুধু ভয়াবহ উত্তাপ কিংবা ঠান্ডা, এরকম কষ্টকর পরিবেশেও ছড়িয়েছিটিয়ে রয়েছে জীবজগতের অপার ভাণ্ডার। আমরা গরমে একটু কষ্ট পেলেই পাখা চালাই, কিংবা ঠান্ডায় কাঁথা বা লেপ চাপা দিই। কিন্তু শত কষ্ট সত্ত্বেও মরুভূমির জীবজগৎ মরুভূমি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চায় না। নানা মরুভূমিতে নানারকম জীবের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

নানাদেশের মরুভূমির জীবজগৎ

নীচের ছবিগুলো দেখো। তোমাদের ধারণা থেকে মরুভূমির জীবগুলোতে টিক (✓) চিহ্ন দাও:

পৃথিবীর প্রধান প্রধান মরুভূমি

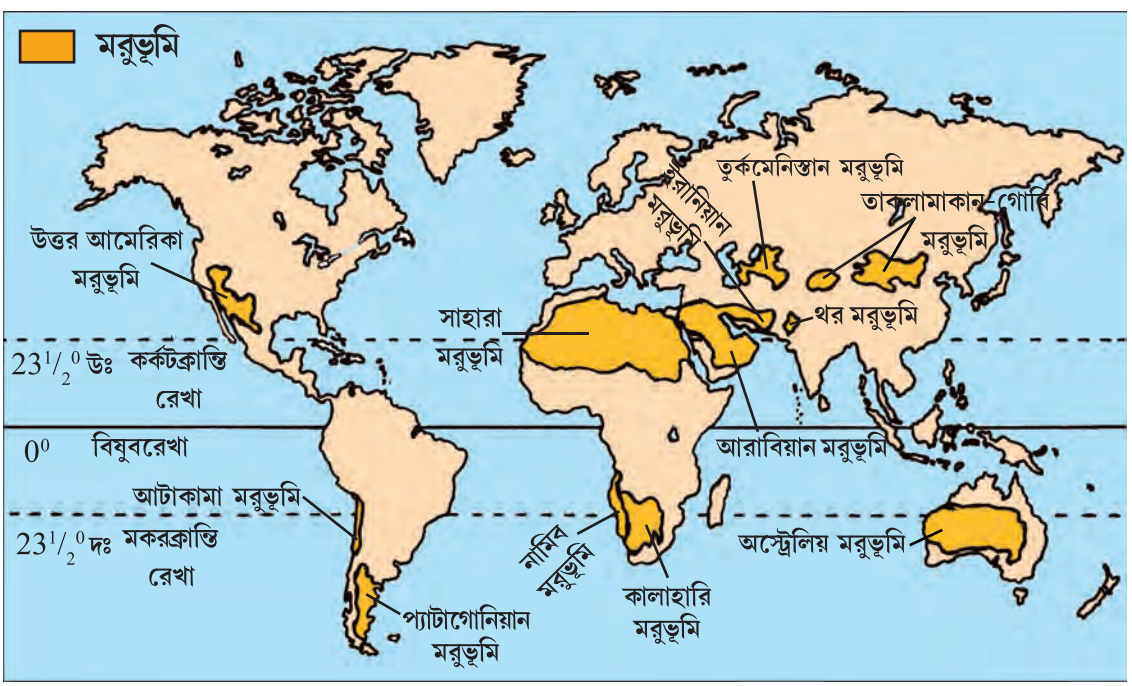

গরম/ঠান্ডা মরুভূমি	মরুভূমির নাম	কোন মহাদেশে অবস্থিত	প্রাণী
গরম	আরবের মরুভূমি	এশিয়া	উট, শেয়াল, খরগোশ, শজারু, বালি কেউটে, ক্যামেলিয়ন, কাঁকড়াবিছে, শকুন
ঠান্ডা	গোবি	এশিয়া	ব্যাক্ট্রিয়ান উট, বিটল, নীলপাহাড়ি পায়রা, ভালুক, বরফ চিতা, বন্য ভেড়া
গরম	থর	এশিয়া	কাঁটাওলা লেজবিশিষ্ট গিরগিটি, শেয়াল, উট, সাপ, শকুন
গরম	সাহারা	আফ্রিকা	পেঁচা, হরিণ, শজারু, শেয়াল, উটপাখি, হায়না

মরূদ্যান

যেখানে শুধু বালি আর বালি বৃষ্টির নামগন্ধও নেই, সেখানে মরূদ্যান! মানে গাছপালা, জলাশয়, নানা ধরনের প্রাণী। এও সম্ভব? হ্যাঁ সম্ভব, চারিদিকে বালির সমুদ্র মনে হলেও বালির নীচে অনেক গভীরে যে শিলাস্তর রয়েছে সেখানে রয়েছে জল। মরুভূমিতে যে সামান্য পরিমাণ বৃষ্টি হয়, তার বেশিরভাগ অংশই বালির নীচে গভীরে সেই শিলাস্তরে জমা হয়। মরুভূমির কোথাও কোথাও এই শিলাস্তরে ফাটল ধরলে সেই জল বাইরে বেরিয়ে এসে তৈরি করে জলাশয়। আর সেই জলাশয়কে ঘিরেই জন্মায় গাছপালা। শুরু হয় নানা জীবের সংসার, নিষ্প্রাণ, নিস্তরঙ্গ বালির সমুদ্রের মাঝে একটুখানি প্রাণের ছোঁয়া। তবে বিশাল মরুভূমির মাঝে মরূদ্যানের সংখ্যা খুবই কম।

মরুভূমির গাছগাছালি

বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে নীচের তালিকাটি পূরণ করো—

বিষয়	কী কী দরকার	কোথা থেকে পায়
গাছপালা বেঁচে থাকার জন্য দরকার	জল	মাটির তলা থেকে
প্রাণীদের বেঁচে থাকার জন্য দরকার		

মরুভূমিতে শুধু বালি আর বালি। সূর্যের তাপ ভয়াবহ। বাতাসে পর্যাপ্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড। কিন্তু মাটি নেই। জলের ভীষণ অভাব। এরকম অবস্থাতেও বালির বুক চিরে জন্মায় নানাধরনের গাছ। মরুভূমিতে প্রধানত দু-ধরনের গাছ চোখে পড়ে। এক ধরনের গাছ শুষ্কতাকে এড়িয়ে চলার জন্য তাড়াতাড়ি বাড়ে। মরে যাওয়ার আগে এই ধরনের গাছে ফুল ফোটে ও বীজ উৎপন্ন হয়। বীজগুলো অনুকূল পরিবেশ না পাওয়া পর্যন্ত সুপ্ত অবস্থায় থাকে। আরেক ধরনের গাছ শুষ্কতাকে প্রতিরোধ করতে থাকে। এদের কাণ্ড রসালো হয়। অল্প জলেই এরা বেঁচে থাকে অনেকবছর। দীর্ঘদিন নিজের শরীরে জল সঞ্চয় করে রাখতে পারে। এদের মূল, কাণ্ড হয় খুব বড়ো, আর মোটা। পাতার বদলে থাকে কাঁটা। জল যাতে বাষ্প হয়ে না বেরোতে পারে তার জন্য সারা শরীর কিউটিকল নামক আবরণে ঢাকা। বালির মধ্যে সামান্য স্যাঁতস্যাঁতে ভাব থাকলেই, তার থেকে জীবনের প্রয়োজনীয় জল সংগ্রহ করতে পারে। বেশ কিছু গাছের মূল বালি ভেদ করে অনেক গভীরে চলে যায়। জলের খোঁজে মূল অনেক গভীরে যায়, তাই তাদের মূলত্র বেশ শক্তপোক্ত। অতিরিক্ত জল যাতে বাইরে না বেরোতে পারে পাতাগুলোর পত্ররন্ধ্রের সংখ্যা কম। একটু বৃষ্টি হলেই আবার কিছু গাছ মাটি ফুঁড়ে ওঠে। তবে বেশিদিন বাঁচে না। অল্পদিনের আয়ুতেই গাছ ফুল-ফলে নিজেদের সাজায়। আবার কিছু গাছ আছে যারা জল ছাড়াই দীর্ঘদিন বাঁচে। এবার আমরা মরুভূমির নানা গাছের সঙ্গে পরিচিত হই।

ফণীমনসা : এই ধরনের গাছেদের মধ্যে প্রথমেই আসে ক্যাকটাসের নাম। সারা গায়ে কাঁটা ভরতি। সবদেশের মরুভূমিতেই রয়েছে এই প্রিকলি পিয়ার বা সাধারণ ফণীমনসা গাছ। গায়ে কাঁটা থাকায় অন্যান্য পশু-পাখিরা খেতেও পারে না। কাঁটা হলো ওদের আত্মরক্ষার অস্ত্র। সবুজ রঙের কাণ্ড।

যশুয়া গাছ : প্রায় পনেরো থেকে চল্লিশ ফুট লম্বা হয় এই গাছ। প্রায় দুশো বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। হলুদ-সবুজে ফুল ধরে। ঘন্টার মতো দেখতে। তবে গন্ধটা ভালো নয়। ফলগুলো আবার সবুজ আর খয়েরি। এই গাছের মূলটাও বেশ অন্যরকম। একধরনের মূল জল সঞ্চয় করে স্ফীত হয়ে কন্দ তৈরি করে। আর এক ধরনের মূল গভীরে চলে যায় জলের খোঁজে। পাতাগুলো কাঁটা কাঁটা। মানুষ এই গাছের ছালকে থালা, বাটি হিসাবে ব্যবহার করে।

সাগুয়ারো গাছ : দৈত্যাকার ক্যাকটাস সাগুয়ারো, প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু, প্রায় 200 বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। পাতার বদলে কাঁটা ভরতি। পত্ররন্ধ্রের সংখ্যাও কম। প্রায় ছয় থেকে আট টন জল শরীরে জমিয়ে রাখতে পারে। জল সংগ্রহ করে বৃষ্টি থেকে। সাগুয়ারো সেজে ওঠে রাতে। হলুদ ফুলে ভরে ওঠে সারা শরীর। আলো ফোটার সঙ্গে ফুলগুলি চুপসে যায়। মরু অভিযাত্রীরা জল তেষ্টা মেটাতে এই গাছ ব্যবহার করে। গাছের বেরিয়ে থাকা কান্ড কেটে জল বার করে খায়। এর ফল ব্যবহার হয় জ্যাম তৈরিতে। কাঠের শক্ত দড়ি, বাড়ি তৈরিতেও কাজে লাগে।

মেশকুইট গাছ : এই গাছে কিন্তু পাতা আছে। নিজের শরীরে এরা জল ধরে রাখতেও পারে না। তাহলে বেঁচে থাকে কী করে, বালি ভেদ করে গভীর শিলাস্তর পর্যন্ত মূল পাঠিয়ে দেয়। সেখানকার জলস্তর থেকে জল সংগ্রহ করে দিব্যি বেঁচে থাকে। তবে এরা বালিয়াড়ির কাছে জন্মায়। মরুভূমির বালিয়াড়িকে রক্ষা করে।

খাবার হিসাবে ক্যাকটাস : মরুভূমির মানুষদের কাছে ক্যাকটাস খুব প্রয়োজনীয় গাছ। ক্যাকটাসের মূলে জমা থাকে খাবার। তাই সেগুলো বেশ বড়ো আর মোটা। মরুভূমির বালির নীচে লুকিয়ে থাকা মূল বালির সজ্জা দেখে বুঝে নেয় মরুভূমির মানুষ। অনেক ক্যাকটাস মানুষের খাবারের জোগানও দেয়। সাগুয়ারো গাছের ফল তরমুজের মতো দেখতে।

বাড়িতে ও আশেপাশে তোমরা ক্যাকটাস দেখেছ। তোমার দেখা ক্যাকটাসের ছবি আঁকো। তারপর দলে আলোচনা করে নীচের তালিকা পূরণ করো।

মূল	কাণ্ড	কাণ্ডের রং	পাতা	ফুল	ফল	কী কাজে লাগে

মরুভূমির প্রাণী

মরুভূমিতে উদ্ভিদের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে যে প্রাণীদের জীবন আরও দুঃসহ। এরা সরাসরি সূর্যের বিকিরিত তাপ গ্রহণ করে। পাথর ও মাটি থেকে পরিবহণ পদ্ধতিতে এবং বাতাস থেকে পরিচলন পদ্ধতিতে এদের দেহে তাপ প্রবেশ করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় জল না পাওয়ার সমস্যা। এর মধ্যেও উটের মতো কোনো কোনো প্রাণী গঠনগত,শারীরবৃত্তীয় ও আচরণগত নানা পরিবর্তন ঘটিয়ে এখানে বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকে।

1) বলোতো উটের কুঁজে কী থাকে?

2) মরুভূমিতে যাতায়াতে উট প্রধান ভরসা, এই উটকে কী বলে ?

মরুভূমিতে যেদিকে তাকাবে শুধু বালি আর বালি। দিনের বেলায় ভয়াবহ উত্তাপ, রাতের বেলা ঠান্ডা, কোথাও যেন প্রাণের চিহ্ন নেই। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে মরুভূমির রূপ যায় পালটে। বালি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে নানা ধরনের জীবজন্তু, সাধারণত বালির উপর দাপিয়ে বেড়ায়। ভোর হলেই অদৃশ্য, তবে বেশ কিছু প্রাণী আছে যাদের দিনের বেলাতেও দেখা যায়। বেশিরভাগ মরুপ্রাণী আকারে ছোটো হয়। বালির নীচে লুকিয়ে থাকে। তারা জলের অভাব পূরণ করতে শিকার ধরে।

উট : বেশ বড়ো প্রাণী, দু-ধরনের হয়। এক কুঁজ-বিশিষ্ট (অ্যারাবিয়ান) আর দুই কুঁজ-বিশিষ্ট (ব্যাক্ট্রিয়ান)।

মরুভূমিতে যাতায়াতের প্রধান ভরসা, খুব কষ্ট করতে পারে। পিঠের কুঁজটা কিন্তু জল সঞ্চয়ের থলি নয়। এটা হলো চর্বি সঞ্চয় করে রাখা শরীরে একটা অংশ। এই চর্বি থেকে উট শক্তি জোগাড় করে। উট প্রায় 7 দিন পর্যন্ত না খেয়ে থাকতে পারে। উটের হাঁটুর কাছে আর পেটের নীচে মোটা চামড়ার আস্তরণ আছে যা বালিতে বসতে সাহায্য করে। মরুভূমিতে মাঝে মাঝেই মরুঝড় হয়। বালিতে বালিতে চারদিক অন্ধকার। উটের তার নাকের ফুটো প্রয়োজনে বন্ধ করতে ও খুলতে পারে, চোখের পাতা স্বচ্ছ। চোখের ওপরে ভুরু ছোটো মোটা ঝোপের মতো। উটের ঠোঁট এবং জিভ শক্ত পেশি দিয়েই তৈরি, যাতে কাঁটা ঝোপ খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। উটরা প্রায় পঁচিশ গ্যালনের মতো জল একসঙ্গে পান করতে পারে। এদের দেহে ঘর্মগ্রন্থির সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। যাতে শরীর থেকে বেশি জল বেরিয়ে না যায়, তাই এদের মূত্র ঘন হয়। এদের পা অনেকটা চওড়া। আর পায়ের পাতা বেশ পুরু। ওপরের তথ্যগুলো থেকে নীচের বক্তব্যের যথার্থতা বিচার করো—

কোনো একটি বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলের জীবের উপস্থিতি ওই অঞ্চলের আবহাওয়ার ওপর নির্ভরশীল। উটের মতো অন্যান্য যে সকল প্রাণীরা মরুভূমিতে থাকে তারা কীভাবে তাপ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে?

1. কোনো কোনো প্রাণী কেবল রাতের বেলায় বের হয়।
2. কোনো কোনো প্রাণী খুব ভোরে বা সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় কেবল কয়েক ঘণ্টার জন্য সক্রিয় হয়।
3. কোনো কোনো প্রাণী গরমকালে শুষ্ক জায়গা থেকে উঁচু ঠাণ্ডা জায়গায় চলে যায়। আবার শীতকালে চলে আসে।
4. তাপমাত্রা খুব বেড়ে গেলে কোনো কোনো প্রাণী এস্টিভেশন বা গরম ঘুমে চলে যায়। এসময় তাদের শ্বাসক্রিয়া, হৃদকম্পনের হার কমে যায়।
5. কোনো কোনো প্রাণীর ত্বক অপেক্ষাকৃত পুরু হয় যাতে জল বেরিয়ে না যেতে পারে।
6. কোনো কোনো প্রাণীর পা খুব লম্বা হয়, যাতে দ্রুত দৌড়োতে ও অনেকটা উঁচু পর্যন্ত লাফাতে সুবিধা হয়। এতে তপ্ত বালির সরাসরি সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা কমে।

মরুভূমির গিরগিটি : এরা খুব একটা লম্বা নয়। তবে একটু চওড়া গোছের। এরা দিনের বেলায় বালির মধ্যে ঢুকে থাকে। সন্ধ্যের দিকে বেরিয়ে আসে খাবারের খোঁজে । যখন বালির ওপর দিয়ে ছুটে যায় মনে হয় যেন বালির উপর দিয়ে সাঁতার কাটছে। এদের চওড়া লেজে চর্বি সঞ্চয় করা থাকে। চোখের পাতা স্বচ্ছ চামড়া দিয়ে ঢাকা। পোকামাকড় খেয়েই বেঁচে থাকে।

র‍্যাটল সাপ : মরুভূমির সবচেয়ে বিষাক্ত সাপ। লেজের কাছে ফাঁপা ঝুমুরের মতো ঝুমঝুমি বা Rattle দেখা যায়। খুবই ভালো সাঁতার কাটতে পারে। যত বয়স হয় তত এদের ঝুমঝুমি বা Rattle লম্বা হয়। এদের শরীরে ঠান্ডা রক্ত থাকে, শরীরে শুকনো আঁশ রয়েছে। এই সাপের জিভ খুবই সক্রিয়। দুটো ফাঁপা বিষদাঁত রয়েছে। এরা মাংসাশী প্রাণী। রাতের বেলা বের হয়। শিকারের ওপর বিষ ঢেলে দেয়। মাংস নরম হয়ে যায়, তারপর খায়। তবে এদের শত্রু হলো ঈগল।

জারবিল : ছোটো, ইঁদুরের মতো প্রাণী । বালি খুঁড়ে বালির ভেতর থাকে। রাতের বেলা বের হয়। এরা ক্যাঙারুর মতো লাফাতে পারে। এদের ক্যাঙারু ইঁদুরও বলা হয়। এরা কোনোরকম জল না পান করেই সারা জীবন থাকতে পারে। এদের লম্বা লেজ থাকে। সাদা থেকে খয়েরি রঙের হয়। তবে শত্রুর চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য বালির মতো রং ধারণ করতে পারে। এদের কান খুব সক্রিয়। এরা সাধারণত ঘাস বীজ, ছোটো শস্য,ফল, ছোটো ছোটো পোকামাকড় খেয়ে বেঁচে থাকে, খাবার থেকেই জল পায়। এমনকি বালির নীচে খাবার জমিয়েও রাখে।

থর মরুভূমিতে এমন কিছু প্রাণী দেখতে পাওয়া যায় যা অন্য মরুভূমিতে দেখা যায় না। থর মরুভূমির একটি উল্লেখযোগ্য প্রাণী হলো কৃষ্ণসার হরিণ। এছাড়া এক ধরনের বুনো গাধা আছে যাদের গায়ের রং বালির রঙের সঙ্গে মিশে যায়। থর মরুভূমির সবচেয়ে বড়ো পাখি হলো 'বাস্টার্ড'। রয়েছে ভারতের জাতীয় পাখি ময়ূর। এত ময়ূর ভারতের অন্য কোথাও দেখা যায় না। চিল, ঘুঘু, বালি মোরগও রয়েছে এখানে।

মরুভূমিতে থাকা বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীদের আচরণ তোমরা জানলে। এবার তোমরা আলোচনা করে মরুভূমিতে বেঁচে থাকা উদ্ভিদ ও প্রাণীদের তালিকা তৈরি করো। তারপর তাদের বেঁচে থাকার জন্য শরীরের কোন কোন অংশ সক্রিয় তা উল্লেখ করো।

উদ্ভিদ ও প্রাণীদের নাম	মরুভূমিতে বেঁচে থাকার জন্য প্রধান অঙ্গ	কারণ
1. ফণীমনসা		
2. উট		
3. জারবিল		
4. অস্ট্রিচ		
5.		
6.		
7.		

মরুভূমিতে মানুষ

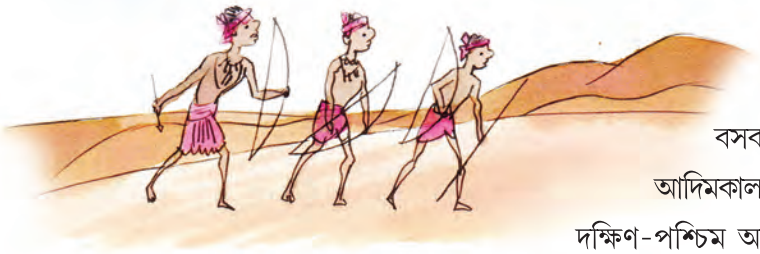

মরুভূমির মতো শুকনো অঞ্চলে মানুষ কীভাবে বাঁচবে? মরুভূমি কী মানুষের বসবাসের উপযোগী হতে পারে? হ্যাঁ, অবশ্যই, আদিমকাল থেকেই মানুষ মরুভূমিতে বাস করে আসছে। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার নামিব মরুভূমিতে বসবাসকারী মানুষদের বুশম্যান বলে। এরা বালির ভেতরে গর্ত করে থাকে। তিরধনুক নিয়ে প্রাণী শিকার করে। তারপর সেই প্রাণী ঝলসে খায়। কালাহারি মরুভূমিতে বসবাসকারী মানুষদের স্যান বুশম্যান (San Bushman) বলে। এরা ভিজে বালির মধ্যে গর্ত করে নলাকার ঘাস ঢুকিয়ে জল টেনে খায়। অস্ট্রিচের ডিমের খোলককে জল খাবার পাত্র হিসাবে ব্যবহার করে। এরা মরুভূমির বালি সজ্জা দেখে বলে দিতে পারে বালির তলায় জল আছে বা নেই। সাহারা মরুভূমির আদিবাসী তুয়ারেগরা ঘাস দিয়ে ঝুপড়ি তৈরি করে থাকে। মাটির নীচেও এদের ঘরবাড়ি হয়। মাটির নীচে সুড়ঙ্গ তৈরি করে সুড়ঙ্গপথে যাতায়াত করে।

আমেরিকার মরু অঞ্চলে রেড ইন্ডিয়ানরা একসঙ্গে মিলেমিশে থাকে। সবাই মিলে বাড়ি বানায়, প্রতিটি বাড়িতে বেশ কয়েকটা ঘর থাকে। পাথরের তৈরি এই বাড়িগুলিকে পুয়েবলা বলে।

থর মরুভূমিতে যারা থাকে তাদের মধ্যে ওয়াধা, ভীল, গাদি-লোহার সম্প্রদায়ের মানুষেরা উল্লেখযোগ্য। এরা মূলত যাযাবর।

সাহারা ও আরব মরুভূমির বেদুইনরা সারা শরীর লম্বা- ঢিলে ঢালা পোশাকে ঢেকে রাখে, যাযাবরের মতো উটের পিঠে চেপে মরুভূমির ওপর মাইলের পর মাইল ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে কিছুদিন তাঁবু খাটিয়ে বিশ্রাম নেয়। তারপর আবার শুরু হয় পথ চলা।

খাতায় ভারতের মানচিত্র আঁকো। তারপর ভারতের মরু অঞ্চল চিহ্নিত করো।

মরু প্রসার রোধে কী কী ভূমিকা গ্রহণ করা যেতে পারে তা চিহ্নিত করো।

ইউনাইটেড নেশনস-এর পক্ষ থেকে 2006 সালকে 'আন্তর্জাতিক মরুভূমি ও মরুকরণবর্ষ' রূপে ঘোষণা করা হয়। মাটির ক্ষয় ক্রমশ বেড়ে চলায় ও মাটির জৈব উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমশ কমতে থাকায় মরুভূমির বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

মেরু অঞ্চলের জীবজগৎ

মেরু অঞ্চল বলতে কোন অঞ্চলকে বোঝায়?

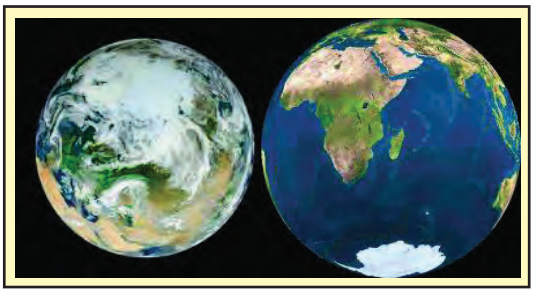

পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুকে ঘিরে যে ভৌগোলিক অঞ্চল অবস্থান করে তাই হলো মেরু অঞ্চল। উত্তর মেরুকে ঘিরে থাকা অঞ্চল আর্কটিক বা সুমেরু ও দক্ষিণ মেরুকে ঘিরে থাকা অঞ্চল অ্যান্টার্কটিকা বা কুমেরু নামে পরিচিত।

আর্কটিক অঞ্চল হলো প্রায় সমস্ত সুমেরু মহাসাগর ও তাকে ঘিরে ইউরোপ, এশিয়া ও উত্তর আমেরিকা মহাদেশের উত্তরাংশের দেশ বা তাদের প্রান্তসীমাসমূহ। অ্যান্টার্কটিকা অঞ্চল হলো অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ ও তাকে ঘিরে থাকা কুমেরু মহাসাগরের অংশবিশেষ অঞ্চলসমূহ।

টুকরো কথা

গ্রীষ্মের ঠিক মধ্যভাগে আর্কটিক ও অ্যান্টার্কটিকের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলসমূহে প্রায় 24 ঘণ্টা সূর্যের আলো থাকে। আর শীতের মধ্যভাগে এর ঠিক উলটো ঘটনা ঘটে, 24 ঘণ্টা জুড়ে শুধুই অন্ধকার।

আর্কটিক বা সুমেরুর জীবজগতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো জলজ স্তন্যপায়ীদের প্রাধান্য। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তিমি, সিল, সি লায়ন,বলগা হরিণ, কুকুর ও ডলফিন। এছাড়াও মেরু ভালুক, আর্কটিক টার্ন নামক পাখি ও মস, ঘাস, লাইকেন, বার্চ জাতীয় উদ্ভিদ দেখা যায়।

কী করে এত ঠান্ডাতেও সুমেরুর প্রাণীরা বেঁচে থাকে?

- শীতঘুম (Hibernation)

সুমেরুতে ঠান্ডা শুরু হওয়া মাত্র স্থলবাসী অনেক প্রাণী 'শীতঘুমে' চলে যেতে শুরু করে। এই সময় এরা চলাফেরা করে না। দেহের তাপমাত্রা খুব কমে যায়। হৃৎস্পন্দন ও শ্বাসক্রিয়ার হার কমে যায়। কোনো কোনো শীতঘুমে যাওয়া প্রাণী আবার গর্তের মধ্যে খাবার জমিয়ে রাখে।

- পরিযান (Migration)

এক বাসস্থান ছেড়ে অন্য বাসস্থানে যাওয়াই হলো পরিযান। ম্যাপ বা কম্পাসের সাহায্য ছাড়াই নানা প্রাকৃতিক চিহ্ন (পর্বত, নদী, তটরেখা, উদ্ভিদ, বায়ুর গতিপ্রকৃতি) দেখে সুমেরুর বহু পাখি, বলগা হরিণ খাদ্যের সন্ধানে বা বাচ্চা দেওয়ার জন্য ঠান্ডা জায়গা ছেড়ে অপেক্ষাকৃত গরম জায়গায় পাড়ি দেয়। আর্কটিক টার্ন-রা প্রায় 11,000 মাইল পাড়ি দিয়ে সুমেরু থেকে কুমেরুতে পৌঁছোয়।

কখন সুমেরুর প্রাণীরা বাচ্চা দেয় বা ডিম পাড়ে?

সুমেরুর শীতকালে প্রচণ্ড ঠান্ডায় বেশিরভাগ জীবই বাচ্চা দেয় না। কারণ বাচ্চাদের বাঁচিয়ে রাখার উপযুক্ত খাদ্যের অভাব। তাই বসন্তের শেষ থেকে প্রাণীরা নিজেদের অঞ্চল নির্দিষ্ট করে নেয়। আর স্বল্পস্থায়ী গরমের দিনগুলোতে বাচ্চা দেয় বা ডিম পাড়ে। এসময় গাছে গাছেও ফুল আসে যাতে শরতের আগেই গাছের বীজ দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে।

মেরু ভালুকরা আবার বাচ্চা দেওয়ার জন্য শীতকালকে বেছে নিয়েছে। এরা শীতকালে শিশু ভালুকের জন্ম দেয়। শীতের মাসগুলোতে বরফগুহায় এদের লুকিয়ে রাখে। এসময় শিশুরা মা ভালুকের দুধ খেয়ে বেঁচে থাকে। বসন্ত আসার সঙ্গে সঙ্গে এরা গুহা থেকে বেরিয়ে আসে।

মেরু ভালুকেরা কীভাবে সুমেরুতে বেঁচে থাকে?

তোমরা কী কখনও বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া মেরু ভালুকের ছবি দেখেছ? এ এক বিস্ময়কর ঘটনা। ভালুকদের গায়ের সাদা লোম বরফ ও তুষারের রং -এর সঙ্গে মিশে যাওয়ায় সহজে এদের চলমান অবস্থায় চেনা যায় না। এর ফলে শিকারের ওপর এদের অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে সুবিধা হয়। এদের লোমের তন্তুগুলো খুব স্বচ্ছ যা সূর্যের আলো শোষণ করে তাপ ধরে রাখতে সাহায্য করে। ফলে এদের শরীর গরম থাকে। প্রবল ঠান্ডাকে আটকানোর জন্য এদের চামড়ার ওপর ঘন লোমের দু-দুটি আস্তরণ থাকে। আর শরীরের একদম নীচের চামড়া কালো রঙের। ফলে সূর্যের তাপ যতটা সম্ভব ধরে রাখা সম্ভব হয়।

প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার জন্য মেরু ভালুকের আরেকটি হাতিয়ার হলো ফ্যাট। ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচতে এদের চামড়ার নীচে প্রায় 10 cm পুরু ফ্যাট থাকে। সেজন্য এরা সহজে জলে ভেসে থাকতে পারে।

জলে সাঁতার কাটার জন্য মেরু ভালুকের সামনের পায়ের থাবাগুলো আংশিকভাবে জোড়া থাকে। বড়ো ও ভারী সামনের পা-ও একাজে তাদের সাহায্য করে। এছাড়া এদের চোখও জলের অনেক নীচের জিনিস দেখতে ও চিনতে সাহায্য করে।

ভালুকের পা বরফের জুতোর মতো। এদের পায়ের তালুতে যে বিশেষ ধরনের লোম থাকে তা বরফ ও তুষারের ওপর দিয়ে হাঁটার সময় হড়কে যাওয়া থেকে আটকায়। আর এদের ঘ্রাণগ্রহণ ক্ষমতাও অনেক বেশি। প্রায় 32 km দূরে থাকা কোনো সিলের গন্ধও এরা শুঁকতে পারে। মেরু ভালুকদের কোনো প্রাকৃতিক শত্রু নেই। কিন্তু জীবজগতের তিনটি আশঙ্কাজনক প্রাণীর মধ্যে (বাঘ, গরিলা, মেরু ভালুক) এটি অন্যতম।

মেরু ভালুকের সামনে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে যে হারে মেরু অঞ্চলের বরফ গলতে শুরু করছে, তাতে এদের বাসস্থান ও বিচরণক্ষেত্র ক্রমশই সংকুচিত হয়ে পড়েছে। আর বহু বছর ধরে লোম, চামড়া, নখের জন্য এদের শিকারও করা হয়েছে।

মাছেরা কীভাবে সুমেরুর কম তাপমাত্রায় বেঁচে থাকে?

সুমেরু মহাসাগরের জলে প্রায় 240 ধরনের মাছ থাকে। শুষ্ক মিষ্টিজলের পুকুর বা নদীতে ওপরের জল জমে বরফ হয়ে গেলেও নীচের স্তরের জল তরল থাকে। আর তাতে মাছেরা দিব্যি বেঁচে থাকে। আর নোনাজলের সমুদ্রে হিমাঙ্কের নীচে তাপমাত্রা নেমে গেলেও জলের নুন এদের দেহকে জমে যেতে বাধা দেয়। আর এদের দেহে কিছু অ্যান্টিফ্রিজ প্রোটিন থাকে যা দেহের ভেতরে জলকে বরফ হতে বাধা দেয়।

মেরু অঞ্চলের মানুষ

আর্কটিক মেরু অঞ্চলে আমরা আজ যাঁদের স্থায়ীভাবে বাস করতে দেখি তাঁরা হলেন এস্কিমো। 'এস্কিমো' শব্দের অর্থ হলো 'যারা কাঁচা মাংস খায়।' এঁদের পূর্বপুরুষেরা এশিয়া থেকে একটি ভূ-সংযোগ অতিক্রম করে এখানে এসে পৌঁছেছিলেন যার আজ আর কোনো অস্তিত্ব নেই।

এস্কিমোরা মাত্র এক ঘন্টায় বরফ দিয়ে তাঁদের 'বরফবাড়ি' বা ইগলু বানিয়ে ফেলেন। এস্কিমোরা সবসময় কিন্তু ইগলুতেই থাকেন তা না। দূর গন্তব্যে চলার পথে কানাডার এস্কিমোরাই একমাত্র এধরনের 'বিশ্রাম আবাস' তৈরি করে।

এস্কিমোদের জীবনযাত্রা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও কষ্টসাধ্য। উত্তর মহাসাগরের ঠান্ডাজলের সিল, স্যামন, কডমাছ হলো এদের প্রধান খাদ্য। সেইসঙ্গে এঁরা হাঁস, খরগোশ, মেরু শিয়াল এমনকি মেরু ভালুক ও তিমি শিকার করে মাংস খান।

এস্কিমোদের জীবনের অপরিহার্য হলো কুকুর। পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এস্কিমোদের শিকারের খোঁজে ঘুরে বেড়াতে হয়। আর তা খালি পায়ে ঘোরা সম্ভব নয়। তাই এস্কিমোদের কুকুরে টানা স্লেজগাড়ির ওপর নির্ভর করতে হয়। তাছাড়া শিকার চিহ্নিত করতেও কুকুরদের ঘ্রাণশক্তিকে এস্কিমোরা ব্যবহার করেন।

অ্যান্টার্কটিক মেরু অঞ্চলের জীবজগৎ

দক্ষিণ মেরুতে উত্তর মেরুর মতো সিল, তিমি, ডলফিন দেখা গেলেও মেরু ভালুক নেই। আর দেখা যায় পেঙ্গুইন যা উত্তর মেরুতে অনুপস্থিত।

পেঙ্গুইন—অ্যান্টার্কটিকার বিস্ময়

অ্যান্টার্কটিকায় যে সকল পেঙ্গুইন প্রজাতি পাওয়া যায় তাদের মধ্যে অন্যতম হলো এম্পারার পেঙ্গুইন।

এম্পারার পেঙ্গুইনের জীবন ইতিহাস বিস্ময়কর কেন?

পেঙ্গুইনদের মধ্যে বৃহত্তম হলো এম্পারার পেঙ্গুইন। এরা বরফ ও জল উভয় জায়গাতেই থাকে। শীতকালে অ্যান্টার্কটিকায় যখন প্রবল হাড়-কাঁপানো ঠান্ডা, ঘন অন্ধকার নেমে আসে, তখনই এম্পারার পেঙ্গুইন বংশবিস্তার করে। এরা একটিমাত্র ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার পরে মেয়ে পেঙ্গুইন খাবার খুঁজতে দূরের সমুদ্রে চলে যায়। পুরুষ এম্পারার পেঙ্গুইন ওই ডিমটিতে তা দেয়। পুরুষ পেঙ্গুইন তার দু-পায়ের সঙ্গে একটি চামড়ার ভাঁজের নীচে ডিমটিকে ধরে রাখে। ডিমে তা দেওয়ার সময় হলো প্রায় দু মাস। এসময় পুরুষ এম্পারার পেঙ্গুইনরা অনেকে একসঙ্গে জড়াজড়ি করে থাকে। দীর্ঘ সময় কিছু না খাওয়ার ফলে এদের ওজন খুব কমে যায়। কিন্তু ডিম ফুটে বেরোনো বাচ্চাকে পুরুষরাই প্রথম খাওয়ানোর দায়িত্ব নেয়। তারপর মা ও বাবা দুজনেই বাচ্চাকে বড়ো করার দায়িত্ব নেয়। গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময় বরফখণ্ডে বাচ্চা পাখিরা চড়ে বসে এবং জীবনে প্রথমবার জলের সংস্পর্শে আসে। তখন সমুদ্রের জলে থাকা বিভিন্ন প্রাণীদের ধরে খেতে শেখে।

পেঙ্গুইনের সংকট

ফ্যাটের লোভে ষোড়শ শতাব্দী থেকে মানুষ পেঙ্গুইন শিকার করতে শুরু করে। পেঙ্গুইনের তেল থেকে বিভিন্ন কারখানায় সাবান ও জ্বালানি তৈরি শুরু হয়। পেঙ্গুইনের তেল থেকে একসময় এমনকি ওষুধও তৈরি হতো। পেঙ্গুইনের পালক জামাকাপড়, টুপি, জুতো ও ব্যাগ তৈরির কাজে ব্যবহৃত হতো। **1905 সালে আন্তর্জাতিক পক্ষী মহাসভা পেঙ্গুইনদের রক্ষা করার জন্য আবেদন জানায়। 1959** সালে **12** টি দেশ অ্যান্টার্কটিক চুক্তিতে সই করে। এর ফলে অ্যান্টার্কটিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পেঙ্গুইনদের রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

অ্যান্টার্কটিকার পরিবেশ ও দূষণ

পৃথিবীর সবথেকে কম দূষিত স্থান হলো অ্যান্টার্কটিকা। কিন্তু মানুষ সে জায়গাও দূষিত করতে শুরু করেছে। অ্যান্টার্কটিকায় যদি কোনো দূষিত পদার্থ পাওয়া যায়, দেখা যায় তার উৎস হলো পৃথিবীর অন্য জায়গায়।

মানুষের ব্যবহৃত নানা ক্লোরোফ্লুওরোকার্বন ও হ্যালন জাতীয় যৌগ অ্যান্টার্কটিকার ওপরে থাকা ওজোনস্তরের ঘনত্ব কমিয়ে দিয়েছে। ফলে দেখা দিয়েছে ওজোন ছিদ্র। আর ওই ছিদ্র দিয়ে ক্রমাগত অত্যন্ত ক্ষতিকারক অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে এসে পড়ছে। ফলে মানুষের ত্বকে ক্যানসার, চোখে ছানি পড়া ও জলে বসবাসকারী নানা আণুবীক্ষণিক প্রাণীদের সংখ্যা কমার ঘটনা ক্রমাগত বাড়ছে।

অ্যান্টার্কটিকায় জাহাজের চলাচল ক্রমশ বাড়তে থাকায় সমুদ্রের জলে চুঁইয়ে পড়া তেল ক্রমাগত মিশে জলকে দূষিত করে চলেছে। মাছ ধরার জাল, যন্ত্রপাতি, দড়ি, বাক্সের ক্রমাগত ব্যবহার বাড়তে থাকায় পাখি ও সিলেরা যখন-তখন এতে আটকে মারা পড়ে।

নীচের ছবিগুলোতে ওপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মেরু অঞ্চলে কোনটি কোন ধরনের দূষণ তা চিহ্নিত করো।

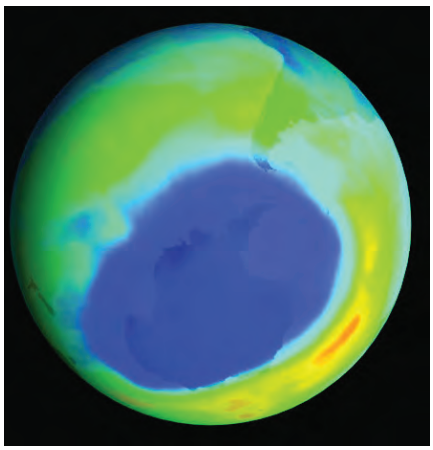

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ

আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে মানুষের জীবন নানাভাবে জীববৈচিত্র্যের ওপর নির্ভরশীল।

কী ধরনের নির্ভরশীলতা	কোন ধরনের জীবের ওপর নির্ভর করা হয়
1) খাদ্য 2) বাসস্থান 3) পোশাক 4) জ্বালানি 5) বাণিজ্যিক উপকরণ 6) ওষুধ	

কিন্তু মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীববৈচিত্র্যের নানাভাবে সংকোচন ঘটেছে। সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নানাধরনের বন্যপ্রাণীরা।

মানুষের যেসব আচরণের ফলে বন্যপ্রাণীর বিপন্নতা বাড়ছে সেগুলো হলো —

- সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার
- বন কেটে ফেলা
- বন্যপ্রাণীর বাসস্থান নষ্ট করে ফেলা
- পরিবেশকে দূষিত করা
- অন্য দেশ বা জায়গা থেকে অপরিচিত প্রজাতিকে নিয়ে আসা
- আবহাওয়ার পরিবর্তন
- শিকার করা বা
- বন্যপ্রাণীর দেহের নানা অংশকে বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা।

নীচের তালিকায় নাম দেওয়া প্রাণীগুলো কোন কোন পরিবেশে পাওয়া যায় এবং এদের বিপন্নতার কারণ পরের পাতার লেখাগুলো পড়ে এবং অন্যান্য সূত্রে খোঁজখবর নিয়ে নীচে লেখো।

প্রাণীর নাম	কোন কোন পরিবেশে থাকে	এদের সমস্যা
1) শকুন		
2) একশৃঙ্গ গন্ডার		
3) বাঘরোল/মেছো বিড়াল		
4) গঙ্গার শুশুক		

• এছাড়াও এরকম আরো যে অসংখ্য প্রাণী আছে যারা বিপন্ন বা বিলুপ্তির মুখোমুখি তাদের কথা জানব কী করে?

IUCN(International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources)নামের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা বিপন্ন জীবদের একটি তালিকা প্রকাশ করে। এই তালিকার নাম হলো Red Data Book। এদের তালিকায় বিভিন্ন প্রজাতিকে নানাস্তরে বা ক্যাটিগোরিতে ভাগ করা হয়েছে।

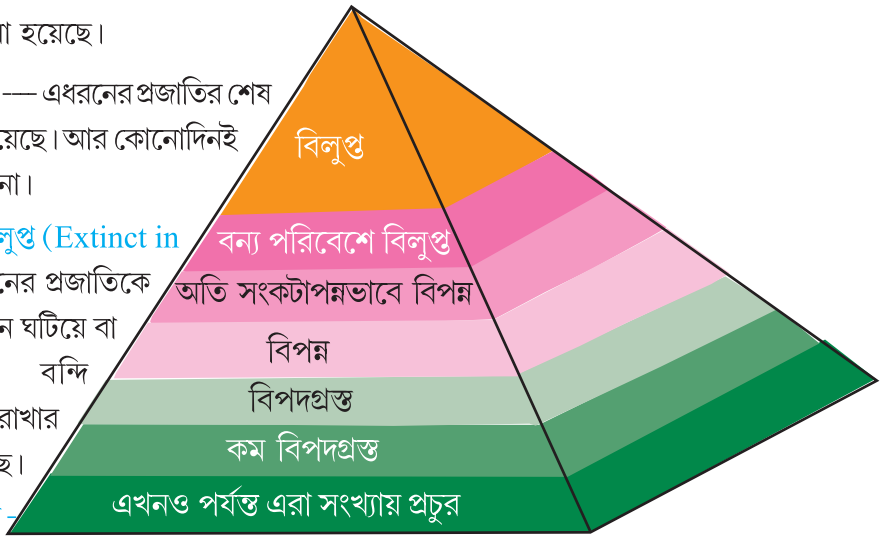

1) বিলুপ্ত (Extinct) — এধরনের প্রজাতির শেষ প্রাণীটিরও মৃত্যু হয়েছে। আর কোনোদিনই একে দেখা যাবে না।

2) বন্য পরিবেশে বিলুপ্ত (Extinct in Wild) — এধরনের প্রজাতিকে কৃত্রিমভাবে প্রজনন ঘটিয়ে বা চিড়িয়াখানায় বন্দি অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

3) অতি সংকটাপন্ন ভাবে বিপন্ন(Critically Endangered) — নিকট ভবিষ্যতে যে-কোনো সময়ে প্রজাতিটি স্থায়ীভাবে হারিয়ে যেতে পারে।

4) বিপন্ন (Endangered)— নিকট ভবিষ্যতে না হলেও বন্য পরিবেশে এদের বিলুপ্তির সম্ভাবনা যথেষ্টই।

5) বিপদগ্রস্ত (Vulnerable) — অদূর ভবিষ্যতে এই প্রজাতিটি হয়তো পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে।

6) কম বিপদগ্রস্ত (Lower Risk) — যখন কোনো প্রজাতিভুক্ত জীবের সংখ্যা স্বাভাবিকের থেকে কম হলেও ওপরের তিনটি ক্যাটিগোরিতে (3,4,5) এদের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

7) তথ্য অনুপস্থিত (Data Deficient)— এই প্রজাতিভুক্ত প্রাণীদের আচার-আচরণ, খাদ্যাভ্যাস নিয়ে আলোচনা হলেও বিস্তৃতি বা সংখ্যার প্রাচুর্য নিয়ে সঠিক তথ্য অনুপস্থিত।

8) যখন কোনো প্রজাতির প্রাণীকে ওপরের কোনো মাপকাঠিতে ফেলা যায় না, তখন তাকে সমীক্ষা করা হয়নি (Not Evaluated) এমন গোষ্ঠীতে রাখা হয়।

তথ্যের অভাবে ওপরের 7 ও 8 এর ক্যাটিগোরিকে পিরামিডে স্থান দেওয়া যায় না।

ভারতবর্ষের এরকম কতকগুলি বিশেষ বিপন্ন প্রাণী হলো

• রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার	• খাঁড়ির কুমির	• গঙ্গার শুশুক
• এশিয়াটিক লায়ন	• শকুন	
• একশৃঙ্গ গন্ডার	• রেড পান্ডা	
• লায়ন-টেইলড ম্যাকাক	• তুষার চিতা	

বিপন্ন জীবকে কীভাবে বাঁচানো সম্ভব

বহু প্রাচীন কাল থেকেই বিপন্ন জীবকে রক্ষা করার জন্য নানা দেশে নানা প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদের অন্তর্গত জীববৈচিত্র্যকে সংরক্ষণের জন্য গৃহীত সকল পদ্ধতিকেই একত্রে 'জিন ব্যাঙ্কস' বলা হয়। একে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয় —

বিপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীকে যখন তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশে (সাধারণ বাস্তুতন্ত্র বা মানুষের তৈরি বাস্তুতন্ত্র) সংরক্ষণ করা হয় তখন ওই জীবের স্বাভাবিক বাসস্থান বা মানুষের তৈরি বনকে সংরক্ষিত বন বলে ঘোষণা করা হয়। এটা আবার নানাধরনের হয়— অভয়ারণ্য, ন্যাশনাল পার্ক, বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ ও ভূ-প্রাকৃতিক দৃশ্য। এই ধরণের সংরক্ষণকে ইন সিটু (In Situ) সংরক্ষণ বলা হয়।

আবার যেসব জীবকে কোনোভাবেই তার স্বাভাবিক বাসস্থানে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে না, তাদের স্বাভাবিক বাসস্থান থেকে দূরে অন্য কোনো স্থানে (চিড়িয়াখানায় বা বোটানিক্যাল গার্ডেনে) রেখে বেঁচে থাকার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে কৃত্রিমভাবে সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়। এধরনের সংরক্ষণকে এক্স সিটু (Ex Situ) সংরক্ষণ বলা হয়। এছাড়াও বিশেষত অণুজীব ও উদ্ভিদের জিন, কোশ, কলা ও বীজকে গবেষণাগারে সংরক্ষণ করে রাখা হয়।

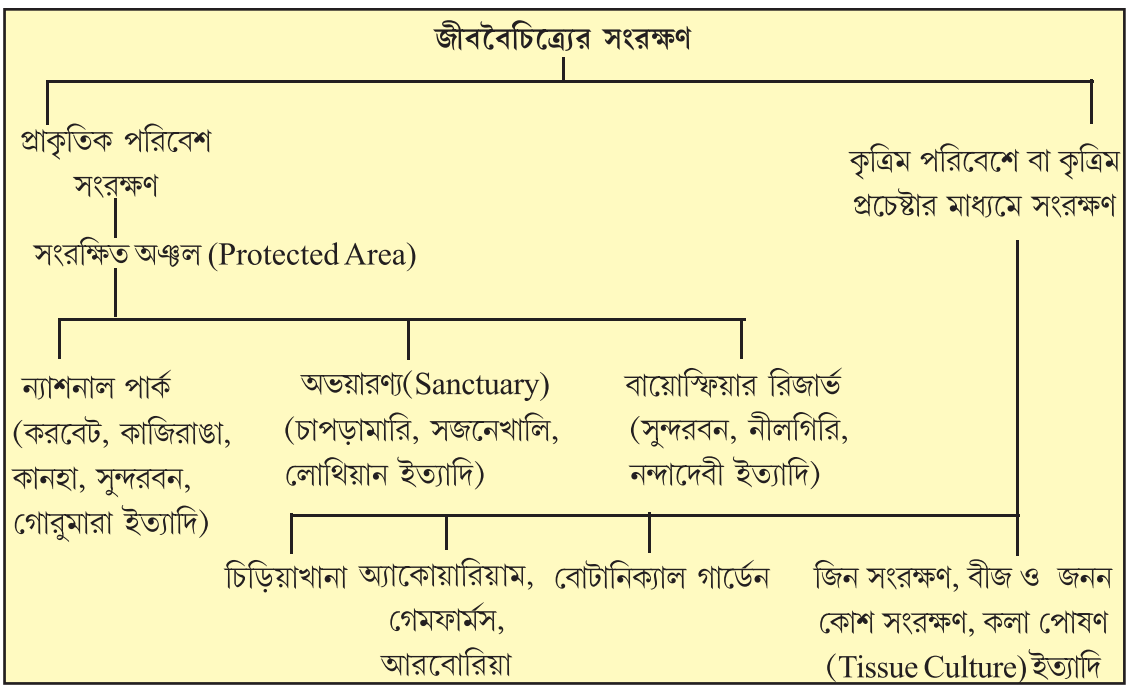

বসুন্ধরা শিখর সম্মেলন (Earth Summit)

1992 সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে পরিবেশ বিষয়ক একটি বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে পরিবেশের বিভিন্ন সমস্যা ও তার নিয়ন্ত্রণের জন্য একুশ দফা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। একে অ্যাজেন্ডা-21 বলা হয়। এর মুখ্য বিষয়গুলো হলো—স্থিতিশীল উন্নয়ন (Sustainable Development), বনের সংরক্ষণ, পরিবেশের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, জলসম্পদের সঠিক ব্যবহার, সমুদ্রের সুরক্ষা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও মানুষের স্বাস্থ্যের সুরক্ষা ইত্যাদি।

কয়েকটি বিপন্ন বন্যপ্রাণী ও তাদের সংরক্ষণ

IUCNএকটি আন্তর্জাতিক সংস্থা, যাঁরা প্রকৃতিতে বসবাসকারী বিভিন্ন জীবদের বিলুপ্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখেন এবং তাদের সংরক্ষণের জন্য উদ্যোগে সহায়তা করেন। IUCN-এর বিচারে যেসব প্রাণীর বিলুপ্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রবন এরকম কয়েকটি পরিচিত প্রাণীর কথা বলা হলো।

শকুন

শকুনদের বেশ বড়োসড়ো চেহারা, তবে মোটেই সুন্দর নয়। কালচে-খয়েরি শরীরের রং, রোগা, লম্বা পালকহীন বাঁকা গলা। ওই লম্বা গলা পশুর মৃতদেহের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় খাবার সংগ্রহের জন্য। বিশ্রামের সময় তাদের পিছনদিকের সাদা অংশ দেখা যায়, আর ওড়ার সময় যখন ডানাগুলো মেলে দেয় তখন নীচের সাদা পালক দেখেই তাদের চেনা যায়।

সাফাইকর্মী শকুন

গ্রামের কিংবা শহরের শেষপ্রান্তে লম্বা বা ঝাঁকড়া গাছে শকুনরা থাকত। দল বেঁধে অপেক্ষায় থাকত কখন একটা মরা পশু আসবে। ভাগাড়ে বা অন্য কোথাও মরা পশুর দেহ পেলেই ওরা ওই পশুর ওপর বসে প্রয়োজনীয় খাবার সংগ্রহ করতো, শহরের যাবতীয় আবর্জনাস্তূপ থেকে মৃত প্রাণীর শব খেয়েই ওদের জীবন চলতো। ফলে সব পচে মহামারি সৃষ্টিকারী জীবাণুরা বিস্তারলাভ করতে পারত না।

শকুনের বাসা

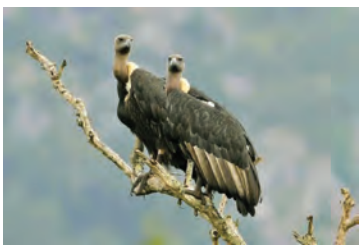

অশ্বত্থ, বট, শিরীষ, তাল, তেঁতুল, শিমুল, পাকুড় প্রভৃতি গাছের ডালে ওরা বাসা বাঁধতো । কাঠকুটো, ডালপালা জোগাড় করে ডালের খাঁজে বেশ শক্তপোক্ত বাসা ছিল ওদের। সেপ্টেম্বর থেকে মার্চের মধ্যে ওরা বাসা বাঁধে, ডিম পাড়ে। একটা পাখি একটাই ডিম পাড়ে। বহুতল বাড়ি তৈরির প্রয়োজনে গাছগুলো কেটে ফেলায় শকুনের বাসা বাঁধার জায়গা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে।

শকুনের হারিয়ে যাওয়ার কথা

আমাদের গ্রামেগঞ্জে ও শহরের প্রান্তে শকুনরা একসময় আকাশ কালো করে ডানা মেলে উড়তো। তাদের আর এখন দেখতে পাওয়া যায় না। হারিয়ে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ধরা পড়ল এক ভয়ংকর তথ্য। শকুনের দল সাধারণত মৃত পশুপাখিদের খেয়েই বেঁচে থাকে। পোষা গোরু-মোষদের বিভিন্ন অসুখে, বিশেষত হাড়ের অসুখে দেওয়া হয় এক বিশেষ ওষুধ ডাইক্লোফেনাক, ব্যথা কমানোর জন্য। তাদের মৃতদেহেও এই ওষুধ থেকে যেত। এই ডাইক্লোফেনাক শকুনের কিডনি বা বৃক্ককে নষ্ট করে দেয়। একসময় যত্রতত্র মরে পড়ে থাকতে দেখা গেল শকুনের দলকে। এছাড়াও এখন আর গ্রামেগঞ্জে মরা গবাদিপশুদের ভাগাড়ে না ফেলে পুঁতে দেওয়া হয়। ফলে শকুনের খাদ্যসংগ্রহ করার সংস্থানও কমে গেছে। পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাবে শকুনের ছানারা প্রায়ই মারা পড়ে।

শকুনের সংরক্ষণ

2006 সালের মার্চ মাসে ভারত সরকার ডাইক্লোফেনাককে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন, শকুনদের সংরক্ষণ করার প্রচেষ্টা শুরু হলো। শকুন অনেকদিন বাঁচে। আবার এদের জীবনের বিকাশ বেশ ধীরগতিতে হয়। তাই শকুনকে আবার তার আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনতে বেশ কয়েক দশক লেগে যাবে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় শকুন পুনর্বাসন কেন্দ্র খোলা হয়েছে। তার মধ্যে হরিয়ানার পিঞ্জোর এবং পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে রাজাভাতখাওয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখন শকুনের সকল প্রজাতি সংরক্ষিত আছে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইনে।

মেছোবিড়াল (বাঘরোল)

বন্যবিড়াল

সাইবেরিয়ার বরফ-ঠান্ডা এলাকা থেকে আমাজনের সূর্যের আলো না পৌঁছোনো বর্ষাবন কিংবা লাদাখের মরুএলাকা থেকে পশ্চিমবঙ্গের জলাভূমি বা বাদাবন-ভূ-প্রকৃতির এবং আবহাওয়ার এই চরম বিপরীত অবস্থাতেও গোটা পৃথিবী জুড়ে যে প্রাণীরা টিঁকে আছে তারা হলো বিড়ালজাতীয় অর্থাৎ বন্যবিড়াল (Wild Cat)। বন্যবিড়াল বলতে আমরা সাধারণত বাঘ, সিংহ বা চিতাবাঘকেই বুঝি। বাঘ আমাদের জাতীয় পশু। কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপশু এক বন্যবিড়াল - নাম তার মেছোবিড়াল বা বাঘরোল।

মেছোবিড়ালের গঠন, আচরণ ও বাসস্থান

আকারে বড়োসড়ো হুলোবিড়ালের দ্বিগুণ বা তারও বেশি। আর একসারি ছোটো খসখসে লোম শরীরকে রক্ষা করার জন্য। গায়ের রং মেটে ধূসর বা জলপাই রঙের সঙ্গে খয়েরি মেশানো। ধূসর রং-এর সারা গায়ে কালো লম্বায় ছোপ। আর মাথা থেকে ঘাড় পর্যন্ত 4-6 টি কালো ডোরা রেখা নেমে গেছে। বেঁটে মোটাসোটা লেজ বরাবর কালো দাগের পটি। সামনের পায়ের আঙুলের মাঝখানের চামড়া অনেকটা জোড়া মতন। খালবিল, ঝিল, বাদাবনের জলাভূমি থেকে ঝোপজঙ্গল বা ঘনজঙ্গল - সব জায়গাতেই এদের দেখা যায়। এরা নিশাচর। সাঁতারেও খুব দক্ষ। সাধারণত মাছ শিকার করলেও কাঁকড়া, শামুক, ইঁদুর বা পাখি খেয়ে পেট ভরায়।

মেছোবিড়ালের সংকট ও সংরক্ষণ

কিন্তু যেখানে এককালে ঝোপজঙ্গল বা খড়ি, নল, হোগলায় ভরা জলাভূমি ছিল, সেখানে তৈরি হয়েছে বড়োবড়ো রাস্তা, আবাসন প্রকল্প ও শপিং মল। কোথাও তৈরি হচ্ছে কলকারখানা আর ইটভাটা। ফলে হারিয়ে যেতে বসেছে বাঘরোলের বাসস্থান আর ক্রমশ কমছে তাদের প্রাকৃতিক খাবার। এর ফলে বাঘরোলরা কখনো-কখনো হাঁসমুরগির লোভে মানুষের বসতি এলাকায় চলে আসতে বাধ্য হয়। আর মানুষের হাতে মারাও পড়ে। এদের বাসস্থান সুরক্ষিত না হলে এবং এদের হত্যা করা সম্পূর্ণ বন্ধ না হলে বিপন্ন এই প্রাণীটি একদিন পৃথিবী থেকে হারিয়ে যেতে পারে।

গঙ্গার শুশুক

গঙ্গার শুশুকের বাসস্থান, স্বভাব ও গঠন

মিষ্টি জলের এই স্তন্যপায়ী প্রাণীর বাস গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদী আর তাদের উপনদীতে। লম্বা নাক (রস্ট্রাম) আর মুখ বন্ধ থাকা অবস্থাতেও ওপর আর নীচের চোয়ালে দৃশ্যমান দাঁত এদের সহজেই চিনিয়ে দেয়।

এদের চোখে কোনো লেন্স থাকে না। তাই এরা কার্যত অন্ধ। যদিও এরা আলোর দিক আর তীব্রতা বুঝতে পারে। তাহলে এরা আশেপাশে কী আছে বোঝে কী করে? খুব সম্ভবত নাসাগহ্বরে থাকা ডরসাল বার্সা নামের একটা যন্ত্রের সাহায্যে শুশুক একরকম শব্দ ছুড়ে দেয়। সেই শব্দ সামনে কোনো কিছুতে বাধা পেয়ে ফিরে এলে শুশুক সেই প্রতিধ্বনি শুনে বুঝতে পারে সামনে কতদূরে কোন ধরনের জিনিস আছে। এই পদ্ধতিকে বলা হয় ইকোলোকেশন (Echolocation)। বাদুড় বা চামচিকেরাও এই পদ্ধতিতে চলাফেরা করে বা শিকার ধরে। এছাড়াও শুশুকের ঘ্রাণশক্তি প্রবল।

এদের দেহ ধূসর বাদামি বা কুচকুচে কালো রঙের। দেহের মাঝখানটা মোটা, দু-প্রান্ত সরু আর সুচালো। এদের গায়ে লোম থাকে না। চামড়ার নীচে সঞ্চিত পুরু চর্বির স্তর (Blubber) জলের তলায় এদের শরীরকে গরম রাখে। ঘাড় না থাকায় এদের মাথা আর ধড় আলাদা করা যায় না। মুখের সামনে ঠোঁটদুটো অনেকটা চঞ্চুর মতো প্রলম্বিত। এদের প্রতিটি চোয়ালে 27-32 টা ছোটো দাঁত থাকে। শুশুকের দাঁতগুলো সব একই ধরনের। কাটা বা চিবোনোর জন্য আলাদা আলাদা ধরনের দাঁত থাকে না।

এদের নাকের ফুটো লম্বাটে, থাকে চঞ্চুর গোড়ায়। এরা নিজেদের ইচ্ছামতো এই ফুটো খুলতে আর বন্ধ করতে পারে। জলের ওপরে ভেসে উঠে বাতাস থেকে শ্বাস নেয়। শুশুকের সামনের পা দুটো ফ্লিপারে পরিণত হয়েছে। এগুলোর সাহায্যেই শুশুক জলে সাঁতার কাটে। এদের লেজটা ওপরে-নীচে চ্যাপটা।

বর্ষায় ভরা নদীতে উজান বেয়ে এরা ছোটো ছোটো উপনদীতে পৌঁছে যায়। আবার শুকনো মরশুমে নদীর মূল স্রোতে ফিরে আসে। এরা মাংসাশী। ইকোলোকেশনের সাহায্যে এরা নদীর তলায় কাদামাটিতে লুকিয়ে থাকা জীবদের শিকার করে। মাছ আর নানাধরনের জলজ অমেরুদণ্ডী প্রাণী যেমন চিংড়ি এদের খাবার। শিকারের সন্ধান পেলে লম্বা রস্ট্রাম দিয়ে এরা শিকার ধরে।

গঙ্গার শুশুকের সংকট ও সংরক্ষণ

মানুষের নানান কাজের জন্য এদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। নদীবাঁধ আর অন্যান্য নানা কারণে নদীর জলের গভীরতা কমে যাচ্ছে। নদীর মাঝে মাঝে বালির চর জেগে উঠে নদীকে ছোটো ছোটো অংশে ভেঙে দিচ্ছে। এর ফলে গঙ্গার শুশুকরা যাতায়াতের পথে বাধা পাচ্ছে। তাই এক শুশুক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য শুশুক গোষ্ঠীর যোগাযোগ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ফলে আলাদা আলাদা ছোটো ছোটো গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে যাওয়া শুশুকদের প্রজননে নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। শুশুকরা গঙ্গার এমন এক অঞ্চলে বাস করে, যার চারপাশ জুড়ে ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকা। তার ফলে নদীর জলে দূষণের সমস্যা বড়ো হয়ে দেখা দেয়। এছাড়াও গঙ্গার পাড়ে থাকা নানা রাসায়নিক কারখানা, তেল পরিশোধনাগার বা অন্যান্য কলকারখানার বর্জ্য থেকেও নদীর জল দূষিত হয়। জলদূষণের ফলে নদীতে মাছের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। আর খাবারের অভাবে বিপদে পড়ছে শুশুকরা। মাছ ধরার জালে আটকে পড়েও এরা মারা যায়।

গঙ্গার শুশুককে জাতীয় জলজ প্রাণী (National Aquatic Animal) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। 1991 সালে বিহারের সুলতানগঞ্জ আর কাহালগাঁও-এর মাঝে গঙ্গার 60 কিমি অঞ্চল জুড়ে গড়ে তোলা হয়েছে পৃথিবীর প্রথম শুশুক স্যাংচুয়ারি, বিক্রমশীলা গ্যাঙ্গেটিক ডলফিন স্যাংচুয়ারি (Vikramshila Gangetic Dolphin Sanctuary)। স্থানীয় জেলেদের মধ্যে শুশুক সংরক্ষণের সচেতনতা বাড়াতে প্রচার করা হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশের ব্রিজঘাট থেকে নারোরা মধ্যবর্তী গঙ্গার অঞ্চলকে শুশুক সংরক্ষণের জন্য 'রামসর স্থান'(Ramsar Site), অর্থাৎ সংরক্ষিত বিশেষ জলাভূমি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

একশৃঙ্গ গন্ডার

গন্ডারের স্বভাব, গঠন ও বাসস্থান

একশৃঙ্গ গন্ডার পৃথিবীর বিলুপ্তপ্রায় স্তন্যপায়ীদের অন্যতম। গন্ডারের দৃষ্টিশক্তি দুর্বল। কিন্তু ঘ্রাণশক্তি খুব প্রবল। কানের পাতা গোলমতো, ছড়ানো। এরা থাকে মূলত বন্যাবিধৌত-সমভূমি বা জলা জায়গার আশেপাশের লম্বা ঘাসের জঙ্গলে। গন্ডার সাধারণত একা থাকে। লম্বা ঘাসের জঙ্গল ঠেলে এরা এদের জল খাওয়ার জায়গা আর খাবার খাওয়ার জায়গার মধ্যে চলাফেরা করে। এই লম্বা ঘাসের জঙ্গল এদের সুরক্ষাও দেয়। এরা মূলত খুব ভোরে, সন্ধ্যায় বা রাতের দিকে চরে বেড়ায়। রোদ বেশি উঠে গেলে এরা গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেয়। বেশিরভাগ সময় এরা জল-কাদায় গড়াগড়ি দিয়ে সময় কাটায়। গন্ডারের গায়ের মোটা চামড়া প্রচণ্ড গরম থেকে তাকে বাঁচায়। আর তার গায়ের কাদার আস্তরণও তার দেহকে ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে। এই কাদার আস্তরণের আর একটা কাজও আছে। গন্ডারের চামড়ায় বাসা বাঁধা পোকামাকড় বা পরজীবীরাও ওই কাদার আস্তরণে চাপা পড়ে যায়।

এরা মূলত শাকাশী—লম্বা লম্বা ঘাস বা জলজ উদ্ভিদ, ছোটো ছোটো গাছপালা, লতাপাতা বা এমনকি ফলও এরা খায়। কোনো কারণে বিরক্ত হলে পূর্ণাঙ্গ পুরুষ গন্ডার পেছনদিকে প্রায় 3-4 মিটার দূর পর্যন্ত মূত্রত্যাগ করে। গন্ডারের নীচের চোয়ালের কৃন্তক (incisor) দাঁতটা খুব লম্বা হয়। এলাকা দখল বা অন্য কোনো কারণে অন্য গন্ডারের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় এই দাঁত গভীর ক্ষত সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে।

পুরুষ আর স্ত্রী গন্ডার দুজনেরই নাকের ওপরে চামড়ার ওপর প্রায় 60 সেন্টিমিটার লম্বা একটা খড়্গ বা শিং থাকে। গন্ডারের খড়্গ, কী দিয়ে তৈরি জানো? কেরাটিন দিয়ে। এই কেরাটিন হলো একধরনের প্রোটিন — যা দিয়ে আমাদের নখ আর চুল তৈরি হয়। জন্মের পর বাচ্চা গন্ডারের কিন্তু খড়্গ থাকে না। গন্ডারের 6 বছর বয়স থেকে এই খড়্গ আস্তে আস্তে দেখা দিতে থাকে। কোনো কারণে ভেঙে গেলে, আবার নতুন করে গন্ডারদের খড়্গ গজায়। গন্ডার তার খড়্গ ব্যবহার করে প্রধানত খাবারের খোঁজ করতে — মাটি খুঁড়ে গাছের মূলের খোঁজে। এছাড়াও প্রজনন ঋতুতে অন্য পুরুষ গন্ডারের সঙ্গে মারামারির সময়ও সে তার খড়্গ ব্যবহার করে।

গন্ডারের লোমহীন ধূসর রঙের চামড়ার ওপরটা ঢালের মতো খাঁজকাটা। দেখলে মনে হয় ঠিক যেন গায়ে একটা বর্ম পরে আছে। বর্মে তিনটে ভাঁজ দেখা যায়, ঘাড়ের চারপাশে, কাঁধের ঠিক পেছনে আর উরুর ঠিক সামনে। দেহের পাশের দিকে, চামড়ায় বড়ো বড়ো গুটি (tubercle) থাকে। দেহের কোনো কোনো জায়গায় চামড়া প্রায় 4 সেন্টিমিটার পর্যন্ত পুরু হয়। চামড়ার নীচে প্রায় 2-5 সেন্টিমিটার পুরু চর্বির স্তর থাকে। এদের সারা দেহে লোম না থাকলেও লেজের ডগায়, কানের আশেপাশে আর চোখের পাতায় লোম দেখা যায়। লোমগুলো কর্কশ প্রকৃতির।

গন্ডারের একটা অদ্ভুত অভ্যাস হলো একই জায়গায় মলত্যাগ করা। ফলে দিনের পর দিন এই মলের স্তূপের (Dunghill) উচ্চতা বাড়তে থাকে। মলস্তূপ উচ্চতা খুব বেশি হয়ে গেলে গন্ডার আর পুরোনো স্তূপে মলত্যাগ করতে পারে না। তখন সে কাছাকাছি জায়গায় একটা নতুন মলস্তূপ তৈরি করে। আর চোরাশিকারিরা গন্ডারের এই অভ্যাসেরই সুযোগ নেয়। গন্ডারের মলস্তূপের কাছেই তারা তাদের শিকারের অপেক্ষায় থাকে।

মলের স্তূপ

ঘাসজমির বাস্তুতন্ত্র ও গন্ডার

ঘাসজমির বাস্তুতন্ত্রের ওপর একশৃঙ্গ গন্ডারের নানা প্রভাব লক্ষ করা যায়।

1. খড়্গ দিয়ে মাটি খুঁড়ে ফেলার ফলে নতুন নতুন বীজ থেকে অঙ্কুরোদগমের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রাকৃতিক বনভূমি বা ঘাসজমির প্রাচুর্য ও প্রসার ঘটায়। তৃণভোজী নানা বন্যপ্রাণীর এবং তাদের খাদক শিকারী প্রাণীর খাদ্যসম্ভার বেড়ে যায়।

2. একশৃঙ্গ গন্ডার নানা গাছের ফল খায়। এরা একসঙ্গে এক জায়গায় মলত্যাগ করে। তারপর মল যখন অনেক উঁচু হয়ে যায় তখন খড়্গ দিয়ে তাকে সমান করে। এই মলে উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান খুব বেশি পরিমাণে থাকে। তাই ফল খাওয়ার 3-7 দিন পর যখন ওই মলের ওপর বীজগুলো পড়ে, স্বাভাবিকভাবেই তাদের অঙ্কুরোদগম ঘটে। ফলে ওই গাছগুলো অনেক দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ে। পাখিরা ওই মলমধ্যস্থ বীজগুলো যখন খাদ্যরূপে গ্রহণ করে এবং বহুদূরে মলত্যাগ করে, তখন নতুন নতুন জায়গায় বীজ থেকে গাছ হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

গন্ডারের সংকট ও সংরক্ষণ

একশৃঙ্গ গন্ডার প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রায় 35-45 বছর অবধি বাঁচে। এদের সংখ্যা কমে যাওয়ার পেছনে প্রধান কারণ হলো চোরাশিকার। গন্ডারের খড়্গের একটা উত্তেজক গুণ আছে — এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের জন্যই চোরাশিকারিদের লোভের শিকার হয় সে। যদিও এই বিশ্বাসের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। থাকার জায়গা বা বাসস্থান ধ্বংস হয়ে যাওয়াও এদের বিপন্নতার অন্যতম কারণ। গন্ডার সংরক্ষণের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গন্ডার শিকার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

একসময় সিন্ধু নদীর উপত্যকা থেকে মায়ানমারের উত্তর দিক পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে একশৃঙ্গ গন্ডারের দেখা পাওয়া যেত। বর্তমানে ভারতীয় উপমহাদেশে আসামের ব্রহ্মপুত্র নদীর অববাহিকা অঞ্চলে (মানস, কাজিরাঙা, পবিতোরা ইত্যাদি), পশ্চিমবঙ্গের দুটো ন্যাশনাল পার্ক (জলদাপাড়া, গোরুমারা), উত্তরপ্রদেশের দুধুয়া সংরক্ষিত অরণ্যে, আর নেপালের চিতওয়ান জাতীয় উদ্যানেই কেবল এদের দেখা পাওয়া যায়।

11 আমাদের চারপাশের পরিবেশ ও উদ্ভিদজগৎ

পরিবেশে গুরুত্বপূর্ণ কিছু গাছ

আমাদের চারদিকে আমরা যেসব গাছ দেখি, তাদের থেকে আমরা খাবার, ওষুধ, জামাকাপড় বা ঘরবাড়ি তৈরির উপকরণ জোগাড় করি। গাছ খাবার তৈরির সময় যে অক্সিজেন গ্যাস বাতাসে ছেড়ে দেয়, অন্যান্য জীবেরা শ্বাসকার্যের জন্য সেই গ্যাস ব্যবহার করে। গাছেরা জীবজন্তুর থাকার জায়গা আর খাবার হিসেবেও কাজ করে। এছাড়া পরিবেশ থেকে দূষক পদার্থ শুষে নিয়ে দূষণের মাত্রা কমায়, জমির সার তৈরি করে, এমনকি মাটির জৈব পদার্থের পরিমাণ বাড়াতেও সাহায্য করে। কোনো কোনো গাছের অংশ বা সমগ্র দেহ সার হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। পরিবেশের তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও বায়ুপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণেও গাছেরা নানা ভূমিকা পালন করে। নানা শিল্পের উপকরণরূপেও গাছের নানা অংশ ব্যবহৃত করা হয়।

বাঁশ

বাঁশ এক ধরনের বহুবর্ষজীবী, নিরেট পর্ব ও ফাঁপা পর্বমধ্যযুক্ত চিরসবুজ উদ্ভিদ। এদের কাণ্ড লম্বা নলের মতো এবং শাখাপ্রশাখার পরিমাণ কম। পৃথিবীতে যে সমস্ত গাছ খুব দ্রুত বাড়ে তাদের মধ্যে অন্যতম হলো বাঁশ। প্রতি 24 ঘণ্টায় কোনো কোনো বাঁশের প্রায় 100 সেমি বৃদ্ধি হয়। সব ঋতুতে এবং সমস্ত ভৌগোলিক অঞ্চলে এর বৃদ্ধির হার সমান নয়।

টুকরো কথা

অধিকাংশ বাঁশে অনিয়মিতভাবে ফুল আসে। অনেক বাঁশগাছে 65 বা 120 বছর অন্তর অন্তর ফুল ফোটে। বাঁশগাছে ফুল ফোটা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে নানা মত চালু আছে। কেউ কেউ বলেন যে পরিবেশগত প্রভাবে বাঁশগাছে যখন **বিপদ ঘন্টা** বাজতে থাকে, তখন বাঁশগাছ তার অঙ্গজ বৃদ্ধি বন্ধ করে জননগত বৃদ্ধি ঘটায়। তখন তার দেহের সমস্ত শক্তিকে ফুল ফোটানোর কাজে ব্যবহার করে। ফুল ফোটার পরই বাঁশগাছের মৃত্যু হয়। বাঁশ গাছে যখন **Mass flowering** ও ফল হওয়ার ঘটনা ঘটে তখন সেই অঞ্চলে ইঁদুর জাতীয় প্রাণীদের অত্যধিক হারে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। তারা তখন শস্যক্ষেত্রের, ও গুদামের শস্য খেয়ে ও শস্যহানি ঘটিয়ে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। আর টাইফাস, প্লেগ ও অন্যান্য ইঁদুরবাহিত রোগের সম্ভাবনাও বেড়ে যায় এবং এর থেকে মহামারি পর্যন্ত হতে পারে। অন্যদিকে প্রচুরসংখ্যক বাঁশের একসঙ্গে মৃত্যু ঘটার ফলে নতুন বাঁশ তৈরি না হওয়া পর্যন্ত স্থানীয় মানুষ আর এক সমস্যার মুখোমুখি হয়। ঘরবাড়ি তৈরির উপকরণ না পেয়ে বহু মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে।

বঙ্গোপসাগরের উপকূল বরাবর জন্মানো বাঁশের একটি প্রজাতি হলো *Melocanna bambusoides*। এতে প্রতি 30-35 বছর অন্তর অন্তর ফুল ফোটে ও ফল আসে। তখন এই ক্ষতিকারক প্রভাব লক্ষ করা যায়।

কী কী প্রয়োজনে বাঁশ ব্যবহার করা হয়?

i) বাঁশের নরম কাণ্ড, গোড়া আর পাতা হলো বিশ্বের বিপন্নতম প্রাণীগুলোর অন্যতম প্রধান খাদ্য। (চিনের জায়েন্ট পান্ডা, নেপালের ও ভারতের রেড পান্ডা এবং মাদাগাস্কারের লেমুর)। আফ্রিকার গরিলাদেরও অন্যতম প্রধান খাদ্য হলো এই বাঁশ। শিম্পাঞ্জি ও হাতিরাও বাঁশকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করে।

ii) লাওস, মায়ানমার, থাইল্যান্ড ও চিনের য়ুনান প্রদেশে জন্মানো বাঁশের গোড়ায় একধরনের পোকা জন্মায়। এরা বাঁশের নরম কাণ্ড খায়। আর স্থানীয় মানুষ এই পোকার লার্ভাদের খাদ্যরূপে গ্রহণ করে।

iii) বাঁশের গোড়া থেকে বেরোনো নতুন কচি কাণ্ড এশিয়ার বিভিন্ন দেশে অত্যন্ত সুস্বাদু খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। যদিও ব্যবহারের আগে এর মধ্যে থাকা অত্যন্ত বিষাক্ত পদার্থকে নিষ্কাশন করে দেওয়া হয়। বাঁশের এই নরম কচি কাণ্ড থেকে নানা পানীয় প্রস্তুত করা হয়।

iv) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা জায়গায় স্যুপকে গরম করা ও ভাত রান্নার পাত্ররূপে বাঁশের ফাঁপা কাণ্ডকে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া রান্নার কাজে বাঁশের তৈরি নানা উপকরণ ব্যবহার করা হয়।

v) ভারতবর্ষে বাঁশ কাগজ তৈরি, ঝুড়ি বা চুপড়ি, ছাতার বাট, ফুলদানি, ট্রে, বাঁশি, নানা ধরনের খেলনা এবং এমনকী ঘরসাজানোর কাজে ব্যবহার করা হয়।

vi) *Bambusa arundinacea* নামক বাঁশের পর্বমধ্যে সিলিকন ডাইঅক্সাইড ও সিলিসিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ 'তবাশির' (Tabashir) নামক এক গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ প্রস্তুত হয় যা হাঁপানি, সর্দিকাশি ও নানা সংক্রামক ব্যাধির চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়।

vii) দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার কোনো কোনো অঞ্চলে বাঁশ হলো মানুষের ঘরবাড়ি তৈরির অন্যতম উপকরণ। এছাড়া নদীর ওপর সাঁকো তৈরির কাজেও হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ বাঁশকে ব্যবহার করে চলেছে।

viii) বাঁশের তন্তুর ব্যাস 3 মিমি-র কম। তাই 'bamboo fabric'-কে ইদানীং জামাকাপড় তৈরির কাজেও ব্যবহার করা হচ্ছে।

কচুরিপানা

কচুরিপানা একটি জলে ভাসমান বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। প্রতিটি গাছে বছরে প্রায় 1000 -এর বেশি বীজ তৈরি হয় এবং এরা প্রায় 24 বছর বেঁচে থাকে। এর বংশবৃদ্ধির হার এতই বেশি যে মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে এদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়। উত্তর আমেরিকায় 1884 সালে যখন দক্ষিণ আমেরিকা থেকে একে প্রথম আনা হয়েছিল তখন প্রতি বর্গমিটারে জন্মানো 50 কেজি কচুরিপানার জন্য ফ্লোরিডার সমস্ত জল চলাচলের পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

যদি কচুরিপানার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ না করা হয়, তবে পুকুর ও হ্রদের জলকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ঢেকে দেয়। ফলে জলের প্রবাহ কমে যায়, অন্যান্য উদ্ভিদদের সূর্যের আলো পাওয়া থেকে বঞ্চিত করে এবং জলে অক্সিজেনের মাত্রা কমিয়ে দেয়। এতে জলে থাকা মাছ ও কচ্ছপদের মৃত্যু হয়। অতিসংখ্যায়

কচুরিপানার জঙ্গলে বংশবৃদ্ধি করে এডিস মশারা। একধরনের শামুক আছে যা মানুষের এক মারাত্মক কৃমিঘটিত রোগ ছড়ায়। এই শামুকও কচুরিপানার জঙ্গলে বাস করে। মানুষের নানাবিধ কার্যাবলির ফলে যেসব জলাশয়ে পুষ্টি পদার্থের জোগান বেড়ে যায় সেখানে কচুরিপানার বাড়বাড়ন্ত চোখে পড়ে। গ্রামগঞ্জের জলাশয়ে কচুরিপানার সংখ্যাবৃদ্ধি এক জ্বলন্ত সমস্যা।

মশার লার্ভা

কী কী প্রয়োজনে কচুরিপানা ব্যবহার করা হয়?

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কচুরিপানাকে নানাভাবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

i) ফিলিপিনস, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামে কচুরিপানার কাণ্ডকে এমব্রয়ডারির কাজে ব্যবহার করা হয় এবং বস্ত্রশিল্পের তন্তুর উৎসরূপে ব্যবহার করা হয়। শুকনো কাণ্ডকে ব্যবহার করে ঝুড়ি ও নানা ফার্নিচার বানানো হয়। কচুরিপানার তন্তুকে কাগজ তৈরির কাঁচামাল হিসেবেও ব্যবহার করা হয়।

ii) কচুরিপানায় নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশি থাকায় এটিকে বায়োগ্যাসের উৎসরূপে ব্যবহার করা হয়।

iii) কচুরিপানার সহ্যক্ষমতা অত্যধিক বেশি। ভারী ধাতুর শোধনক্ষমতা বেশি হওয়ায় বের হওয়া নোংরা দূষিত জল থেকে ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম, কোবাল্ট , নিকেল, লেড ও মার্কারির মতো ক্ষতিকারক ধাতুকে শোধন করতে পারে। ফলে জল দূষণমুক্ত ও ব্যবহার উপযোগী হয়।

iv) সোনার খনি অঞ্চলে জলে নির্গত সায়ানাইড শোষণ করে জলকে বিষমুক্ত করে। আর্সেনিকসমৃদ্ধ পানীয় জল থেকে কচুরিপানা আর্সেনিককে অপসারিত করে।

v) নাইট্রিফিকেশন পদ্ধতিতে নাইট্রোজেন আবদ্ধকরণে কচুরিপানার মূলে বসবাসকারী ব্যাকটেরিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

vi) কচুরিপানায় নাইট্রোজেন তথা প্রোটিনের পরিমাণ বেশি থাকায় পশুখাদ্য রূপে এর কদর ক্রমশ বেড়েছে। এর অতিরিক্ত ব্যবহার কিন্তু বিষক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। সার হিসেবেও একে নানা জায়গায় ব্যবহারের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হচ্ছে।

শাল

শাল একটি বহুবর্ষজীবী কাষ্ঠল, দ্বিবীজপত্রী ও বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ। এটি একটি পর্ণমোচী জাতীয় গাছ যা পরিণত হতে প্রায় 25 থেকে 30 বছর সময় নেয়। শালগাছের জঙ্গলে বাঘ, হাতি, চিতাবাঘ, ভালুক, বুনো খরগোশ, বুনো শুয়োর ইত্যাদি প্রাণী বেশি চোখে পড়ে ।

কী কী প্রয়োজনে শালগাছ ব্যবহার করা হয়?

i) **কাঠ** - খুঁটি, আসবাবপত্র, জানালা-দরজার কাঠের ফ্রেম, পাটাতন, নৌকা, জাহাজের জেটি, সেতু প্রভৃতি তৈরি করার জন্য শক্ত ও টেকসই কাঠ পাওয়া যায় শালগাছ থেকে। গাছ থেকে কাটার সময় কাঠের রং হালকা, আর কাঠ কেটে ফেলে রাখলে গাঢ় বাদামি রঙের হয়ে যায়। নির্মাণকাজে এই কাঠের চাহিদা আছে। কিন্তু এই কাঠ পালিশ করার উপযোগী নয়।

ii) **পাতা** - উত্তর আর পূর্ব ভারতে শালগাছের শুকনো পাতা দিয়ে থালা-বাটি, ঠোঙা তৈরি করা হয়। আর গ্রামাঞ্চলে জ্বালানি হিসেবে এর ব্যবহার হয়। ব্যবহৃত শালপাতা বা শালপাতার থালা গোরু-ছাগলের খাবার।

iii) **আঠা** - শালগাছের আঠা থেকে সুগন্ধযুক্ত লাল ধুনো পাওয়া যায় যা ধূপ তৈরিতে, কাঠের জোড়ের স্থানে প্রলেপ দেওয়ার কাজে, জুতো পালিশ ও অন্যান্য কাজে লাগে।

iv) **রজন** - গুঁড়ি থেকে প্রাপ্ত রজন স্পিরিট ও বার্নিশ তৈরির কাজে লাগে।

v) **ট্যানিন**- ছাল থেকে প্রাপ্ত ট্যানিন চর্মশিল্পে ব্যবহৃত হয় ।

vi) **শালবীজ**- বীজ থেকে নিষ্কাশিত তেল প্রদীপ জ্বালাতে রান্নার কাজে ও চকোলেট প্রস্তুত করার কাজে লাগে।

সুন্দরী

সুন্দরবনের লবণাক্ত অঞ্চলে মিষ্টি জলে সুন্দরী গাছ জন্মায়। নরম মাটিতে জন্মায় এই গাছ। এই গাছের চারপাশে মাটি ভেদ করে ছড়িয়েছিটিয়ে থাকে অসংখ্য ছোট্ট ছোট্ট মূল। প্রথমদিকে এরা বেশ নরম থাকলেও পরে শক্ত শক্ত সুচালো কাঠের মতো বেরিয়ে থাকে। এই মূলগুলো বাতাস থেকে অক্সিজেন নিয়ে সুন্দরী গাছকে বাঁচিয়ে রাখে। এই মূলগুলো সুন্দরীগাছের শ্বাসমূল। চিরসবুজ, লম্বা গাছগুলো সমুদ্রের কাছাকাছি থাকে। এই গাছকে লবণাম্বু বা ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ বলে। কাণ্ড বেশ শক্তপোক্ত তবে নরম মাটিতে আটকে থাকার জন্য কাণ্ডের নীচের দিক থেকে বাঁকাভাবে কিছু অস্থানিক মূল বেরিয়ে মাটিতে প্রবেশ করে। নরম মাটিতে গাছকে অবলম্বন দেয়। এই মূলগুলোকে ঠেসমূল বলে। পাতার ওপরের দিক সবুজ, চকচকে। নীচের দিক হালকা সবুজ। সুন্দরীগাছের ফল ডিমের মতো, তবে একটু লম্বাটে ধরনের। ফলের রং খয়েরি। প্রত্যেকটা ফলে একটা করে বীজ থাকে। ফলের মধ্যে থাকা বীজ থেকে নতুন চারা তৈরি হয়।

কী কী প্রয়োজনে সুন্দরীগাছ ব্যবহার করা হয়?

সুন্দরীগাছের কাঠ আসবাব, বাড়ি ও খুঁটি তৈরিতে কাজে লাগে। এছাড়া জ্বালানি হিসেবে এই কাঠ খুবই ব্যবহার করা হয়। গাছের ছালে থাকে প্রচুর ট্যানিন। যা চামড়া ও রং শিল্পে ব্যবহার করা হয়।

প্রচুর পরিমাণে সুন্দরীগাছ পাওয়া যেত বলেই সুন্দরবন নাম হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং বাসস্থানের জন্য এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে সুন্দরীগাছ কাটা পড়েছে। এছাড়াও জলে লবণের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। ফলে সুন্দরবনের সুন্দরীগাছ আজ দ্রুতহারে কমে যাচ্ছে যা নষ্ট করে দিচ্ছে সুন্দরবনের প্রকৃতিকে। এটি একটি বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ। তাই ঝড়খালিতে সুন্দরী গাছ প্রতিপালন ও সংরক্ষণকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। বর্তমানে আইন করে সুন্দরীগাছ কাটা বন্ধ করা হয়েছে।

মশলা ও গাছ

আমাদের প্রতিদিনের রান্না করা খাবারে এত সুন্দর স্বাদ, গন্ধ কীভাবে আসে বলোতো? কী এমন জিনিস মেশানো হয় রান্নার সময় যাতে আমাদের চিরপরিচিত নানারকম শাকসবজি, মাছমাংস নিত্যনতুন স্বাদ আর গন্ধ নিয়ে হাজির হয় আমাদের খাবার পাতে! সেই জিনিসটা হলো মশলা।

ইতিহাসের পাতা উলটে গেলে দেখতে পাওয়া যায় বিদেশিদের কাছে ভারত বললেই রাজামহারাজা, হিরে, মসলিন—এইসব জিনিসের সঙ্গেই ভেসে ওঠে ভারতীয় মশলার অনন্য স্বাদ,গন্ধ আর জাদুর গল্প। অতীতে রাজারাজড়াদের কাছে দামি হিরে মণি-মুক্তোর সঙ্গেই সমান আদর পেত নানান ধরনের মশলা। এইসব মশলার হালহকিকত গোপন রাখতে তাঁরা ছিলেন সদাতৎপর। এই মশলার খোঁজেই কত নতুন নতুন দেশ, নতুন নতুন জলপথের দরজা খুলে গেছে মানুষের কাছে।

গ্রিস আর রোমের যখন জন্মও হয়নি, তখনও ভারতীয় মশলা, সুগন্ধি আর সূক্ষ্ম কাপড় জাহাজে করে যেত মেসোপটেমিয়া, অ্যারাবিয়া আর মিশরে। যিশুখ্রিস্টের জন্মের অনেক আগে থেকেই গ্রিসের ব্যবসায়ীরা দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন বাজারে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকত। কেন বলোতো? সেখানকার বাজার থেকে তারা কিনত মশলা আর অন্যান্য মহার্ঘ জিনিস। ভারতীয় মশলা, সিল্ক আর অন্যান্য জিনিসের জন্য রোম খরচ করত প্রচুর অর্থ।

টুকরো কথা

1497 সালে সুদূর পোর্তুগালের লিসবন থেকে চারটে জাহাজ নিয়ে এশিয়ার মশলার দেশের খোঁজে বেরিয়েছিলেন ভাস্কো-দা গামা। 24000 মাইল পথ পেরিয়ে দু-বছর পরে দুটো জাহাজ খুইয়ে অবশেষে

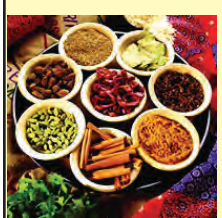

তিনি ভারতের খোঁজ পান। মাত্র ওই দুটো জাহাজে করেই তিনি যা মশলা আর অন্যান্য জিনিস দেশে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন, তাতেই নাকি তাঁর যাত্রার খরচের 60 গুণ বেশি অর্থ উঠে আসে! তোমরা হয়তো ভাবছ যে মশলার এত দাম! মধ্যযুগে এক পাউন্ড আদার দাম ছিলো 1 টা ভেড়ার দামের সমান। গোলমরিচ ছিল তখনকার যুগে সবচেয়ে দামি মশলা। প্রায় তিনশো বছর ধরে পোর্তুগাল, স্পেন, ফ্রান্স, হল্যান্ড (নেদারল্যান্ড) আর ব্রিটেন মশলার দেশগুলোর দখল নেবার জন্য লড়াই চালিয়ে গেছে।

কিন্তু তখনকার দিনে কী কাজে লাগত এই মশলা? খাবারের স্বাদ বাড়ানো ছাড়াও মশলা সংরক্ষকের কাজও করতো। তখন তো আর ফ্রিজ ছিল না। তাই ঘরে মাংস সংরক্ষণের কাজে মশলা ব্যবহার করা হতো। যেমন লবঙ্গতে আছে ইউজিনল নামে এক রাসায়নিক পদার্থ। এটির ব্যাকটেরিয়ানাশক ক্ষমতা আছে। এখনকার দিনেও কোনো কোনো দেশে শুয়োরের মাংস সংরক্ষণের জন্য লবঙ্গ ব্যবহার করা হয়। তখনকার দিনে বাইরের দেশে, মশলার অভাবে, শীতের জন্য খাবার সংরক্ষণ করতে না পারলে অভুক্ত থাকতে হতো। তবেই বুঝে দেখো, মশলার চাহিদা কেন এত বেশি ছিল! আজ আমরা সেই মশলার কথাই জানব। বলোতো মশলা আমরা কীভাবে পাই? কী মনে হয় তোমাদের? নীচে লিখে ফেলো।

আমরা মশলা কীভাবে পাই

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রায় 80 ধরনের মশলার চাষ হয়। আর শুধু ভারতেই প্রায় 50 ধরনের মশলার চাষ হয়। উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ থেকেই আমরা মশলা পাই। এসো একঝলকে দেখে নিই কোন কোন উদ্ভিদের অংশ থেকে আমরা কোন কোন মশলা পেয়ে থাকি।

উদ্ভিদ অংশ	মশলার নাম
1.গাছের ছাল	দারচিনি
2. মুকুল (অপ্রস্ফুটিত পুষ্পমুকুল)	লবঙ্গ
3. কন্দ	পিঁয়াজ, রসুন
4. ফুলের অংশ	জাফরান
5. ফল	গোলমরিচ, এলাচ, লঙ্কা
6. পাতা	তেজপাতা, পুদিনা
7. গ্রন্থিকাণ্ড	আদা, হলুদ
8. ক্ষরিত পদার্থ	হিং
9. বীজ	জোয়ান, মৌরি, ধনে, সরষে পোস্ত, মেথি
10. অন্তর্বীজ	জায়ফল

কী কাজে লাগে মশলা

এসো দেখে নেওয়া যাক মশলা আমাদের কী কাজে লাগে।

i) জোলো খাবারে স্বাদ আনতে সাহায্য করে।

ii) সংরক্ষকরূপে (আচার, চাটনি ইত্যাদিতে) কাজ করে।

iii) লালারসের ক্ষরণ বাড়িয়ে হজমে সাহায্য করে।

iv) মুখগহ্বরকে ক্ষতিকারক জীবাণুমুক্ত রাখতে সাহায্য করে।

এসো এবারে আমাদের চেনা কয়েকটা মশলার খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করা যাক।

গোলমরিচ (Black Pepper)

তুমি গোলমরিচ বা কালোমরিচ নিশ্চয়ই দেখেছ। নীচের সারণিটি পূরণ করো।

গোলমরিচ কেমন দেখতে	তোমার বাড়িতে কী কাজে লাগে

গোলমরিচ একটি বহুবর্ষজীবী লতাজাতীয় উদ্ভিদ। অন্যান্য গাছে ভর করে এটি বেড়ে ওঠে । ফল কাঁচা অবস্থায় সবুজ আর পেকে গেলে লালচে রঙের হয়। শুকিয়ে গেলে পাকা ফলের রং কালো হয়ে যায়। সেটাই মশলা হিসেবে খাওয়া হয়।

রান্নার কাজে মশলা হিসাবে ব্যবহার

গোলমরিচের তীক্ষ্ণ স্বাদের কথা তোমরা নিশ্চয়ই জানো। এই কারণেই হিন্দিভাষী মানুষরা একে তীখে বলেন। যাঁরা রান্নায় লঙ্কা খেতে চান না, তাঁরা রান্নায় ঝাল স্বাদ আনতে গোলমরিচ ব্যবহার করেন। গোলমরিচ গোটা অবস্থায় বা গুঁড়ো করে রান্নায় ব্যবহার করা হয়। তীক্ষ্ম স্বাদের জন্য দায়ী পিপেরাইন নামে একটা যৌগের উপস্থিতি। তোমার বাড়িতে বা বাড়ির বাইরে কোন কোন রান্নায় গোলমরিচ ব্যবহার করা হয় সেটা নীচের সারণিতে লিখে ফেলো।

বাড়িতে রান্না করা খাবারে	বাইরের খাবারে

অন্যান্য ব্যবহার

কাশি, দাঁতের ব্যথা, মাড়ি থেকে রক্ত পড়ায়, মাড়ির ব্যথায়, ডায়ারিয়া, বদহজম ও গ্যাসের সমস্যায় গোলমরিচ কাজে লাগে। মাংস এবং অন্যান্য খাবার যা তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় — এই ধরনের খাবারের ক্ষেত্রে গোলমরিচ সংরক্ষকের কাজ করে।

দারচিনি (Cinnamon)

দারচিনি দেখেছ? কেমন দেখতে বলতে পারো কিনা দেখোতো। আর বাড়িতে কী কাজে লাগে সেটাও লেখার চেষ্টা করো।

কেমন দেখতে	বাড়িতে কী কাজে লাগে

এটা একটা চিরহরিৎ উদ্ভিদ । দারচিনি গাছের কাণ্ডের ছালের ভেতরের স্তর (inner bark) শুকিয়ে তৈরি হয় দারচিনি। এই ছালের ধরনের ওপর নির্ভর করে দু-ধরনের দারচিনি পাওয়া যায়—মোটা ছাল আর পাতলা ছালের দারচিনি।

রান্নার কাজে ব্যবহার

দারচিনির নিজস্ব একটা সুগন্ধ আর স্বাদ আছে। তাই দারচিনি ছোটো ছোটো টুকরো করে বা গুঁড়ো করে নানারকম রান্নায় ব্যবহার করা হয়।

তুমি কোন কোন রান্নায় দারচিনি ব্যবহার হতে দেখেছ, লিখে ফেলো দেখি।

কোন কোন রান্নায় দারচিনি ব্যবহার করা হয়

অন্যান্য ব্যবহার

ডায়ারিয়া, বমিভাব, বমি, সর্দিতে দারচিনি থেকে উপকার পাওয়া যায়। দারচিনি থেকে যে উদ্‌বায়ী তেল পাওয়া যায়, সেটা বাতের ব্যথায় মালিশ করলে আরাম পাওয়া যায়।

প্রাচীনকালে দারচিনিকে এক অমূল্য মশলা বলে মনে করা হতো। ঐতিহাসিক প্লিনি লিখেছিলেন যে 327 গ্রাম (তখনকার এক রোমান পাউন্ড) দারচিনির দাম ছিল এক শ্রমিকের প্রায় দশ মাসের পারিশ্রমিকের সমান।

হলুদ (Turmeric)

তোমরা প্রত্যেকেই হলুদের সঙ্গে পরিচিত। নীচে সারণিতে লিখে ফেলো হলুদ কেমন দেখতে আর কী কী কাজে হলুদ ব্যবহার হতে তুমি দেখেছ।

গাছ	কেমন দেখতে	কী কাজে লাগে

হলুদ একটা বহুবর্ষজীবী বীরুৎজাতীয় উদ্ভিদ। হলুদের বায়বীয় কাণ্ড প্রায় নেই বললেই চলে। যেটুকু আছে তার প্রায় সবটাই পাতা দিয়ে ঢাকা। মাটির নীচে কাণ্ডের একটি অংশ, কন্দ থাকে।

রান্নার কাজে মশলা হিসাবে ব্যবহার

মাটির নীচে হলুদ গাছের হলুদ রঙের যে কন্দ পাওয়া যায় সেখান থেকেই বাণিজ্যিক হলুদ অর্থাৎ মশলার হলুদ তৈরি হয়। কন্দগুলোকে প্রায় 30-45 মিনিট জলে ফোটানো হয়। এরপর গরম ওভেনে শুকিয়ে নেওয়া হয়। তারপর এই শুকনো কন্দগুলোকে গুঁড়ো করা হয়।

বিভিন্ন সবজি, মাছ বা মাংস রান্নায় হলুদ ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও মাখন, চিজ, মার্জারিন, আচার আর সরষের স্বাদ ও রং আনতে হলুদ ব্যবহার করা হয়।

তোমার বাড়িতে কোন কোন রান্নায় হলুদ ব্যবহার করা হয় লিখে ফেলো।

বাড়িতে কোন কোন রান্নায় হলুদ ব্যবহার করা হয়

অন্যান্য ব্যবহার

হলুদে কারকিউমিন (Curcumin) নামের একটা যৌগ পাওয়া যায়। এই যৌগের উপস্থিতির জন্যই জীবাণুনাশক হিসাবে হলুদ ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাককে মেরে ফেলার ক্ষমতা রাখে। হলুদ যকৃতকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, আর্থ্রাইটিস, অ্যালার্জি, আলজাইমার রোগের চিকিৎসাতে কারকিউমিন কার্যকরী। শরীরের কোনো অংশে আঘাত লাগলে বা মচকে গেলে চুন-হলুদ লাগালে উপকার পাওয়া যায়। হলুদে লোহার পরিমাণ বেশি থাকায় এটি রক্তাল্পতায় ভালো কাজ করে। গবেষণায় দেখা গেছে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলুদ সক্ষম। ওষুধ আর বিভিন্ন খাবারে রং আনবার জন্যও হলুদ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

এলাচ (Cardamom)

এলাচ তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। এলাচ কেমন দেখতে হয় বলোতো? আর কী কাজেই বা লাগে এলাচ? নীচের পৃষ্ঠার সারণিতে লিখে ফেলো।

কেমন দেখতে	কী কী কাজে লাগে

এলাচ হলো একরকমের বহুবর্ষজীবী বীরুৎজাতীয় উদ্ভিদ। এর কাণ্ড থাকে মাটির নীচে। এলাচ প্রধানত দু-রকমের—বড়ো এলাচ আর ছোটো এলাচ। বড়ো এলাচ শুকোলে তামাটে রঙের হয়। এই ফলটাই এলাচ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আর ছোটো এলাচের ফলটা কৃত্রিমভাবে তাপে শুকোলে হালকা বাদামি রঙের হয়। গাছ থেকে তোলার সময় কেবলমাত্র এলাচের সেই ফলগুলোকেই বেছে নেওয়া হয় যেগুলো প্রায় পেকে উঠেছে। পুরোপুরি পাকা ফল নেওয়া হয় না। কারণ পাকা ফল শুকোনোর সময় ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বড়ো এলাচ

ছোটো এলাচ

রান্নার কাজে মশলা হিসাবে ব্যবহার

নানারকম তরকারিতে স্বাদ আর গন্ধ আনতে এলাচ ব্যবহার করা হয়। পায়েস আর অন্যান্য মিষ্টি খাবারেও এলাচের ব্যবহার আছে।

তোমার বাড়িতে কোন কোন রান্না করা খাবারে এলাচ ব্যবহার করা হয় নীচের সারণিতে লেখো।

কোন কোন রান্না করা খাবারে এলাচ ব্যবহার করা হয়

অন্যান্য ব্যবহার

গ্যাস বা পাকস্থলী সংক্রান্ত কোনো সমস্যায় এলাচের ব্যবহার আছে। পানের মধ্যে এলাচ দিয়ে খাওয়া হয়। খাওয়ার পরে মুখশুদ্ধি হিসেবেও খাওয়া হয়। বড়ো এলাচ দাঁতের মাড়ি সবল করে। বড়ো এলাচের দানা ভেঙে খেলে বমিভাব কমে যায়।

গরমমশলা

লবঙ্গ, এলাচ, দারচিনি, গোলমরিচ, জৈত্রী আর জায়ফল একসঙ্গে মিশিয়ে গরমমশলা তৈরি করা হয়। তবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে গরমমশলা তৈরির উপাদান অর্থাৎ মশলার পার্থক্য থাকে। নানারকম তরকারি, মাছ, মাংস ইত্যাদি রান্নায় স্বাদ আর গন্ধ আনতে গরমমশলা ব্যবহার করা হয়।

আদা (Ginger)

আদা কেমন দেখতে আর কী কাজে লাগে নীচের সারণিতে লেখো।

কেমন দেখতে	কী কী কাজে লাগে

আদা একটা বহুবর্ষজীবী বীরুৎজাতীয় উদ্ভিদ। কাণ্ড গ্রন্থিকাণ্ড প্রকৃতির, মাটির নীচে থাকে। আদা গাছের গ্রন্থিকাণ্ডটাই শুকিয়ে নিয়ে আদা হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

রান্নার কাজে মশলা হিসাবে ব্যবহার

বিভিন্ন রান্নায় পিঁয়াজ, রসুনের সঙ্গে আদা ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও কোনো কোনো পাঁউরুটি তৈরিতে আর বেকারিশিল্পেও আদার ব্যবহার আছে। সস তৈরিতেও আদা ব্যবহার করা হয়।

তোমার বাড়িতে আদা কোন কোন রান্নায় ব্যবহার করা হয় নীচে লেখো।

কোন কোন রান্নায় আদা ব্যবহার করা হয়

অন্যান্য ব্যবহার

পেটের অসুখ, অম্বল বা গ্যাসের সমস্যায়, কাশি ও হাঁপানিতে আদা কার্যকরী। খাওয়ার আগে বিশেষত বর্ষাকালে আর শীতকালে আদার কুচি নুন দিয়ে খেলে (আদা-নুন) মুখে খাওয়ার রুচি আসে, খিদে বাড়ে। আসলে আদা খেলে মুখে লালা তৈরি হয়। আর তোমরা তো জানো যে, লালারস খাবার হজম করতে সাহায্য করে।

রসুন (Garlic)

রসুন কেমন দেখতে আর কী কী কাজে লাগে নীচের সারণিতে লিখে ফেলো।

কেমন দেখতে	কী কী কাজে লাগে

এটা একটা বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ।

পিঁয়াজের মতো এরও কাণ্ড কন্দ জাতীয়। মাটির নীচে লম্বভাবে অবস্থান করে। রসুনের কন্দ 6-30 টা আরো ছোটো ছোটো কন্দের মতো অংশ নিয়ে তৈরি। এগুলো হলো রসুনের এক একটা কোয়া। এই গোটা অংশটা একটা সাদা বা হালকা গোলাপি কাগজের মতো খোসা দিয়ে ঢাকা থাকে।

রান্নার কাজে মশলা হিসাবে ব্যবহার

রসুন গাছের কন্দটাই রসুন হিসাবে ব্যবহার করা হয়। মাছমাংসসহ বিভিন্ন রান্নায় স্বাদ আনতে রসুন ব্যবহার করা হয়। কোনো কোনো পাঁউরুটি (গার্লিক ব্রেড) তৈরিতে রসুনের ব্যবহার আছে।

তোমার বাড়িতে কোন কোন রান্নায় রসুন ব্যবহার করা হয় নীচে লেখো।

তোমার বাড়িতে কোন কোন রান্নায় রসুন ব্যবহার করা হয়

অন্যান্য ব্যবহার

রসুনে থাকে অ্যালিসিন নামে এক যৌগ। এই যৌগের জীবাণুনাশক ক্ষমতা আছে। রসুন গ্যাস দূর করে। তাছাড়াও পাকস্থলীকে উদ্দীপিত করে খাবার হজম করতে সাহায্য করে। হৃৎপিন্ড ও রক্তনালীর নানা সমস্যায় রসুন কার্যকরী। রসুনের অ্যান্টিসেপটিক বা পচননিবারক ভূমিকাও আছে।

তোমার বাড়িতে নিশ্চয়ই আরো কিছু মশলা ব্যবহার করা হয়। নীচের সারণিতে তাদের নাম আর ব্যবহার লেখো।

মশলার নাম	ব্যবহার

ওষধি গাছ

আমাদের দেশে ওষুধ হিসেবে বিভিন্ন দেশীয় গাছ বা গাছের অংশ ব্যবহারের চল দীর্ঘদিনের। অথর্ববেদে বিভিন্ন গাছগাছড়ার ওষধি গুণের কথা বলা আছে। বেদ-পরবর্তী যুগে সুশ্রুতের লেখা সুশ্রুত-সংহিতায় প্রায় 700 ওষুধের কথা আছে। পরবর্তীকালে ওষধি গুণাগুণসম্পন্ন আরও অনেক গাছের কথা জানা গেছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেব মতো পৃথিবীর প্রায় 80% মানুষ তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নির্ভর করেন চিরাচরিত ওষুধের ওপর। এখনও পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মোট 20,000-এরও বেশি এমন গাছের কথা জানা গেছে, যাদের ওষধি গুণাগুণ আছে। তার মধ্যে এশিয়াতেই পাওয়া যায় প্রায় 8500 প্রজাতির গাছ। আমাদের দেশেই বর্তমানে প্রায় 3500 প্রজাতির ওষধি গাছের কথা জানা গেছে। এখানে আমাদের দেশে পাওয়া যায় এমন কয়েকটা ওষধি গাছ আর তাদের গুণাগুণের কথা আমরা আলোচনা করব।

নিম

নিম একটা মাঝারি ধরনের বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ। এই চিরহরিৎ উদ্ভিদ খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে।

তোমার অঞ্চলে নিমগাছের বিভিন্ন অংশ কীভাবে ব্যবহার করা হয় পরের পৃষ্ঠার সারণিতে লেখো।

গাছের অংশ	কী কাজে ব্যবহার করা হয়
(i) কান্ড	
(ii) পাতা	
(iii)	

ওষধি গুণ

(i) বহুমূত্র রোগের ক্ষেত্রে নিমপাতার রস খুবই উপকারী।

(ii) ভাইরাসজনিত মহামারি আর বাতে নিম বীজ কাজে লাগে।

(iii) কানের ব্যথায়, দাঁত আর দাঁতের মাড়ির ব্যথায় নিমতেল ব্যবহার করা হয়।

(iv) নিম গাছের মূল বা কাণ্ডের ছাল (বাকল) আর পাতা থেকে তেঁতো স্বাদের যে ওষুধ তৈরি হয়, সেটি বারে বারে ফিরে আসা জ্বর (যেমন — ম্যালেরিয়া) সারাতে কাজে লাগে। নানারকম চর্মরোগ সারাতেও এটি ব্যবহার করা হয়।

(v) বর্তমানে বহু প্রসাধনী জিনিসে (সাবান, শ্যাম্পু , দাঁতের মাজন, পাউডার) নিমজাত পদার্থ ব্যবহার করা হয়।

(vi) কীটনাশক ওষুধ হিসাবেও নিমতেলের ব্যবহার আছে।

(vii) নিমগাছের পাতা আর মূলের অ্যান্টিবায়োটিক অর্থাৎ জীবাণুনাশক ক্ষমতা স্বীকৃত।

(viii) নিমের তেল চুলের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে, যকৃতের কাজ করার ক্ষমতা বাড়াতে, রক্তকে পরিষ্কার রাখতে ব্যবহার করা হয়।

(ix) এছাড়া নিমজাত দ্রব্যের ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক আর পরজীবী কৃমি প্রতিরোধী গুণ আছে।

কচি ডালশুদ্ধ নিমপাতা জোগাড় করো। খবরের কাগজের মাঝে কয়েকদিন রেখে শুকিয়ে নিয়ে খাতায় আটকাও।

বেল

এটি একটি মাঝারি আকারের পর্ণমোচী উদ্ভিদ।

তোমার এলাকায় বেল বা বেলগাছের অংশ কোন কোন কাজে ব্যবহার করা হয় লেখো।

ওষধি গুণ

(i) বেলে থাকে মিউসিলেজ আর পেকটিন যা কোষ্ঠকাঠিন্যের অব্যর্থ ওষুধ।

(ii) বেলের শরবত আমাশয় রোগীদের অন্ত্রের যত্ন নেয়।

(iii) কাঁচা বা আধ-কাঁচা ফল খিদে ও হজমক্ষমতা বাড়ায়।

(iv) দীর্ঘস্থায়ী পেটের অসুখে বেল কার্যকরী।

(v) বর্তমানে বিভিন্ন পরীক্ষায় বেলের পাতা, ফল আর মূলের অ্যান্টিবায়োটিক বা জীবাণু-প্রতিরোধী ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

ছত্তিশগড়ের বস্তার অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে জ্বর হলে বেলগাছের মূলের ছাল থেকে তৈরি ওষুধ খাওয়ার চল আছে।

আমলকী

আমলকী একটা মাঝারি ধরনের পর্ণমোচী বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ।

আমলকী ফল নিশ্চয়ই দেখেছ। কেমন দেখতে আর কী কী কাজে লাগে লেখো।

আমলকী ফল কেমন দেখতে	আমলকী ফল কী কাজে লাগে

ওষধি গুণ

(i) আমলকী ফলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন C আছে। দাঁতের মাড়ি ফোলায় আমলকী ফল খুব কাজে আসে।

(ii) শুকনো আমলকী ফল পেটের গোলমাল, রক্তক্ষরণ আর আমাশয় বন্ধ করতে সক্ষম।

(iii) বমিভাব আর কোষ্ঠকাঠিন্যেও ভালো কাজ করে আমলকী।

(iv) আমলকী ফলের বীজ হাঁপানি, পিত্তরোগ আর ফুসফুসের প্রদাহে উপকারী।

(v) অ্যানিমিয়া, বার্ধক্য ও ক্যান্সার প্রতিরোধে আমলকী ফল কার্যকরী।

তোমার এলাকায় আমলকী ফল আর কী কী ভাবে ব্যবহার করা হয় লেখার চেষ্টা করো।

ত্রিফলা : ত্রিফলা হলো একধরনের আয়ুর্বেদিক ওষুধ। 'ত্রিফলা' কথাটার মানে তিনটে ফল। ত্রিফলায় থাকে সমপরিমাণে আমলকী, হরিতকি আর বহেড়া (বীজ ছাড়া)। ত্রিফলাচূর্ণ জোলাপের কাজ করে, যা আমাদের শরীরের পরিপাকনালীকে পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। ত্রিফলা রক্ত-পরিষ্কারক হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও ত্রিফলায় খুব বেশি পরিমাণে ভিটামিন C থাকে। তাই ত্রিফলাকে অনেকসময় সহযোগী খাদ্য হিসেবেও ব্যবহার করা হয়।

নয়নতারা

নয়নতারা একবর্ষজীবী বীরুৎজাতীয় উদ্ভিদ।

ওষধি গুণ

(i) নয়নতারা পাতা বহুমূত্র রোগের একটা ভালো ওষুধ।

(ii) মূত্র বৃদ্ধিকারক, আমাশয় প্রতিরোধক, রক্তক্ষরণ প্রতিরোধক গুণ আছে নয়নতারার।

(iii) রক্তার্শে আর বোলতার কামড়ে নয়নতারা পাতা ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।

(iv) এই গাছের মূলে থাকে রৌবেসিন (Raubasine) নামে একটি উপক্ষার। মস্তিষ্কের রক্ত সঞ্চালনে কোনোরকম বাধার সৃষ্টি হলে এই উপক্ষার তা দূর করতে সাহায্য করে।

(v) ভিনক্রিস্টিন (Vincristine) আর ভিনব্লাস্টিন (Vinblastine) নামের অন্য দুটো উপক্ষারও পাওয়া যায়

নয়নতারায়। ব্লাড ক্যানসার আর অন্যান্য কয়েক ধরনের ক্যানসারের মতো দুরারোগ্য রোগ নিরাময়ের জন্য বর্তমানে চিকিৎসাজগতে এই দুটি উপক্ষার ব্যবহার করা হচ্ছে। রক্তের ক্যানসার ছাড়াও টিউমার প্রশমনেও এই দুটি উপক্ষার বেশ কার্যকরী।

পুদিনা

পুদিনা একটা বহুবর্ষজীবী বীরুৎজাতীয় উদ্ভিদ।

ওষধি গুণ

(i) পুদিনার শরবত পেটের গোলমালে খুব উপকারী। এছাড়াও মূত্রের পরিমাণ বাড়াতে, বমিভাব দূর করতে পুদিনা সাহায্য করে।

(ii) পেট ফাঁপা, বদহজম, বাচ্চাদের পাতলা পায়খানা আর মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে পুদিনা কার্যকরী।

(iii) পুদিনা জীবাণুনাশক হিসাবেও কাজ করে।

(iv) কাশি, অরুচি ও পাকস্থলীর প্রদাহে পুদিনা উপকারী।

(v) পুদিনার প্রলেপ ব্যথার জায়গায় লাগালে বাতের যন্ত্রণা ও মাথাধরা কমাতে সাহায্য করে।

ঘৃতকুমারী

ঘৃতকুমারী হলো বহুবর্ষজীবী বীরুৎজাতীয় উদ্ভিদ।

ওষধি গুণ

(i) ভিটামিন, খনিজ মৌল, অ্যামাইনো অ্যাসিড ও ফ্যাটি অ্যাসিড ঘৃতকুমারী পাতার নির্যাসে পাওয়া যায়।

(ii) অ্যাসিডের আধিক্য, রক্তের ঘন হয়ে যাওয়ার প্রবণতা, দূষণজনিত চাপ ও অস্থিসন্ধির প্রদাহ কমাতে ঘৃতকুমারী পাতার নির্যাস ব্যবহার করা হয়।

(iii) গ্যাস্ট্রিক ক্ষত, কোষ্ঠকাঠিন্য, তেজস্ক্রিয় বিকিরণজনিত চামড়ার ক্ষতে ঘৃতকুমারী পাতার নির্যাস ব্যবহার করা হয়।

(iv) ঘৃতকুমারীর নির্যাসে অ্যান্টিপাইরেটিক উপাদান থাকায় জ্বর হলে তাপমাত্রা কমাতে এটি ব্যবহৃত হয়।

(v) ঘৃতকুমারীর পাতার নির্যাসে প্রায় 99% জল থাকে। তাই চামড়াকে আর্দ্র করতে, স্থিতিস্থাপকতা বাড়াতে এই নির্যাস ব্যবহার করা হয়। এই নির্যাস ব্যবহার করলে চামড়ায় রক্ত ও অক্সিজেন সরবরাহ বৃদ্ধি পায়। ত্বকের কলাকোশের শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা ও সংশ্লেষ -ক্ষমতা বাড়ে। ফলে ত্বক শিথিল হয় না।

(vi) মানসিক চাপ ও উদ্‌বেগ কমাতে ঘৃতকুমারী পাতার নির্যাস ব্যবহার করা হয়।

পরিবেশ ও বিজ্ঞান

পাঠ্যসূচি

1.1 বল ও চাপ
- ক) বলের পরিমাপ ও একক
- খ) ঘর্ষণ ও তার পরিমাপ
- গ) তরলের ঘনত্ব ও চাপ
- ঘ) তরলের চাপ
- ঙ) বায়ুর চাপ
- চ) বস্তুর ভাসন, প্লবতা ও আর্কিমিদিসের নীতি

1.2 স্পর্শ ছাড়া ক্রিয়াশীল বল
- ক) অভিকর্ষ ও মহাকর্ষ
- খ) অভিকর্ষ ও মহাকর্ষের প্রভাবে গতি
- গ) স্থির তড়িৎ বল ও আধানের ধারণা
- ঘ) তড়িৎ বলের প্রভাবে গতি

1.3 তাপ
- ক) তাপের পরিমাপ ও একক
- খ) অবস্থার পরিবর্তন ও লীনতাপের ধারণা
- গ) তাপের প্রবাহ পরিবহণ, পরিচলন ও বিকিরণ

1.4 আলো
- ক) প্রতিবিম্ব
- খ) আলোর প্রতিসরণের সূত্র

2.1. পদার্থের প্রকৃতি
- ক) পদার্থের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম
- খ) ধাতু ও অধাতুর বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার
- গ) মানবজীবনে ও পরিবেশে ধাতু ও অধাতুর ব্যবহার

2.2. পদার্থের গঠন
- ক) পরমাণু ও অণুর ধারণা
- খ) পদার্থের বিভিন্ন অবস্থা
- গ) যোজ্যতা ও রাসায়নিক বন্ধন

2.3 রাসায়নিক বিক্রিয়া
- ক) রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রভাবক
- খ) অনুঘটক
- গ) তাপগ্রাহী ও তাপমোচী পরিবর্তন
- ঘ) জারণ বিজারণের ধারণা

2.4. তড়িতের রাসায়নিক প্রভাব
তড়িৎ বিশ্লেষণ ও তড়িৎলেপন

3. কয়েকটি গ্যাসের পরিচিতি
- ক) পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি
- খ) অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন

4. প্রকৃতিতে ও জীবজগতে বিভিন্নরূপে কার্বন যৌগের অবস্থান
- ক) প্রকৃতিতে ও জীবজগতে কার্বন যৌগের অবস্থান
- খ) বহুরূপতা
- গ) জ্বালানি মূল্য বা ক্যালোরি মূল্য
- ঘ) কার্বন ডাইঅক্সাইড
- ঙ) গ্রিনহাউস এফেক্ট
- চ) কার্বনঘটিত পলিমার ও তার ব্যবহার

5. প্রাকৃতিক ঘটনা ও তার বিশ্লেষণ
- ক) বজ্রপাত
- খ) মহামারি

6. জীবদেহের গঠন
- ক) জীবদেহ গঠনের ধাপসমূহ
- খ) মাইক্রোস্কোপ
- গ) কোশের বৈচিত্র্য
- ঘ) বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কার্য ও কোশীয় বিশেষত্ব
- ঙ) প্রাণী ও উদ্ভিদদেহে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া ও কোশীয় অঙ্গাণু
- চ) বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশ ও কোশের ওপর প্রভাব

7. অণুজীবের জগৎ
- ক) অণুজীবের বৈচিত্র্য
- খ) জীবজগতের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্ক (পরজীবী, মিথোজীবী ও মৃতজীবী)
- গ) পরিবেশে অণুজীবের ভূমিকা (কৃষি,খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ, ওষুধ প্রস্তুতি, বর্জ্য পরিষ্কার)

8. মানুষের খাদ্য ও খাদ্য উৎপাদন
- ক) ফসল, ফসলের বৈচিত্র্য ও ফসল উৎপাদন
- খ) উদ্ভিদজাত খাদ্য চাষের বিভিন্ন পদ্ধতি
- গ) প্রাণীজ খাদ্য চাষের বিভিন্ন পদ্ধতি

9. অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি ও বয়ঃসন্ধি
- ক) অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি
- খ) বয়ঃসন্ধি

10. জীববৈচিত্র্য, পরিবেশের সংকট ও বিপন্ন প্রাণী সংরক্ষণ
- ক) বন
- খ) সমুদ্রের নীচের জীবন
- গ) মরু অঞ্চলের জীবজগৎ
- ঘ) মেরু অঞ্চলের জীবজগৎ
- ঙ) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ
- চ) কয়েকটি বিপন্ন বন্যপ্রাণী ও তাদের সংরক্ষণ

11. আমাদের চারপাশের পরিবেশ ও উদ্ভিদজগৎ
- ক) পরিবেশে গুরুত্বপূর্ণ কিছু গাছ
- খ) মশলা ও গাছ
- গ) ওষধি গাছ

তিনটি পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পাঠ্যসূচি

প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: (প্রত্যেক বিষয় থেকে 5 নম্বর নিয়ে প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হবে)

1.	ভৌত পরিবেশ— 1.1 বল ও চাপ (1-16)	5
	1.2 স্পর্শ ছাড়া ক্রিয়াশীল বল (17-28)	
2.	মৌল, যৌগ ও—2.1 পদার্থের প্রকৃতি (54-78)	5
	—2.2 পদার্থের গঠন (79-91)	
3.	দেহের গঠন — (173-190)	5

দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: (প্রত্যেক বিষয় থেকে 5 নম্বর নিয়ে প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হবে)

1.	ভৌত পরিবেশ—1.3 তাপ	5
2.	মৌল, যৌগ ও রাসায়নিক বিক্রিয়া—2.3 রাসায়নিক বিক্রিয়া (92-109)	5
	—2.4 তড়িতের রাসায়নিক প্রভাব (110-117)	5
5.	প্রাকৃতিক ঘটনা ও তার বিশ্লেষণ (160-172)	5
8.	মানুষের খাদ্য ও খাদ্য উৎপাদন (202-223)	5

তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন :

1.	ভৌত পরিবেশ 1.4 আলো (46-53)	7
3.	কয়েকটি গ্যাসের পরিচিতি (118-133)	7
4.	কার্বন ও কার্বনঘটিত যৌগ (134-159)	7
7.	অণুজীবের জগৎ (191-201)	7
9.	অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি ও বয়ঃসন্ধি (224-242)	7
10.	পরিবেশের সংকট ও সংরক্ষণ (243-279)	7
11.	আমাদের চারপাশের পরিবেশ ও উদ্ভিদ জগৎ (280-293)	7

বিশেষ মন্তব্য : তৃতীয় পর্যায় ক্রমিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অংশগুলির সঙ্গে প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের অন্তর্গত বল ও চাপ; পদার্থের গঠন ও দেহের গঠন অধ্যায়গুলি অন্তর্ভুক্ত হবে। সংযোজিত অংশটি ধরে প্রতিটি বিষয় অবলম্বনে 7 নম্বরের প্রশ্নপত্র মূল্যায়নের জন্য তৈরি করতে হবে। সেক্ষেত্রে অধ্যায় ও তা থেকে তৈরি করা প্রশ্নের মূল্যায়নের সারণিটি হবে নিম্নরূপ :

অধ্যায়	প্রশ্নের মূল্যমান
1.1. বল ও চাপ	7
1.4. আলো	7
2.2 পদার্থের গঠন	7
3. কয়েকটি গ্যাসের পরিচিতি	7
4. কার্বন ও কার্বনঘটিত যৌগ	7
6. দেহের গঠন	7
7. অণুজীবের জগৎ	7
9. অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি ও বয়ঃসন্ধি	7
10. পরিবেশের সংকট ও সংরক্ষণ	7
11. আমাদের চারপাশের পরিবেশের ও উদ্ভিদ জগৎ	7

প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের জন্য সক্রিয়তামূলক কার্যাবলী	প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নে ব্যবহৃত সূচকসমূহ
1) সারণি পূরণ 2) ছবি বিশ্লেষণ 3) তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ 4) দলগত কাজ ও আলোচনা 5) কর্মপত্র পূরণ ও সমীক্ষার বিবরণ 6) সঙ্গী মূল্যায়ন ও স্ব-মূল্যায়ন 7) হাতের কাজ ও মডেল প্রস্তুতি 8) ক্ষেত্র সমীক্ষা (Field work)	i) অংশগ্রহণ ii) প্রশ্ন ও অনুসন্ধান iii) ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের সামর্থ্য iv) সমানুভূতি ও সহযোগিতা v) নান্দনিকতা ও সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ

প্রশ্নের নমুনা

(এই ধরনের নমুনা অনুসরণ করে পার্বিক মূল্যায়নের প্রশ্নপত্র তৈরি করা যেতে পারে। প্রয়োজনে অন্যান্য ধরনের প্রশ্নও ব্যবহার করা যেতে পারে। কী কী ধরনের প্রশ্ন করা যেতে পারে তার কিছু নমুনা দেওয়া হলো।)

1. সঠিক উত্তর নির্বাচন করো : (প্রতিটি প্রশ্নের জন্য 1 নম্বর)

i) তরলের চাপ ক্রিয়া করে — a) শুধু নীচের দিকে b) শুধু পাশের দিকে c) শুধু উপরের দিকে d) সবদিকে সমানভাবে।

ii) একটা ছোটো বস্তুকে কিছুটা উপর থেকে ফেলে দিলে। বস্তুটা নীচের দিকে পড়বে। তাহলে — a) বস্তু পৃথিবীকে বেশি বলে আকর্ষণ করবে b) পৃথিবী বস্তুকে বেশি বলে আকর্ষণ করবে c) বস্তু ও পৃথিবী দুজনেই দুজনকে সমান বলে আকর্ষণ করবে d) উপরের কোনোটাই ঠিক নয়।

iii) সিসা ও টিন মিশিয়ে ফিউজ তার তৈরি করা হয় কারণ তাতে — a) পরিবাহী তারের রোধ কমে b) পরিবাহী তারের গলনাঙ্ক সিসা ও টিন উভয়ের গলনাঙ্কের চেয়ে কমে c) পরিবাহী তার আরও শক্ত হয় d) সিসা ও টিন সহজে পাওয়া যায়।

iv) দুটি আয়নাকে এমনভাবে রাখা হলো যাতে তাদের মধ্যবর্তী কোণ হয় 60^0। আয়না দুটির মাঝখানে একটি বস্তু রাখলে মোট প্রতিবিম্বের সংখ্যা হবে — a) 3টে b) 4টে c) 5টা d) 6টা।

v) টেবিলের ওপর একটি বই স্থির অবস্থায় রয়েছে। বইটি স্থির থাকার কারণ — a) বইটির ওপর কোনো বল কাজ করছে না। b) বইটির ওজন ও টেবিলের লম্ব প্রতিক্রিয়া পরস্পর সমমানের ও পরস্পরের বিপরীতমুখী। c) বইটির তলদেশে টেবিলের দেওয়া কোনো ঘর্ষণ বল কাজ না করার জন্য। d) বস্তুর ওজন টেবিলের লম্ব প্রতিক্রিয়ার চেয়ে বেশি।

vi) যদি বায়ুতে কোনো বস্তুর ওজন W_1 ও তরলে নিমজ্জিত হলে তার ওপর ক্রিয়াশীল প্লবতা W_2 হয়, নীচের কোনটি ভাসনের শর্ত?— a) $W_1 > W_2$ b) $W_1 = W_2$ c) $W_1 < W_2$ iv) $W_1 \neq W_2$ হলেই চলবে।

vii) একটা ক্যাম্বিস বলকে ওপর থেকে ছেড়ে দিলে তা পৃথিবীর টানে নীচের দিকে নেমে আসে। কিন্তু পৃথিবী ও বস্তু পরস্পরকে সমান বলেই আকর্ষণ করে। তাহলে ক্যাম্বিস বলই কেন পৃথিবীর দিকে ধাবিত হয়, উলটো হয় না কেন? — a) কারণ ক্যাম্বিস বলটির টানে পৃথিবীতে সৃষ্ট ত্বরণ। পৃথিবীর টানে ক্যাম্বিস বলটিতে সৃষ্ট ত্বরণের চেয়ে বেশি। b) কারণ পৃথিবীর টানে বস্তুতে সৃষ্ট ত্বরণ, ক্যাম্বিস বলটির টানে পৃথিবীতে সৃষ্ট ত্বরণের চেয়ে বেশি c) কারণ উল্লেখিত উভয় ত্বরণই সমমানের d) ক্যাম্বিস বলটির টানে পৃথিবীতে কোনো ত্বরণ সৃষ্টি হয় না।

viii) একটা টেস্টটিউবে জিঙ্ক ও লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় একটা বর্ণহীন গ্যাস উৎপন্ন হলো যা শব্দসহ নীল শিখায় জ্বলে উঠে নিভে যায়। গ্যাসটা হলো— (a) অক্সিজেন (b) নাইট্রোজেন (c) কার্বন ডাইঅক্সাইড (d) হাইড্রোজেন

ix) জলের মধ্যে পোড়াচুন দিলে প্রচুর স্টিম উৎপন্ন হয় কারণ— (a) পোড়াচুন খুব গরম পদার্থ (b) পোড়াচুনের সঙ্গে জলের বিক্রিয়া তাপগ্রাহী বিক্রিয়া (c) পোড়াচুনের সঙ্গে জলের বিক্রিয়া তাপমোচী বিক্রিয়া (d) এদের কোনোটিই নয়।

x) নীচের কোনটি তড়িৎবিশ্লেষ্য— (a) চিনি (b) অ্যালকোহল (c) গ্লুকোজ (d) নুন

xi) নীচের কোন্ অক্সাইডটি উভধর্মী — (a) কার্বন ডাইঅক্সাইড (b) ক্যালশিয়াম অক্সাইড (c) সালফার ডাইঅক্সাইড (d) জিঙ্ক অক্সাইড

xii) কোন্‌টি অক্সিজেনের বৃহৎ শিল্পব্যবহার— (a) অ্যামোনিয়া তৈরি (b) ইউরিয়া তৈরি (c) সোডা তৈরি (d) ইস্পাত তৈরি

xiii) ডেঙ্গি রোগের জীবাণু বহন করে যে প্রাণী সেটি হলো— (a) অ্যানোফিলিস মশা (b) কিউলেক্স মশা (c) এডিস মশা (d) মাছি

xiv) DOTS পদ্ধতিতে যে রোগের চিকিৎসা করা হয় সেটি হলো — (a) কালাজ্বর (b) স্মল পক্স (c) হেপাটাইটিস (d) যক্ষ্মা

xv) গলজি বস্তু সৃষ্টি হয় যে অঙ্গাণু থেকে সেটি হলো —(a) এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা (b) রাইবোজোম (c) কোশপর্দা (d) লাইসোজোম

xvi) প্রোটিন তৈরি করতে সাহায্য করে— (a) গলজি বস্তু (b) সাইটোপ্লাজম (c) লাইসোজোম (d) রাইবোজোম

xvii) জিয়ার্ডিয়াসিস রোগটি হলো — (a) ব্যাকটেরিয়াঘটিত (b) ছত্রাকঘটিত (c) ভাইরাসঘটিত (d) আদ্যপ্রাণীঘটিত

xviii) খারিফ ফসলের একটি উদাহরণ হলো— (a) গম (b) ভুট্টা (c) ছোলা (d) সরষে

xix) কৃত্রিম পদ্ধতিতে মাছের ডিমপোনা তৈরি করতে যে গ্রন্থির নির্যাস ব্যবহার করা হয় সেটি হলো— (a) অগ্ন্যাশয় (b) পিট্যুইটারি (c) শুক্রাশয় (d) থাইরয়েড

x) ইনসুলিন ক্ষরিত হয় যে গ্রন্থি থেকে সেটি হলো — (a) অগ্ন্যাশয় (b) থাইরয়েড (c) অ্যাড্রিনাল (d) পিট্যুইটারি

xi) নালিপদের সাহায্যে চলাফেরা করে এমন একটি প্রাণী হলো — (a) হাঙর (b) সাগরকলম (c) তারামাছ (d) অক্টোপাস

xii) সুন্দরবন হলো একটি— (a) অভয়ারণ্য (b) ন্যাশনাল পার্ক (c) সংরক্ষিত বন (d) বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ

xiii) কারকিউমিন যৌগটি পাওয়া যায় যে মশলায় সেটি হলো — (a) দারচিনি (b) হলুদ (c) রসুন (d) আদা

xiv) আদ্যপ্রাণীর দেহে কোষের সংখ্যা— (a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4

xv) আমেরিকার মরু অঞ্চলে রেড ইন্ডিয়ানরা পাথরের তৈরি যে বাড়িতে থাকে তার নাম —(a) ইগলু (b) পুয়েবলা (c) তাঁবু (d) ঝুপড়ি

2. ঠিক বাক্যের পাশে '✓' আর ভুল বাক্যের পাশে 'x' দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের জন্য 1 নম্বর)

i) ম্যালেরিয়া কথাটির অর্থ হলো খারাপ বায়ু। ☐ ii) যক্ষ্মা বায়ুবাহিত মারণরোগ। ☐ iii) মাইটোকনড্রিয়ার বহিঃপর্দা ভাঁজ হয়ে ক্রিস্টি গঠন করে। ☐ iv) খুব শুকনো ও ঠান্ডা পরিবেশে বসবাসকারী প্রাণীদের কোষে অ্যান্টিফ্রিজ প্রোটিন থাকে। ☐ v) থার্মোফিলিক ব্যাকটেরিয়া (100^0C) তাপমাত্রার কাছাকাছি তাপমাত্রায় বংশবৃদ্ধি করে। ☐ vi)ক্লোরোমাইসেটিন হলো একধরনের অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ। ☐ vii) অজৈব সার মাটির জলধারণ ক্ষমতা বাড়ায়। ☐ viii) আউস ধান জমিতে একেবারে সরাসরি বোনা হয়। ☐ ix) মাইনর কার্পের উদাহরণ হল মৃগেল। ☐ x) মেয়েদের শরীরে থাকা জনন গ্রন্থির নাম হলো শুক্রাশয়। ☐ xi) আত্মসচেতনতা হল জীবনকুশলতা চর্চার একটি অন্যতম দিক। ☐ xii) কেল্প হলো খুব বড়ো সামুদ্রিক শ্যাওলা। ☐ xiii) মরুভূমির মেশকুইট গাছে পাতা থাকে না। ☐ xiv) গন্ডারের খড়্গ তৈরি হয় কেরাটিন দিয়ে। ☐ xv) হলুদ একটা চিরহরিৎ উদ্ভিদ। ☐ xvi) আমলকী ফলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন C আছে। ☐

3. শূন্যস্থান পূরণ করো : (প্রতিটি শূন্যস্থান পূরণের জন্য 1 নম্বর)

i) একটি চোঙাকৃতির ড্রামের তলদেশে ড্রামটিতে অবস্থিত জলের চাপ _____ হয়ে যাবে যদি ড্রামের জল অর্ধেক বের করে নেওয়া হয়। ii) জলে ভাসমান অবস্থায় একটি বস্তুর ওজন 12N। তাহলে ঊর্ধ্বমুখী প্লবতা_____N । iii) অভিকর্ষজ ত্বরণ বস্তুর _____ নিরপেক্ষ। iv) কোন পরমাণু থেকে একটি ইলেকট্রন বার করে নিলে তা _____ হয়ে পড়বে। v) তুমি আয়নার দিকে 3 m সরে এলে তোমার প্রতিবিম্ব তোমার দিকে _____ m সরে আসবে। vi) পেরিস্কোপে আলোর _____ধর্মকে কাজে লাগানো হয়। vii) দুটি মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক সমান হলে আপতিত ও প্রতিসৃত রশ্মির মধ্যে কোণের মান হবে _____। viii) বিশুদ্ধ বরফ অপেক্ষা নুন মেশানো বরফের গলনাঙ্ক_____। ix) শীতকালে একটা মোটা জামার চেয়ে দুটি পাতলা জামা পরলে শরীর বেশি _____ থাকে। x) ইগলু বরফ দিয়ে বানানো হয় কারণ বরফ তাপের_____। xi) মরীচিকা_____প্রতিবিম্বের উদাহরণ। xii) সাধারণত: ধাতুর তাপ পরিবাহিতা অধাতুর চেয়ে _____ যদিও _____ এবং _____ অধাতু দুটো এই বিবৃতির ব্যতিক্রম: xiii) সোনার প্রসারণশীলতা লোহার চেয়ে _____ বলেই সোনার সূক্ষ্ম তার তৈরি করা সম্ভব হয়; xiv)

মৌল অণুর কল্পনা করেন _____ । xv) প্রাচীন গ্রিসে _____ ও _____ পরমাণুর অস্তিত্ব কল্পনা করেছিলেন xvi) $^{206}_{82}Pb$ পরমাণুতে প্রোটন , ইলেকট্রন ও নিউট্রনের সংখ্যা যথাক্রমে _____ , _____ , ও _____ । xvii) $^{14}_{7}N$ ও $^{14}_{6}C$ পরস্পরের _____ । xviii) সূর্যালোকের _____ রশ্মিই প্রধানত তাপের অনুভূতি সৃষ্টি করে। xix) _____ অক্সাইড ধাতুর অক্সাইড হলেও উভধর্মী প্রকৃতির। xx) কঠিন বিক্রিয়কের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পেলে রাসায়নিক বিক্রিয়ার বেগ _____ । xxi) হাইড্রোজেনের সর্ববৃহৎ শিল্পব্যবহার হলো _____ তৈরি। xxii) জলের তড়িৎবিশ্লেষণে _____ ও _____ গ্যাস পাওয়া যায়। xxiii) $ZnO + C \rightarrow Zn + CO$ বিক্রিয়ায় _____ জারিত ও _____ বিজারিত হয়েছে। xxiv) ঘৃতকুমারীর নির্যাসে _____ উপাদান থাকায় জ্বর হলে তাপমাত্রা কমাতে ব্যবহার করা হয়। xxv) দারচিনি গাছের _____ থেকে পাওয়া যায়। xxvi) সুন্দরী হলো একধরনের _____ উদ্ভিদ। xxvii) ব্যথা কমানোর ওষুধ _____ শকুনের বৃক্ককে নষ্ট করে দেয়। xxviii) _____ মেরুতে পেঙ্গুইনদের দেখা যায়। xxix) তারামাছের বাহুর সংখ্যা _____ । xxx) টেস্টোস্টেরন _____ গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হয়। xxxi) গোল্ডেন রাইসে _____ ভিটামিনের পরিমাণ বেশি। xxxii) _____ ব্যাকটেরিয়া দই তৈরিতে সাহায্য করে। xxxiii) ক্ল্যামাইডোমোনাস হল এককোশী _____ । xxxiv) প্রাণীকোশের বিভাজনে অংশগ্রহণ করে _____ নামক অঙ্গাণু । xxxv) কালাজ্বরের আরেক নাম _____ জ্বর। xxxvi) _____ ব্যাকটেরিয়া বর্জ্যকে ভেঙে মিথেন গ্যাস তৈরি করে।

4. স্তম্ভগুলোর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করো : **(প্রতিটি সম্পর্ক স্থাপনের জন্য 1নম্বর)**

(নমুনা হিসাবে একটি করে দেওয়া হলো)

I.

'A' স্তম্ভ	'B' স্তম্ভ	'C' স্তম্ভ
i) সংকট কোণ	a) পৃথিবীর টান	1) বিকিরণ
ii) সমসংখ্যক প্রোটন ও ইলেকট্রন	b) ঊর্ধ্বমুখী বল	2) মরীচিকা
iii) তাপের সঞ্চালন	c) অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন	3) অভিকর্ষ বল
iv) বস্তুর ওজন	d) গতির বিরুদ্ধে বাধা	4) পরমাণু নিস্তড়িৎ
v) প্রবাহীতে নিমজ্জিত বস্তু	e) মাধ্যম নিরপেক্ষ	5) ঘর্ষণ বল
vi) স্থির বস্তুতে গতি সৃষ্টির চেষ্টা	f) ইলেকট্রন ও প্রোটনের আধানের মান সমান কিন্তু বিপরীত প্রকৃতির	6) প্লবতা

উ: (b) - (iv) - (4)

II.

'A' স্তম্ভ	'B' স্তম্ভ
i) আয়তন × ঘনত্ব	a) তরলের উপরিতলের ক্ষেত্রফল বেশি হলে
ii) পতনশীল বস্তুর বেগ	b) সংকট কোণের মান কম
iii) বাষ্পায়ন দ্রুত হয়	c) সময় বাড়ার সঙ্গে বাড়ে
iv) হিরে চকচক করে	d) ভর

III.

'A' স্তম্ভ	'B' স্তম্ভ
i) ক্যাথোডে	a) ইস্পাত তৈরিতে প্রয়োজন।
ii) অ্যানোডে	b) বিশেষ বিশেষ জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার বেগ বৃদ্ধি করে।
iii) কার্বন ডাইঅক্সাইড	c) মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য।

'A' স্তম্ভ	'B' স্তম্ভ
iv) অক্সিজেন	d) নন-বায়োডিগ্রেডেবল পলিমার।
v) অ্যাসিটিক অ্যাসিড	e) বিজারণ ঘটে।
vi) পিভিসি	f) গ্রিনহাউস গ্যাস।
vii) সেলুলোজ	g) জারণ ঘটে।
viii) উৎসেচক বা এনজাইম	h) বায়োডিগ্রেডেবল পলিমার।
ix) LPG	i) তরল জ্বালানি।
x) বায়োডিজেল	j) গ্যাসীয় জ্বালানি।

IV.

'A' স্তম্ভ	'B' স্তম্ভ
i) সুন্দরী	a) ফাঁপা পর্বমধ্যযুক্ত চিরসবুজ উদ্ভিদ
ii) মাইটোকন্ড্রিয়া	b) সমুদ্র ফেনা
iii) ইস্ট্রোজেন	c) 2,4-D
iv) আগাছানাশক	d) জোড়কলম
v) বাঁশ	e) শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়া
vi) রাইজোবিয়াম	f) হরমোন
vii) গঙ্গার শুশুক	g) নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ
viii) গন্ডার	h) লবণাক্ত অঞ্চল
ix) কাটল ফিস	i) শাখাকলম
x) সিয়ন আর স্টক	j) ইকোলোকেশন
	k) জলদাপাড়া

5. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও : **(প্রতিটি প্রশ্নের জন্য 1নম্বর)**

i) একটি বস্তু কোন তরলে আংশিক নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসছে। বস্তুর ওজন ও অপসারিত তরলের ওজনের মধ্যে সম্পর্ক কী? ii) দুটি ভিন্ন ভরের বস্তুকে অবাধে পড়তে দেওয়া হলো। ভারী বস্তুটি যদি 2 সেকেন্ড পরে মাটিতে পড়ে হালকা বস্তুটি কত সময় পরে মাটিতে পড়বে? iii) হুবহু একইরকম দুটি বোতলে একই পরিমাণের ভিন্ন ভিন্ন তরল রাখা আছে। বোতলসমেত একটির ভর 2 kg ও অপরটির ভর 2.5 kg। কোন তরলের ঘনত্ব বেশি? iv) জলপূর্ণ একটি ঢাকনা খোলা বোতলের গায়ে বোতলের তলদেশ থেকে ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতায় দুটি ফুটো করা হলো। কোন ফুটো থেকে জল বেশি বেগে নির্গত হবে? ফুটো দুটি একই উচ্চতায় থাকলে কি একই ঘটনা ঘটত? v) জলের ওপর তেল ভাসে। তাহলে জল ও তেলের মধ্যে কার ঘনত্ব বেশি? vi) একটি কঠিন বস্তু ও একটি তরলের ঘনত্ব সমান। ওই কঠিন বস্তুটিকে ওই তরলে নিমজ্জিত করলে কী ঘটবে? vii) কোনো বস্তুকে 11.2 km/s বেগে ভূপৃষ্ঠ থেকে ওপর দিকে ছোড়া হলো। কী ঘটবে? viii) 10 N ও 20 N ওজনের দুটি বস্তুকে একই উচ্চতা থেকে একসঙ্গে অবাধে পড়তে দেওয়া হলো। কোনটি আগে মাটি স্পর্শ করবে? ix) হিমমিশ্রণ কোন নীতিতে কাজ করে? x) আলোর কোন ধর্মের জন্য সূর্য অস্ত চলে যাওয়ার পরেও সূর্যকে আমরা পশ্চিম আকাশে কিছুক্ষণ দেখতে পাই? xi) একটি 10 kg ভরের বস্তুর ওজন কত? ($g = 9.8 m/s^2$)। xii) পৃথিবীপৃষ্ঠে কোনো বস্তুর ওজন 25 N হলে তার ভর কত? xiii) কাচকে 'X' পদার্থ দিয়ে ঘষলে 'X' ধনাত্মক তড়িৎগ্রস্ত হয়। তাহলে এক্ষেত্রে কোন পদার্থটি ইলেকট্রন গ্রহণ ও কোনটি ইলেকট্রন বর্জন করেছে? xiv) কোনো কঠিনকে খোলা হাওয়ায় উত্তপ্ত করলে তরল অবস্থা পাওয়া যাচ্ছে না এমন দুটো উদাহরণ দাও। xv) কোনো তরলের স্ফুটনাঙ্ক উল্লেখ করার সময় চাপ উল্লেখ করা উচিত কেন? xvi) তাপমোচী রাসায়নিক বিক্রিয়ার দুটো ব্যবহারিক প্রয়োগ লেখো। xvii) হাইড্রোজেন সালফাইড ও কার্বন টেট্রাক্লোরাইডের অণুর প্রাথমিক গঠন কেমন হবে এঁকে দেখাও। (কার্বনের যোজ্যতা 4, সালফারের যোজ্যতা 2; H ও Cl একযোজী)। xviii) গলিত $CaCl_2$ -র তড়িৎবিশ্লেষণে ক্যাথোড ও অ্যানোড সংঘটিত বিক্রিয়া দুটো লেখো। xix) লোহার পাইপে জিঙ্কের প্রলেপ দিতে হলে কোনটাকে ক্যাথোড ও

কোনটাকে অ্যানোডরূপে ব্যবহার করবে? xx) চারকোলের কোন ধর্মের জন্য জল, বিভিন্ন দ্রবণ ও গ্যাস পরিশোধন করতে ব্যাপকভাবে চারকোল ব্যবহৃত হয়? xxi) কার্বন ডাইঅক্সাইডের দুটো গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ব্যবহার উল্লেখ করো। xxii) একটা প্রকৃতিজাত বায়োডিগ্রেডেবল পলিমার ও একটা কৃত্রিম, নন্-বায়োডিগ্রেডেবল পলিমারের উদাহরণ দাও। xxiii) জৈব আবর্জনা থেকে জীবাণুর ক্রিয়ায় প্রস্তুত বায়োগ্যাসের মুখ্য উপাদান কী? xxiv) জৈব যৌগ গঠনে O, P, S, C —এই মৌলদের মধ্যে কোন্‌টা অপরিহার্য? xxv) শক্তির তিনটে বিকল্প উৎসের নাম লেখো। xxvi) জিঙ্ক ফসফেট, ক্যালশিয়াম নাইট্রেট, ফেরিক সালফেট ও মারকিউরাস নাইট্রেটের সংকেত লেখো। xxvii) একটা ধাতু ও একটা অধাতুর চিহ্ন লেখো যাদের যৌগ মানুষের দেহে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। xxviii) ইন-সিটু সংরক্ষণ কোথায় দেখা যায়? xxix) AIDS রোগের জন্য দায়ী ভাইরাসের পুরো নামটা লেখো। xxx) ক্যাকটাসের কাণ্ডের কোশে জল সঞ্চয়ী উপাদানটির নাম লেখো। xxxi) কোন অণুজীব পাটকে জলে চুবিয়ে রাখলে পাটের কাণ্ডের পেকটিন নষ্ট করে দেয়? xxxii) আমন ধান চাষের জন্য কোন ধরনের মাটি উপযোগী? xxxiii) মুরগি পালনের একটি আধুনিক পদ্ধতির নাম লেখো। xxxiv) থাইরয়েড গ্রন্থি কোথায় থাকে? xxxv) একটি এককোশী ফাইটোপ্ল্যাংকটনের নাম লেখো। xxxvi) এস্কিমো শব্দের অর্থ কী? xxxvii) এমন একটি রোগের নাম লেখো যার জন্য ফ্ল্যাভিভাইরাস দায়ী। xxxviii) এলাচ ব্যবহার করা এমন একটা মিষ্টি খাবারের নাম লেখো। xxxix) রক্তে থাকা হয় এমন একটা কোশের নাম লেখো যেটা নিজের আকার পরিবর্তন করতে পারে।

6. দু-একটি বাক্যে উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের জন্য 2 নম্বর)

i) দুটি বস্তু পরস্পর ঘষা হলো। বস্তুদুটি তড়িৎগ্রস্ত হলো— কেন এমন হলো? ii) কোন বস্তুর মোট ভরকে বস্তুটির মোট আয়তন দিয়ে ভাগ করা হলো। এতে বস্তুটির পরিমাপের কোন রাশি পাওয়া গেল? তা তুমি কীভাবে পেলে? iii) টেবিলের ওপর একটি ভারী বস্তু রাখা আছে। বস্তুটির ওপর তুমি ক্রমবর্ধমান বল প্রয়োগ করায় সেটি কিছুক্ষণ পর চলতে শুরু করল। বস্তুটিকে ঠেলা মাত্রই বস্তুটিতে গতি সৃষ্টি হয় না কেন? বস্তুটি কখন সচল হবে? iv) সাধারণত বাড়ির জল সরবরাহের ট্যাঙ্ক বাড়ির সবচেয়ে উঁচুস্থানে রাখা হয় কেন? v) মাছ সংরক্ষণের জন্য বিশুদ্ধ বরফ না নিয়ে নুন-মেশানো বরফ নেওয়া হয় কেন? vi) বস্তুর প্রতিবিম্ব সৃষ্টির কারণ দুটি লেখো। vii) পারিপার্শ্বিক উষ্ণতা 0^oC বা তার কম হলে বিশুদ্ধ বরফ গলতে পারে না কেন? [ধরে নেওয়া যাক অন্যান্য ভৌত অবস্থা অপরিবর্তিত আছে।] viii) হিরের উচ্চ তাপ পরিবাহিতার একটা ব্যবহারিক প্রয়োগ উল্লেখ করো। ix) কার্বন ডাইঅক্সাইডের জারণধর্মের সমীকরণসহ উদাহরণ দাও। x) শুকনো খাবার সোডা ও অক্সালিক অ্যাসিডের গুঁড়ো মেশালে কোনো বিক্রিয়া ঘটে না; কিন্তু এই মিশ্রণে জল দিলে দ্রুত বিক্রিয়া ঘটে কার্বন ডাইঅক্সাইডের বুদ্‌বুদ্ বেরোয়। এর কারণ কী হতে পারে? xi) জলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের দ্রাব্যতার উপর (a) উষ্ণতা ও (b) চাপের প্রভাব উল্লেখ করো। xii) উত্তপ্ত কিউপ্রিক অক্সাইডের উপর দিয়ে হাইড্রোজেন গ্যাস পাঠালে যে বিক্রিয়া ঘটবে তার সমীকরণ লেখো। xiii) আদা, রসুন আর পেঁয়াজ ব্যবহার করা হয় তোমার জানা এমন দুটো রান্নার নাম লেখো। xiv) মেজর কার্প ও মাইনর কার্পের দুটো পার্থক্য উল্লেখ করো। xv) উত্তরবঙ্গে মানুষ-হাতি সংঘাতের কারণ কী? xvi) মাটি থেকে হারিয়ে যাওয়া উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান কী কী প্রাকৃতিক উপায়ে ফিরিয়ে আনা যায়? xvii) বর্জ্য পরিষ্কারে ব্যাকটেরিয়া কীভাবে সাহায্য করে? xviii) লোহিত রক্তকণিকার আকার গোল ও দু-পাশ চ্যাপ্টা চাকতির মতো হওয়ার কারণ কী? xix) কোন কোন সমস্যায় আমলকী কাজে লাগে ?

7. ৩-৪টি বাক্যে উত্তর দাও: (প্রতিটি প্রশ্নের জন্য 3 নম্বর)

i) জলের ভেতর বুদবুদ চকচকে দেখায় কেন? ii) তোমার কাছে গরম খাবার অনেকক্ষণ ধরে গরম রাখার পাত্র (যেমন ফ্লাস্ক) নেই। অথচ কোন গরম খাবার তোমাকে অনেকক্ষণ গরম রাখতে হবে। তুমি কী কী করবে? কেন করবে? iii) প্লাস্টিকের স্ট্রকে সিল্কের কাপড় দিয়ে বেশ কয়েকবার ঘষলে। এবার ছোটো ছোটো কাগজের টুকরোর সামনে ঐ নলটিকে নিয়ে গেলে। দেখা গেল নলটি কাগজের টুকরোগুলোকে আকর্ষণ করছে। এর কারণ কী? iv) একটি স্টিলের চামচ বালতির জলে ফেললে সেটি ডুবে যায়। অথচ চামচের থেকে অনেক ভারী একটি স্টিলের গামলা জলে ভাসে কেন? v) অনেকসময় কাচের ফাটলে আলো পড়লে সেই স্থান বিভিন্ন অবস্থান থেকে চকচকে দেখায় কেন? vi) তরলের সমোচ্চশীলতা ধর্মের একটি বাস্তব প্রয়োগ ব্যাখ্যা সহ আলোচনা করো। vii) পাশের ছবিটি দেখে তুমি যা বুঝতে পারলে তার ব্যাখ্যা দাও। viii) এমন দুটো সহজ পরীক্ষার উল্লেখ করো যার ফলাফল থেকে বোঝা যেতে পারে যে তরল আর গ্যাসীয় অবস্থায় অণুরা গতিশীল; ix) তোমাকে দুটো টেস্টটিউবের একটায় জিঙ্কের টুকরো আর অন্য একটায় ফেরাস সালফাইডের গুঁড়ো দেওয়া হলো। একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাপেক্ষে এদের শনাক্ত করবে কী করে? ভৌত পর্যবেক্ষণসহ লেখো। x) লোহার মরচে ধরা একটা অবাঞ্ছিত জারণ বিজারণের ঘটনা। কী কী উপায়ে লোহায় মরচে ধরায় বাধা দেওয়া যেতে পারে? xi) "$CuSO_4$ (দ্রবণ) + Fe → Cu + $FeSO_4$

(দ্রবণ) বিক্রিয়াটি ইলেকট্রনীয় বিচারে জারণ বিজারণ"— উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। xii) Al_2O_3 -এর সঙ্গে অ্যাসিড ও ক্ষারের বিক্রিয়ার উপযুক্ত সমীকরণ দিয়ে বোঝাও কেন একে উভধর্মী অক্সাইড বলা হয়; xiii) কার্বন ডাইঅক্সাইড যে আম্লিক অক্সাইড তা প্রমাণ করতে একটা সহজ পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করো। xiv) চুনজলে প্রথমে অল্প ও পরে অতিরিক্ত CO_2 গ্যাস পাঠালে কী ঘটবে সমীকরণ পর্যবেক্ষণসহ লেখো। xv) ঘাসজমির বাস্তুতন্ত্রে একশৃঙ্গ গন্ডারের ভূমিকা কী? xvi) তোমার অভিজ্ঞতা থেকে ঝুঁকিপূর্ণ আচরণের একটা ঘটনা সম্বন্ধে লেখো। xvii) খুব শুকনো ও গরম পরিবেশে ক্যাকটাস কীভাবে মানিয়ে নেয়? xviii) আমের জোড়কলম করা হয় কেন? xix) স্কুইড কীভাবে শিকার ধরে? xx) অ্যান্টার্কটিকার পরিবেশ দূষণের জন্য মানুষ কীভাবে দায়ী? xxi) ময়লা জলে মাছ চাষের সুবিধা কী? xxii) উট কীভাবে মরুভূমির জীবনে মানিয়ে নেয়? xxiii) খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ, ওষুধ প্রস্তুতি আর কৃষি— এই তিনটে ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়া কীভাবে আমাদের উপকার করে? xxiv) ডায়ারিয়া হলে কী কী সমস্যা দেখা দিতে পারে?

8. গাণিতিক সমস্যাগুলোর সমাধান করো : (প্রতিটি প্রশ্নের জন্য 3 নম্বর)

i) 2 বর্গ মি অঞ্চল জুড়ে 14 নিউটন বল কাজ করছে। চাপের মান কত? ii) একটি 50 গ্রাম ভরের পদার্থ খণ্ডের উষ্ণতা 2^0C বাড়াতে 25 ক্যালোরি তাপ লাগে। ঐ পদার্থের আপেক্ষিক তাপ কত? iii) 3200 ক্যালোরি তাপ দিয়ে 0^0C তাপমাত্রায় কত গ্রাম বরফকে ঐ একই তাপমাত্রায় জলে পরিণত করা যাবে? iv) এক ব্যক্তি 5 কিমি/ঘন্টা বেগে একটি আয়নার দিকে হেঁটে আসছে। তার প্রতিবিম্বের বেগ কত হবে? v) পরস্পর d দূরত্বে অবস্থিত দুটি বস্তুর ভর যথাক্রমে m_1 ও m_2। তাদের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ বল F। — (a) প্রথম বস্তুর ভর দ্বিগুণ দ্বিতীয় বস্তুর ভর তিনগুণ করা হলে তাদের মধ্যে আকর্ষণ বলের কী পরিবর্তন ঘটবে? (b) ভর স্থির রেখে তাদের মধ্যে দূরত্ব চার গুণ করলেই বা ওই আকর্ষণ বলের কী পরিবর্তন হবে? vi) পৃথিবীর ভর চাঁদের ভরের প্রায় 100 গুণ। পৃথিবীর গড় ব্যাসার্ধ চাঁদের গড় ব্যাসার্ধের প্রায় চার গুণ। পৃথিবী ও চাঁদের পৃষ্ঠে একটি বস্তুর ওজনের তুলনা করো। [সমাধানের ইঙ্গিত: ধরা যাক, বস্তুটির ভর m, চাঁদের ভর M, চাঁদের ব্যাসার্ধ R, পৃথিবীপৃষ্ঠে ও চন্দ্রপৃষ্ঠে বস্তুটির ওজন যথাক্রমে W_e ও W_m]

$$\frac{W_m}{W_e} = \frac{G\frac{mM}{R^2}}{G\frac{m100M}{(4R)^2}} = \frac{16}{100} = \frac{1}{6} \text{ (প্রায়)]}$$

9. সূত্রের সাহায্যে শব্দছকটি পূরণ করো : (প্রতিটি শব্দের জন্য 1নম্বর)

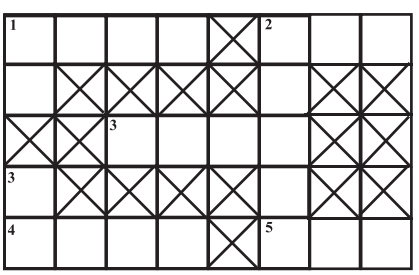

সূত্র

পাশাপাশি: 1. পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপশু
2. হিরে যা দিয়ে তৈরি
3. মরুভূমিতে বাস করা ছোটো ইঁদুরের মতো প্রাণী
4. মরুভূমিতে দেখার ভুল
5. কুয়াশা ও শিশির সৃষ্টি হয় জলীয় বাষ্প দ্বারা _____ বায়ু দিয়ে

ওপরনীচ : 1. সুন্দরবনের প্রধান আকর্ষণ
2. সমুদ্র ফেনা
3. ফলের রাজা

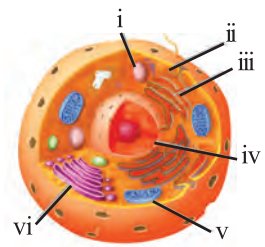

10. পাশে দেওয়া প্রাণীকোশের ছবিতে নিম্নলিখিত অঙ্গাণুগুলো দেখাও: (প্রতিটি অঙ্গাণুর জন্য 1 নম্বর)

লাইসোজোম, কোশ পর্দা, মাইটোকন্ড্রিয়ন, মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম, নিউক্লিয়াস, গলজি বডি

11. পাশে দেওয়া মৌমাছির জীবনচক্রের ছবিতে ফাঁকা বাক্সগুলো ভরাট করে তোমার খাতায় লেখো। (প্রতিটি শব্দের জন্য 1নম্বর)

শিখন পরামর্শ

নতুনভাবে নির্মিত বিদ্যালয় পাঠক্রমের দিক্‌নির্দেশ অনুযায়ী অষ্টম শ্রেণির উপযুক্ত এই 'পরিবেশ ও বিজ্ঞান' বইটির পঠন-পাঠন আর মূল্যায়নের জন্য এখানে কিছু প্রসঙ্গের অবতারণা করা হলো।

তৃতীয়, চতুর্থ আর পঞ্চম শ্রেণিতে শুরু হয়েছে শিশুর পরিবেশ চর্চা। নানারকম হাতেকলমে কাজ, অনুসন্ধান, আদান-প্রদান, কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে তার চারপাশের পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন। আমরা চেয়েছি তারা দল বেঁধে কাজ করুক। আরও চাওয়া হয়েছে যে শিশুর জ্ঞানগঠনের এই প্রক্রিয়া যেন কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তক-নির্ভর না হয়। আশা করা হয়েছে এর ফলে শিক্ষার্থীর পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান, মূল্যবোধ আর দক্ষতার বিকাশ ঘটবে।

শিশুর পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষার রূপায়ণে ষষ্ঠ, সপ্তম আর অষ্টম শ্রেণির 'পরিবেশ ও বিজ্ঞান'-এর নতুন বইগুলোতে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন আর জীববিদ্যার অনুসন্ধানের সঙ্গেই সমন্বয় ঘটানো হয়েছে পরিবেশ চর্চার। বিশেষভাবে লক্ষ রাখা হয়েছে যাতে আলোচ্য প্রসঙ্গ বয়সোপযোগী হয়।

জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা 2005 আর শিক্ষা অধিকার আইন 2009 অনুযায়ী এই বইয়ের ভাষা, বিষয়বস্তুর উপস্থাপন, ছবি ও বর্ণনা যথাসম্ভব শিশু-বান্ধব ও শিশুকেন্দ্রিক করার চেষ্টা হয়েছে।

আশা করা যায় শিক্ষার্থীর ইতিমধ্যে যতটুকু জ্ঞান, মূল্যবোধ আর দক্ষতা গঠন সম্পন্ন হয়েছে, তার ফলে সে এখন অনেকটাই স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে। হয়ত এর ফলে শ্রেণিকক্ষে বিষয়বস্তু উপস্থাপনের সময় আপনাদের আরো বেশি করে নানারকম দলগত কাজের আয়োজন করতে হবে। বিজ্ঞান বিষয়ের চর্চায় পরীক্ষাগারের প্রয়োজন কতটা তা নিয়ে আমাদের কোনো সংশয় নেই। চেষ্টা করুন বিদ্যালয়ে সামান্য কিছু উপকরণ সংগ্রহ করার, যাতে আমাদের পড়ুয়ারা আরো বেশি করে হাতেকলমে কাজ করতে পারে। এই সব অনুসন্ধান যেন পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখুন। যেখানে প্রয়োজন, শিক্ষার্থী যেন নিজের খাতায়, হাতে-কলমে কাজ আর সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষণ লিখে রাখে। আনুষঙ্গিক বিষয়ে তার প্রশ্ন থাকলে, সেটাও লিখে রাখুক। স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করুক। এসব কাজে উৎসাহ দিন। 'পরিবেশ ও বিজ্ঞান' বিষয়ে নিজস্ব সংগ্রহ গড়ে তুলতে ওদের উৎসাহ দিন। সেগুলো সংরক্ষণের জন্য শ্রেণিকক্ষের একটা অংশ ব্যবহার করুন। দৈনন্দিন জীবনে জীবনকুশলতা চর্চার নানাদিক নিয়ে আলোচনা করুন। ছাত্রছাত্রীদের নানা সৃজনশীল কাজে অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করুন। শিক্ষার্থীরা এসব কাজে কীভাবে অংশগ্রহণ করছে, আপনি সেগুলো পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। শিক্ষার্থীর বিকাশ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে আপনি প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু উপস্থাপনের প্রয়োজনে অষ্টম শ্রেণির এই 'পরিবেশ ও বিজ্ঞান' বইটিতে আমরা কিছু প্রসঙ্গকে 'টুকরো কথা' বলে উল্লেখ করেছি। এগুলো গল্পের ছলে পড়বার জন্য, শিক্ষার্থী যেন মুখস্থ না করে। তাদের জানিয়ে দিন পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নে এসব নিয়ে প্রশ্ন করা হবে না।

শিক্ষার্থীর প্রতিদিনের কাজ, প্রশ্ন করা, অন্যকে সাহায্য করা, বিদ্যালয় ও তার আশেপাশের পরিবেশকে প্রতিনিয়ত সুন্দর করে তোলার মধ্যে দিয়ে যে সবসময় প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন করা হচ্ছে তাও শিক্ষার্থীদের জানিয়ে রাখুন।

আশা করা যায় আপনাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় অষ্টম শ্রেণির সব পড়ুয়ার কাছে 'পরিবেশ ও বিজ্ঞান' বইটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

এই বই-এর পঠন-পাঠন সম্পর্কে আপনাদের অভিজ্ঞতা, মতামত ও মূল্যবান পরামর্শের ভিত্তিতে আগামী দিনে বইটির উৎকর্ষ সাধন সম্ভব হবে।